জাতীয় নিরাপদ
খাদ্য দিবস
২০১৮
বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
Bangladesh Food Safety Authority

জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস-২০১৮ উপলক্ষে স্মরণিকা

নিরাপদ খাবারে ভরবো দেশ
সবাই মিলে গড়বো সোনার বাংলাদেশ

সম্পাদনা পরিষদ

মোহাম্মদ মাহফুজুল হক	চেয়ারম্যান	প্রধান উপদেষ্টা
মিজ মাজেদা বেগম	সদস্য	সভাপতি
অধ্যাপক ড. ইকবাল রউফ মামুন	সদস্য	সদস্য
মঞ্জুর মোর্শেদ আহমেদ	সদস্য	সদস্য
ড. মোঃ খালেদ হোসেন	সচিব	সদস্য
মোঃ মাহবুব আলম	পরিচালক	সদস্য
আবু হেনা মোঃ মোস্তফা কামাল	উপসচিব	সদস্য
সমীর কুমার বিশ্বাস	উপসচিব	সদস্য সচিব

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ

প্রকাশকাল
০২ ফেব্রুয়ারি ২০১৮

মুদ্রণ
ক্রিয়েটিভ কনসেপ্ট

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

২ ফেব্রুয়ারী ২০১৮
২০ মাঘ ১৪২৪

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে ০২ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে প্রথমবারের মত "জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস" পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ দিবসের প্রাক্কালে নিরাপদ খাদ্য আন্দোলনে শামিল হওয়ার জন্য আমি দেশবাসীকে উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।

জনস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাবারের গুরুত্ব অপরিসীম। এ পরিপ্রেক্ষিতে 'নিরাপদ খাদ্যে ভরবো দেশ-সবাই মিলে গড়বো সোনার বাংলাদেশ' প্রতিপাদ্যটি যথার্থ এবং তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছে বলে আমি মনে করি। অনিরাপদ খাদ্য গ্রহণে অনেক সময় মারাত্মক স্বাস্থ্য ঝুঁকি সৃষ্টি হয়। এজন্য নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা খুবই জরুরি। বর্তমান সরাকর জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নে চিকিৎসা সুবিধা বৃদ্ধি, নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তি, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা উন্নয়নসহ ব্যাপক সর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার ধারাবাহিক উদ্যোগের অংশ হিসেবে প্রতি বছর ০২ ফেব্রুয়ারিকে "জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস" ঘোষণা সরকারের একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ।

ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সুস্থ রাখতে নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের বিকল্প নেই। আইন প্রয়োগের পাশাপাশি এক্ষেত্রে ব্যাপক জনসচেতনতাও গড়ে তুলতে হবে। উৎপাদনের মাঠ থেকে খাবার টেবিল পর্যন্ত সর্বক্ষেত্রে নিরাপদ খাবার নিশ্চিতকরণে আমাদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হতে হবে। কৃষকদের সচেতন ও দক্ষ করে গড়ে তুলতে হবে। সার ও কীটনাশক ব্যবহার, খাদ্যদ্রব্যের প্রক্রিয়াজাত ও প্যাকেটজাতকরণ, সরবরাহ ব্যবস্থা, সংরক্ষণসহ খাদ্য শৃঙ্খলের প্রতিটি ক্ষেত্রকে নিরাপদ রাখতে সংশ্লিষ্ট সকলকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে।

সকলের জন্য নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তি জাতিসংঘের অভীষ্ট উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) এর একটি অন্যতম অনুষঙ্গ। ১৬ কোটি জনগণের এ দেশে এটি একটি বড় চ্যালেঞ্জ। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ ২০৩০ সালের মধ্যে নিরাপদ খাদ্য সংশ্লিষ্ট অভিষ্ট উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে বলে আমি আশাবাদী।

আমি 'জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস-২০১৮' এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

২ ফেব্রুয়ারী ২০১৮
২০ মাঘ ১৪২৪

দেশে প্রথমবারের মত ২রা ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ 'জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস' পালন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

দিবসটির প্রতিপাদ্য "নিরাপদ খাদ্যে ভরবো দেশ-সবাই মিলে গড়বো সোনার বাংলাদেশ"- অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ ঘোষণা করেছে এবং তা বাস্তবায়নে সবাত্মক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। দেশের মানুষের মৌলিক চাহিদা খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করতে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ। আমাদের সরকারের বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। দেশের জনগণের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত, মানসম্পন্ন, ভেজাল ও দূষণমুক্ত নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাবার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আমরা 'নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩' প্রণয়ন করেছি। এর ধারাবাহিকতায় ২০১৫ সালে 'বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ' গঠন করা হয়েছে । দেশে বিদ্যমান খাদ্য শৃঙ্খলের বিভিন্ন পর্যায়ে বিশেষ করে খাদ্য উৎপাদন থেকে প্রক্রিয়াকরণ পর্যন্ত নিরাপদ ও মানসম্মত খাদ্য তৈরির প্রতিটি ধাপে যথাযথ মান নিশ্চিত করতে এ সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

বর্তমান সরকারের নানাবিধ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন হয়েছে। ফলে সকলের জন্য নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করা জনসাধারণের মৌলিক অধিকার হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। জনসাধারণের জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে উৎপাদন, আমদানি ও বাজারজাতকরণে সর্বোচ্চ মান নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

দেশে নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তির অধিকার সুদৃঢ় করতে খাদ্য উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ, বিপণন ও বিক্রয় সংশ্লিষ্ট প্রতিটি পর্যায়ে চিহ্নিত সমস্যাবলী উত্তরণে সহযোগিতা করার জন্য আমি সকলের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

আমি আশা করি, জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধি ও অংশগ্রহণের মাধ্যমে আমরা সবার জন্য নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে সক্ষম হব।

আমি 'জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস ২০১৮'- এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা-জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

মন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

নিরাপদ খাদনিরাপদ খাদ্যপ্রাপ্তি নিশ্চিকরণের প্রত্যয় নিয়ে আগামী ০২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ 'জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস' উদ্‌যাপিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এবারে দিবসটির প্রতিপাদ্য নির্ধারিত হয়েছে 'নিরাপদ খাদ্যে ভরবো দেশ- সবাই মিলে গড়বো সোনার বাংলাদেশ'। অত্যন্ত সময়োপযোগী এবং দৃঢ় প্রত্যয়যুক্ত এ প্রতিপাদ্যের মাধ্যমে মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলোর অন্যতম অনুষঙ্গ 'খাদ্য' এর নিরাপত্তার বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে।

জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস-২০১৮ এর প্রতিপাদ্যের অন্তর্নিহিত দ্যোতনার সাথে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের কার্যক্রমের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। এই মহৎ উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। উল্লেখ্য যে, নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ০২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ গঠিত হয়। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ তার সকল সাধ্য নিয়ে নিজেদের নিয়োজিত রেখেছেন একটি নিরাপদ খাদ্য বলয়, অবকাঠামো ও সচেতন জনমানস গড়ে তোলার জন্য। জনগণের প্রতি আমার আহ্বান, আসুন আমরা নিরাপদ খাদ্য প্রত্যয়টি মেনে নিয়ে মনের গভীরে একে প্রোথিত করি। তাহলে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতা প্রতিপালিত হবে।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। সরকার জনসাধারণের আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণের পাশাপাশি দেশের আপামর জনগণের জন্য খাদ্য নিরাপত্তা ও নিরাপদ খাদ্যমান সু-নিশ্চিত করার জন্য কার্যকর পরিকল্পনা এবং বর্তমান সরকারের আমলে গৃহীত ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টতে জনগণের নিরাপদ খাদ্যপ্রাপ্তির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। বর্তমান সরকার এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে নিরলস কাজ করছে। বর্তমান সময়ে দেশের খাদ্য চাহিদা পূরণের পাশাপাশি খাদ্য উৎপাদন, বিপণন ও সরবরাহে বিশেষ নিরাপদতা নিশ্চিত করার জন্য নানাবিধ উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় 'নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩' প্রণয়ন এবং ২০১৫ সালে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা এ সরকারের একটি দৃঢ় ও প্রশংসনীয় পদক্ষেপ।

বিশ্বব্যাপী টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার প্রথমদিকেই খাদ্য নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য, পুষ্টির বিষয়গুলো গুরুত্বসহকারে অঙ্গীকারের নির্দেশনায় বর্ণিত আছে। টেকসই উন্নয়নের জন্য নিরাপদ খাদ্য ও খাদ্য নিরাপত্তা দুটো বিষয়ই অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পর্কিত।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর আজীবন লালিত স্বপ্ন ছিল অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের মাধ্যমে এদেশের গণমানুষের কল্যাণ ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করা। তাঁর এই স্বপ্নকে উপজীব্য করেই আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্বে ২০২১ সাল নাগাদ বাংলাদেশকে সমৃদ্ধির উচ্চতর সোপানে পৌঁছে দেয়ার রূপকল্প বাস্তবায়নের দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়ে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির নিষ্কণ্টক অগ্রগতির জন্য জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস-২০১৮ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করি।

আমি জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস-২০১৮ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা। জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরঞ্জীবী হোক।

আবুল মাল আব্দুল মুহিত, এমপি

بسم الله الرحمن الرحيم

মন্ত্রী
কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

"নিরাপদ খাদ্যে ভরবো দেশ- সবাই মিলে গড়বো সোনার বাংলাদেশ"- এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ০২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস। আমি এ দিবস উপলক্ষে সমগ্র দেশবাসীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাই।

খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, জলবায়ু পরিবর্তন, ভূমি ও বাজার ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন কিংবা গ্রামীণ উন্নয়ন চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু এখন কৃষি। তাই কৃষিকে বাদ দিয়ে কোন দেশের উন্নয়ন কল্পনা করা যায় না। কৃষিই আজ উন্নত, উন্নয়নশীল এমনকি অনুন্নত সব দেশের অর্থনীতি'র প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে দাঁড়িয়েছে। ক্রমহ্রাসমান কৃষি জমির এ দেশে জলবায়ু পরিবর্তনসহ সামগ্রিক পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আগামিতে আমাদের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হবে ক্রমবর্ধমান বিপুল জনগোষ্ঠীর জন্য খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তি জনগণের মৌলিক সাংবিধানিক অধিকার। এ অধিকার পূরণের জন্য জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে পরিচালিত বর্তমান সরকারের আমলে ডিজিটাল কৃষি ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। কৃষি তথ্য সার্ভিসের মাধ্যমে দেশের ১০টি কৃষি অঞ্চলে ২৪৫টি কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র (এআইসিসি) স্থাপন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে কৃষক ফসল উৎপাদন বিষয়ক বিশেষজ্ঞ পরামর্শ গ্রহণ করতে পারেন। দেশে মাটির উর্বরতা অনুযায়ী অনলাইন সুষম সার সুপারিশ করার জন্য ২০০টি উপজেলায় ডিজিটাল পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। তাছাড়া দেশে জিআইএস ভিত্তিক মডেলিংয়ের মাধ্যমে ১৭টি শস্য উপযোগিতা বিষয়ক ম্যাপ প্রণয়ন করা হয়েছে। এটি অঞ্চলভিত্তিক শস্য উৎপাদনকে ত্বরান্বিত করবে।

খাদ্যশিল্পে বাংলাদেশের অগ্রগতির জন্য খাদ্যমান নিশ্চিতকরণের সাথে সাথে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বাজারজাতকরণ এবং বিপণন সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের সক্রিয় অংশগ্রহণ একান্তভাবে জরুরি। তারই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রণীত নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ বাস্তবায়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ যার মাধ্যমে দেশের খাদ্যশিল্পে উন্নত ও নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন এবং সরবরাহ আরও জোরদার হবে। জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস-২০১৮ একটি সময়োপযোগী উদ্যোগ, যা খাদ্যের মান উন্নয়ন ও নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে আমি মনে করি।

বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার দক্ষ ও দূরদর্শী নেতৃত্ব ও সঠিক দিকনির্দেশনায় ঘোষিত রূপকল্প-২০২১ অনুযায়ী বাংলাদেশ মধ্য আয়ের দেশ হওয়ার পথে দৃপ্ত পদে এগিয়ে চলছে এবং রূপকল্প-২০৪১ অনুযায়ী বাংলাদেশকে সুখী-সমৃদ্ধ, শান্তিপূর্ণ ও উন্নত দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আর এ লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যমেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজন্ম লালিত স্বপ্নের সোনার বাংলার বাস্তবায়ন সম্ভব হবে।

জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস-২০১৮ সরকারের পাশাপাশি জনগণকেও নিরাপদ খাদ্য বিষয়ে সচেতন করে তুলবে- এ প্রত্যাশা করি। আমি জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস-২০১৮ এর সার্বিক সফলতা কামনা করি।

জয় বাংলা-জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মতিয়া চৌধুরী

মতিয়া চৌধুরী, এমপি

মন্ত্রী
খাদ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

জনগণের জন্য নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণের প্রত্যয় নিয়ে আগামী ০২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ প্রথমবারের মত অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে "জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস"। দিবসটির প্রতিপাদ্য নির্ধারিত হয়েছে 'নিরাপদ খাদ্যে ভরবো দেশ- সবাই মিলে গড়বো সোনার বাংলাদেশ'। সময়োপযোগী প্রতিপাদ্য নিয়ে অনুষ্ঠিতব্য এ দিবসের প্রাক্কালে আমি সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সুন্দর জীবন ও সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্যের কোন বিকল্প নেই। এজন্য বর্তমান সরকার সাংবিধানিক দায়িত্বের অংশ হিসেবে খাদ্য নিরাপত্তা ও নিরাপদ খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করার সংকল্প গ্রহণ করে বিশ্বখাদ্য সম্মেলনের পর বাংলাদেশ সরকার পরামর্শমূলক প্রক্রিয়ায় খাদ্য নিরাপত্তা নীতি সংস্কারের উদ্যোগ নেয়। এ সিদ্ধান্তের ফলে বাংলাদেশে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/সংস্থার মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা বাস্তবায়িত হয়। খাদ্য নিরাপত্তা বাস্তবায়নে খাদ্যের যথাযথ মাননিয়ন্ত্রণের ও নানাবিধ পরিকল্পনা গ্রহন করা হয়েছে। ধারাবাহিক কর্মপরিকল্পনার অংশ হিসেবে 'নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩' সংসদে পাশ হয়েছে এবং পরবর্তীতে ২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ নামে একটি শক্তিশালী কর্তৃপক্ষ গঠন করা হয়েছে। আমি প্রত্যাশা করি জনসাধারণের খাদ্য চাহিদা পূরণের সাথে সাথে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতের লক্ষ্যে "জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস-২০১৮" বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার ধারাবাহিকতায় দেশের আপামর জনগণের জন্য যথাযথ খাদ্যমান নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে নিরাপদ খাদ্য সরবরাহ করা একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। নিরাপদ খাদ্য দিবসে কর্তৃপক্ষের এ ধরনের আয়োজন খাদ্য উৎপাদন, বিপণন, প্রক্রিয়াজাতকরণসহ খাদ্য শৃঙ্খলের বিভিন্ন পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট সকলের সচেতনতা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি। 'নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩' যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য ইতোমধ্যে বিধি, প্রবিধান, গাইডলাইন, সাংগঠনিক কাঠামো প্রণয়নসহ আনুষঙ্গিক কার্যক্রমের মাধ্যমে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের উদ্যোগসমূহ দৃশ্যমান হচ্ছে।

উন্নত দেশের নাগরিকগণ যেসকল সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে ২০৪১ সাল নাগাদ বাংলাদেশের সকল জনগণ সে সব সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে অন্যান্য খাতের মত নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন ও নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে বর্তমান সরকার সফল হবে বলে আমি আশাবাদী। সরকারের এই মহতী উদ্দেশ্য সর্বাত্মকভাবে সফল ও কার্যকর করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে এগিয়ে আসার জন্য আমি আহবান জানাচ্ছি।

আমি "জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস-২০১৮" এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা-জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ কামরুল ইসলাম, এমপি

সভাপতি
খাদ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয়
স্থায়ী কমিটি
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

বাণী

আগামী ০২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ নিরাপদ খাদ্য দিবস। এবারের প্রতিপাদ্য -'নিরাপদ খাবারে গড়বো দেশ-সবাইমিলে গড়বো সোনার বাংলাদেশ'। একটি সুস্থ ও সবল জাতি হিসেবে নিজেদের বিশ্ব দরবারে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে নিরাপদ খাদ্যের কোন বিকল্প নেই। কাজেই বহুমাত্রিক ভাবনায় ও বিচারে এ বারের নিরাপদ খাদ্য দিবস ও দিবসের প্রতিপাদ্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমি দিবসটি উপলক্ষে সকলকে অভিনন্দন জানাই।

এবারের প্রতিপাদ্যটি ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রত্যয়ের সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত। বর্তমান সরকার ঘোষিত ভিশন-২০২১ ও জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বাংলাদেশে খাদ্যের নিরাপদতা নিয়ে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি দপ্তর/ প্রতিষ্ঠান নিজ নিজ পরিসরে কাজ করে আসছিল। সমগ্র খাদ্য শৃঙ্খল হতে ভোক্তার দোরগোড়া পর্যন্ত দূষণ ও ভেজালমুক্ত নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা যাচ্ছিল না। এরই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের আপামর জনসাধারনের জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার উদ্দেশ্যে মাদার অব হিউম্যানিটি ও বাংলাদেশের উন্নয়নের রূপকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগে এবং যুগোপযোগী বিচক্ষণ ও দূরদর্শী সিদ্ধান্তে নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩ প্রণীত হয় এবং একটি বিজ্ঞানসম্মত ও আধুনিক খাদ্য নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থাপনা গোড়াপত্তন হয়।

নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তি বাংলাদেশের সকল মানুষের সাংবিধানিক অধিকার। বাংলাদেশ সরকার মানুষের এই অধিকার সংরক্ষণে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তি ও পুষ্টি পরিস্থিতির উন্নয়নের বিষয়টি সামনে রেখেই সরকারের জাতীয় খাদ্য নীতি ও কান্ট্রি ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান প্রণিত হয়েছে।

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর আজীবন লালিত স্বপ্ন ছিল অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের মাধ্যমে এদেশের গণমানুষের কল্যাণ ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করা। জাতির জনকের সুযোগ্য কন্যা বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে একটি সুস্থ, সবল ও উন্নত জাতি গঠনের জন্য সময় উপযোগী ও প্রযুক্তি নির্ভর আত্মনির্ভরশীল উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। প্রতিটি নাগরিকের জন্য নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণ এ মহাপরিকল্পনার একটি অন্যতম অনুষঙ্গ। 'নিরাপদ খাদ্য দিবস-২০১৮' সরকারের এ মহত উদ্যোগকে বাস্তবায়িত করতে সহায়তা করবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

জাতীয় "নিরাপদ খাদ্য দিবস-২০১৮" সফল হোক। আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

জয় বাংলা-জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আব্দুল ওয়াদুদ, এমপি

সংসদ সদস্য

১৮৩, ঢাকা-১০

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

বাণী

মহান একুশের চেতনাসমৃদ্ধ ফেব্রুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে 'জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস-২০১৮'। মহান এই ভাষার মাসে আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি মাতৃভাষার জন্য আত্মোৎসর্গকারী ভাষা শহীদদের। শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি জাতির পিতার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সহ সকল শহীদদের।

আমরা জানি মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলোর প্রথমটি হলো অন্ন বা খাদ্য। আর এই খাদ্য হতে হবে নিরাপদ অন্যথায় তা হতে পারে জীবনের জন্য বিষাদময় ও দুর্বিষহ।

সুদূর প্রসারী লক্ষ্য নিয়ে বর্তমান সরকারের সময়ে তৈরি নিরাপদ খাদ্য আইন-২০১৩ বাস্তবায়নে ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে, জনগনকে নিরাপদ খাদ্য গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। সেই লক্ষ্যে আসন্ন জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস সাড়ম্বরে পালনের বিষয়টি অত্যন্ত সময়োপযোগী।

নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তি বাংলাদেশের সকল মানুষের সাংবিধানিক অধিকার। বাংলাদেশ সরকার এই অধিকার সংরক্ষণে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। একটি নিরাপদ বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির যথাযথ অনুশীলনের মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্যপ্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিতকরণ, খাদ্যের মান নির্ধারণ, সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার নিরাপদ খাদ্য সংশ্লিষ্ট কাজে সহায়তা দান, খাদ্য উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াজাতকরণ, মজুদ ও সরবরাহ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও সমন্বয়ের মাধ্যমে খাদ্যে ভেজাল ও দূষণ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের কার্যক্রমকে আরও শক্তিশালী করা প্রয়োজন।

বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের লালিত স্বপ্ন ছিল অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের মাধ্যমে এদেশের মানুষের কল্যাণ ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করা। তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার দূরদৃষ্টি সম্পন্ন নেতৃত্বের গুণে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের নতুন দিগন্তে এগিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশকে সমৃদ্ধির উচ্চতর সোপানে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে সরকার। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির নিষ্কণ্টক অগ্রগতির জন্য জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস-২০১৮ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

আমি "জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস-২০১৮" এর সর্বাঙ্গীন সফলতা ও সার্থকতা প্রত্যাশা করি।

জয় বাংলা-জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস, এমপি

ভারপ্রাপ্ত সচিব
খাদ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২ ফেব্রুয়ারিকে 'জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস' হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে। এবারের নিরাপদ খাদ্য দিবসের প্রতিপাদ্য হচ্ছে- "নিরাপদ খাদ্যে ভরবো দেশ- সবাই মিলে গড়বো সোনার বাংলাদেশ"। নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তি বাংলাদেশরে সকল মানুষের সাংবিধানিক অধিকার মানুষের ৫টি মৌলিক অধিকারের মধ্যে খাদ্য অন্যতম; এই অধিকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা এবং সুস্থ সবল ও কর্মক্ষম জীবনের জন্য নিরাপদ খাদ্য একান্তই অপরিহার্য। সুস্থ দেহের জন্য প্রয়োজন নিরাপদ খাদ্য এবং নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত হলে নিশ্চিত হবে সুস্থ সবল কর্মক্ষম জাতি। সুস্থ সবল জাতি সুখী সমৃদ্ধ ও উন্নত বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়কে দৃঢ় করবে।

বাংলাদেশে নিরাপদ খাদ্য নিয়ে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান অনেক দিন থেকে কাজ করে আসছে; তা সত্ত্বেও সে সকল উদ্যোগের মাধ্যমে খাদ্য শিকলের (ফার্ম টু ফর্ক) প্রতিটি পর্যায়ে অর্থাৎ উৎপাদন থেকে বাজারজাত পর্যন্ত দূষন ও ভেজালমুক্ত নিরাপদ খাদ্য সঠিকভাবে নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। এ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের সকল মানুষের জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার উদ্দ্যেশে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগে এবং তাঁর যুগোপযোগী, বিচক্ষণ ও দূরদর্শী সিদ্ধান্তে নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ প্রণীত হয় এবং উক্ত আইনের আওতায় একটি বিজ্ঞানসম্মত ও আধুনিক খাদ্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠিত হয়।

নিরাপদ খাদ্য যোগানোর জন্য খাদ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণনের সকল ধাপে সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ বিশেষভাবে প্রয়োজন। পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তার ধারাবাহিক উন্নয়ন পরিকল্পনা যথাযথ বাস্তবায়নে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করা একটি বিশেষ উদ্যোগ হিসেবে পরিগণিত। নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতের যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে তাতে খাদ্যের উৎপাদন প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন সংশ্লিষ্ট সকল সেক্টরের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় দেশের জনসাধারণের জন নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করা সম্ভব হবে বলে মনে করি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার একটি সুস্থ, সবল ও উন্নত জাতি গঠনের জন্য প্রযুক্তি নির্ভর বিজ্ঞানভিত্তিক আত্মনির্ভরশীল টেকসহ উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। প্রতিটি নাগরিকের জন্য নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণ উক্ত পরিকল্পনার অন্যতম একটি লক্ষ্য। জাতিসংঘের উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০ (Sustainable Development Goal) এর Goal-2 (Zero Hunger) এর Target 2.1-এ উল্লেখিত রয়েছে। এ বিষয়ে খাদ্য মন্ত্রণালয় Co-Lead Ministry হিসেবে কাজ করছে। এ প্রেক্ষাপটে জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস ২০১৮ উদ্‌যাপন নিরাপদ খাদ্যপ্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

আমি "জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস-২০১৮" এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

শাহাবুদ্দিন আহমদ

চেয়ারম্যান

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ

বাণী

প্রতিবছর ০২ ফেব্রুয়ারি, জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস হিসাবে ঘোষিত হয়েছে। এবার এ দিবসের প্রতিপাদ্য হচ্ছে- "নিরাপদ খাদ্যে ভরাবো দেশ-গড়বো সোনার বাংলাদেশ" একটি সুস্থ ও সবল জাতি হিসেবে নিজেদেরকে বিশ্ব দরবারে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করণের কোন বিকল্প নেই। বহুমাত্রিক ভাবনায় ও বিচারে এ দিবসের প্রতিপাদ্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমি দিবসটি উপলক্ষ্যে সকলকে স্বাগত জানাই। ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রত্যয়ের সাথে এবারের প্রতিপাদ্যটি সরাসরি সম্পর্কযুক্ত। বর্তমান সরকার ঘোষিত ভিশন-২০২১ ও জাতিসংঘ ঘোষিত এসডিজি বা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় আমরা নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত-করণ বিষয়ে সুদৃঢ় অঙ্গীকার পাই। আমরা জানি, বাংলাদেশে নিরাপদ খাদ্য নিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান দীর্ঘ সময় যাবত কাজ করে আসছিল। এই বিচ্ছিন্ন উদ্যোগের কারণে সমগ্র খাদ্য শৃঙ্খল হতে ভোক্তার দোরগোড়া পর্যন্ত দূষণ ও ভেজালমুক্ত নিরাপদ খাদ্যপ্রাপ্তি নিশ্চিত করা যাচ্ছিল না। এরই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণের জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার উদ্দেশ্যে মাদার অব হিউম্যানিটি, বাংলাদেশের উন্নয়নের রূপকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগে এবং যুগোপযোগী বিচক্ষণ ও দূরদর্শী সিদ্ধান্তে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের মাধ্যমে বিগত ১০ অক্টোবর ২০১৩ তারিখে দেশের নাগরিকের জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় নিরাপদ খাদ্যপ্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ প্রণীত করে একটি বিজ্ঞানসম্মত ও আধুনিক খাদ্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনার গোড়াপত্তন হয়েছে।

বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির যথাযথ অনুশীলনের মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্যপ্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করতে খাদ্য উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ, বিপণন ও বিক্রয় সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সমন্বয়ের মাধ্যমে সহযোগিতা প্রদান এবং নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষে গত ২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ গঠিত হয়েছে। নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ বাস্তবায়নের মাধ্যমে উৎকৃষ্ট পন্থায় খাবার সকলের জন্য স্বাস্থ্যসম্মতভাবে সর্বোচ্চ সুরক্ষায় ভোক্তাগণের কাছে পৌছানো এ কর্তৃপক্ষের অন্যতম দায়িত্ব। জনগণের প্রত্যাশা এবং বর্তমান সরকারের সদিচ্ছার প্রতি শ্রদ্ধা রেখে কর্তৃপক্ষ তার সীমিত সামর্থ্য নিয়ে ঐকান্তিকভাবে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

বাংলাদেশে একটি আধুনিক ও প্রযুক্তিনির্ভর নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করে বাংলাদেশ সরকারের রূপকল্প ২০২১ অর্জনের মত মহতী এ কাজে কর্তৃপক্ষ সকলের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করে। বাংলাদেশে এখন প্রায় ১৮টি মন্ত্রণালয় এবং তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন দপ্তর, সংস্থা, অধিদপ্তর ও স্থানীয় সরকারের প্রায় ৪৮০টি প্রতিষ্ঠান খাদ্যে নিরাপদতা নিশ্চিত করার মহাযজ্ঞে সম্পৃক্ত রয়েছে। এছাড়া আমাদের যেসব খাদ্য নিয়ন্ত্রণ সংস্থা আছে, তাদের ১২০টিরও বেশি আইন, বিধি, প্রবিধি, নীতিমালা ইত্যাদি রয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় ২৫ লাখ মানুষ খাদ্য ব্যবসায়ের সঙ্গে যুক্ত। এর মধ্যে ১৫ লাখ প্রত্যক্ষ ও বাকি ১০ লাখ পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত। সকলকে একসূত্রে আবদ্ধ করে আমরা জনগণের নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তির সাংবিধানিক অধিকারকে নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর। এবারের দিবসটি এই প্রত্যয়ে আমাদের এগিয়ে নিতে সকলেই সহায়তা করবেন বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

আমি জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস-২০১৮ এ সকলকে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত হবার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।

মোহাম্মদ মাহফুজুল হক

بسم الله الرحمن الرحيم

আহ্বায়কের বক্তব্য

মহান আল্লাহ তা'য়ালা কোনো শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার ক্ষণ থেকেই তার সুক্ষ্ম কারিগরি বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনায় শিশুটির উপযোগী নিরাপদ খাদ্যের ব্যবস্থা করেই পৃথিবীতে পাঠান। এ যেন আল্লাহ সুবহানু তা'য়ালার পক্ষ থেকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপহার, নির্দেশ এবং ইঙ্গিত। এখানে চিন্তাশীল ব্যক্তির জন্য অনুধাবনের অনেক কিছু রয়েছে। পবিত্র কোরআনে এ সংক্রান্ত আলোচনা বেশ কয়েকবারই এসেছে; এছাড়াও নিরাপদ, উৎকৃষ্ট খাবার গ্রহণেরও তাগিদ রয়েছে। এ থেকেই নিরাপদ খাদ্যের গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়।

বাংলাদেশ সরকার প্রতিবছর ২ ফেব্রুয়ারি 'জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস' পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আনন্দঘন পরিবেশে নানা আয়োজনে এবারই প্রথমবারের মতো সারা দেশব্যাপী জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস পালিত হচ্ছে। ঘোষণাটি এ দেশে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে সরকারের আন্তরিক ইচ্ছারই বহিঃপ্রকাশ। সকলের সমন্বিত ঐকান্তিক কার্যকরী প্রচেষ্টায় প্রতিটি মানুষের জন্য নিরাপদ খাদ্যপ্রাপ্তি নিশ্চিত করা সম্ভব। এবছরের প্রতিপাদ্য বিষয় "নিরাপদ খাদ্যে ভরবো দেশ, সবাই মিলে গড়বো সোনার বাংলাদেশ"।

বাংলাদেশ খাদ্য নিরাপত্তায় সফলতা অর্জন করেছে এবং নিম্নমধ্যম আয়ের জাতি হিসেবে স্বীকৃতিও অর্জন করেছে। কিন্তু খাদ্য নিরাপত্তায় নিরাপদ খাদ্যের যোগান আমরা কতটুকু দিতে পেরেছি সে বিষয়টিতে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। প্রতিনিয়ত আমরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, পত্রিকা, টিভি ও অন্যান্য সংবাদ মাধ্যমে খাদ্যে বিভিন্ন ধরণের দূষণ ও ভেজালের বিষয়ে জানতে পারছি যার অধিকাংশই সঠিক। কিছু আবার ভিত্তিহীন সংবাদও প্রচারিত হচ্ছে। যার ফলে আমাদের একটা বড় অংশের মধ্যে খাদ্য নিয়ে চরম এক ভীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। এ সমস্ত প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ সরকার গভীরভাবে বিবেচনায় নিয়েছে এবং ফলশ্রুতিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগে সময়ের প্রয়োজনে দূরদর্শী ভীক্ষ্ণ চিন্তাতে নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩ প্রণীত হয়েছে এবং এই আইন বাস্তবায়নে ২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ গঠন করা হয়। নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে হলে খাদ্যের নিরাপদতার মান নিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য, আর এজন্য প্রয়োজন খাদ্য নিরাপদতার মান নির্ণয়ের স্বীকৃত গবেষণাগার।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংবিধানের ১৫ (ক) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সকল নাগরিকের খাদ্যের মৌলিক চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের 'মৌলিক দায়িত্ব'। আর এ খাদ্য নিরাপদ হবে এটাই কাঙ্ক্ষিত। অনিরাপদ খাবার বহুবিধ স্বাস্থ্য সমস্যার কারণ সৃষ্টি করে। এর প্রভাব সুদূর প্রসারী- অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ব্যক্তিগত। সার্বিক বিবেচনায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনায় বৈপ্লবিক পরিবর্তনের দ্বারপ্রান্তে। বাংলাদেশ এখন প্রথাগত পরিবীক্ষণ পদ্ধতি থেকে বেরিয়ে ঝুঁকিভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও বৈজ্ঞানিকভাবে স্বীকৃত নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনার ব্যাপক কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। আধুনিক বিশ্বের সাথে তাল রেখে বিভিন্ন বিধি-প্রবিধি, নির্দেশনা প্রণয়নের কার্যক্রমও অব্যাহত রেখেছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় অর্থমন্ত্রী, মাননীয় কৃষি মন্ত্রী, মাননীয় খাদ্য মন্ত্রী, সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সম্মানিত সভাপতি ও সম্মানিত সদস্য, সচিব মহোদয়ের বাণী এবং নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান মহোদয়ের বাণী স্মরণিকাটিকে বিশেষভাবে মূল্যবান করেছে।

খাদ্যবিপত্তি, স্বাস্থ্যঝুঁকি, পুষ্টি ও নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে তথ্যসমৃদ্ধ বিভিন্ন লেখা স্মরণিকাটিকে তাৎপর্যপূর্ণ ও গুরুত্ববহ করেছে। লেখকগণ ও সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। স্মরণিকা উপ-কমিটির সদস্যগণ ও কর্তৃপক্ষের অন্যান্য সহকর্মীবৃন্দ প্রকাশিত এ স্মরণিকা প্রস্তুতে নানাভাবে শ্রম, মেধা এবং মুদ্রণে কারিগরি সহায়তা দিয়ে যারা এটিকে বাস্তবে রূপ দিয়েছেন, আমি তাদের সকলকে অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন জানাই।

এ স্মরণিকায় প্রকাশিত লেখাসমূহে প্রতিফলিত মতামত লেখকের নিজস্ব এবং কোনো ভুলত্রুটি থাকলে তা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ রইলো।

জনাব মোহাম্মদ মাহফুজুল হক, চেয়ারম্যান এর সুযোগ্য নেতৃত্বে জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আমাদের জীবনের প্রথম খাবারটি যেমন নিরাপদ ছিলো- তেমনি জীবনের শেষ খাবারটিও যেন নিরাপদ থাকে এই দৃঢ় প্রত্যয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করে আমরা যারা খাদ্য ব্যবসায়ের সাথে জড়িত তারা প্রত্যেকেই যদি নিজ নিজ অবস্থানে পেশাগত নৈতিকতা অবলম্বনে খাদ্যকে নিরাপদ রাখি, তবেই নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ বিশ্বে অনুকরণীয়, অনুসরণীয় হবে। আজ আমরা বিন্দুতে, আমি আশান্বিত এই বিন্দুই অদূরে একদিন বৃত্তে পরিণত হবে ইনশা'আল্লাহ-এ প্রত্যাশায় জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস-২০১৮ এর সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।

আজেদা বেগম

আজেদা বেগম
সদস্য, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ

সূচিপত্র

১.	নিরাপদ খাদ্যপ্রাপ্তিতে সরকারের অঙ্গীকার বাস্তবায়নে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের অগ্রযাত্রা	মোহাম্মদ মাহফুজুল হক	০৩
২.	খাদ্যনিরাপত্তা অর্জনে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	ড. মোঃ আলী আকবর	০৭
৩.	Food Safety, a prime issue to protect public health	Dhiraj Kumar Nath	১০
৪.	নিরাপদ খাদ্য ও ক্যাবের কার্যক্রম	গোলাম রহমান	১৩
৫.	একটি অসাধারণ আত্মজীবনী	মুহম্মদ জাফর ইকবাল	১৬
৬.	Food Safety: A SDG Priority	Hossain Zillur Rahman	২০
৭.	নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে বিরাজমান চ্যালেঞ্জসমূহ এবং করণীয়	আনোয়ার ফারুক	২১
৮.	নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনায় বিএসটিআই'র ভূমিকা	সরদার আবুল কালাম	২৫
৯.	নিরাপদ মৎস্য ও মৎস্যপণ্য : মৎস্য অধিদপ্তরের গৃহীত পদক্ষেপ	সৈয়দ আরিফ আজাদ	২৮
১০.	নিরাপদ প্রাণিজ আমিষ: প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কার্যক্রম এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা	ডা. মোঃ আইনুল হক	৩৩
১১.	বাংলাদেশে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ভূমিকা	মোঃ আব্দুল আজিজ	৩৭
১২.	নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তি ভোক্তার অধিকার	মোঃ শফিকুল ইসলাম লস্কর	৩৯
১৩.	খাদ্যে রাসায়নিকের ব্যবহার ও জনমনে আতঙ্ক	ড. নীলুফার নাহার	৪১
১৪.	নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারের ভূমিকা	অধ্যাপক ড. মোঃ ইকবাল রউফ মামুন	৪৪
১৫.	Food Sovereignty: A review of the concept and potential for developing countries	Monzur Morshed Ahmed	৪৭
১৬.	বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের অগ্রযাত্রা এবং এ পর্যন্ত অর্জন	ড. মোঃ খালেদ হোসেন	৪৯
১৭.	Developing a Strong Food Safety Culture	Prof. Shah Monir Hossain	৫৩
১৮.	নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তি জনগণের অধিকার	এ. কে. এম. নূরুল আফসার	৫৫
১৯.	নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণ	শ্যামল দত্ত	৫৭
২০.	জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন ও নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনে মৎস্য খাতের গুরুত্ব ও ভবিষ্যতের জন্য প্রাধিকারসমূহ	সৈয়দ মাহবুবুল হক	৫৯
২১.	টেকসই উন্নয়নের জন্য খাদ্য নিরাপত্তা	ড. শেখ মোহাম্মদ আব্দুর রউফ	৬২
২২.	নিরাপদ খাদ্যঃ প্রয়োজন সবার দায়িত্বশীল অংশগ্রহণ	ডাঃ শাহ মাহফুজুর রহমান	৬৫
২৩.	খাদ্য এবং নিরাপদ খাদ্য তৈরির পটভূমি	অধ্যাপক ড. এম. আকতারুজ্জামান	৬৭
২৪.	জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় নিরাপদ মৎস্য খাদ্য নিশ্চিতকরণ	ড. মোঃ ইনামুল হক	৭১
২৫.	নিরাপদ খাদ্য ও জনস্বাস্থ্য	ড. মোঃ হাফিজুর রহমান	৭৫
২৬.	নিরাপদ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে অপচয়রোধ	ড. তরুণ কান্তি শিকদার	৭৭
২৭.	নিরাপদ ও নির্ভেজাল খাদ্য: সমস্যার স্বরূপ ও উত্তরণের উপায়	ড. আবু সাদেহ্ মোস্তফা কামাল	৮১
২৮.	টেকসই উন্নয়নে নিরাপদ প্রাণিজ খাদ্য : জনস্বাস্থ্য ঝুঁকি ও করণীয়	আবু সফিন ছালেহ মো. যুবেরী	৮৩
২৯.	নিরাপদ খাদ্যের নিশ্চয়তা বিধানে নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩-এর গুরুত্ব	অনিমা রানী বিশ্বাস	৮৮
৩০.	টেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রা অর্জনে নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনার ভূমিকা: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ	মোঃ ইমরুল হাসান, মোঃ মাসুদ আলম	৯০
৩১.	নিরাপদ খাদ্যে সুন্দর আগামী	আতাউর রহমান মিটন	৯৩
৩২.	খাদ্য নিরাপত্তা ও নিরাপদতা: প্রেক্ষিত ভিশন ২০২১ ও সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	সমীর কুমার বিশ্বাস	৯৫
৩৩.	বাংলাদেশে উদ্যানতাত্ত্বিক ফসলের গুণগতমান ও নিরাপদতা নিশ্চিতকরণ	ড. মোহাঃ কামরুল হাছান	৯৮
৩৪.	নিরাপদ খাদ্য: কি এবং কেন	মানসুরা মকবুল	১০৩
৩৫.	প্রাণিজ আমিষ, নিরাপদ পুষ্টি ও মেধাসমৃদ্ধ বাংলাদেশ	ডা. কুলসুম বেগম চৌধুরী	১০৫
৩৬.	নিরাপদ খাদ্য দর্শন	রবিদাস ঠাকুর	১০৭
৩৭.	খাদ্য নিরাপত্তা ও বাংলাদেশ	ড. রোকসানা হক, ড. আফিফা খাতুন, মো. আশিকুর রহমান	১১১
৩৮.	ফটো গ্যালারী		১১৩

নিরাপদ খাদ্যপ্রাপ্তিতে সরকারের অঙ্গীকার
বাস্তবায়নে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের অগ্রযাত্রা

মোহাম্মদ মাহফুজুল হক

ভূমিকা:

বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেছে। জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা ও সুষম পুষ্টি নিশ্চিত করে সুস্থ্য সবল জাতি গঠনের পূর্বশর্ত হলো নিরাপদ খাদ্যপ্রাপ্তি। দেশের জনগণের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত, ভেজালমুক্ত ও নিরাপদ খাদ্যপ্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার ১০ অক্টোবর ২০১৩ সালে যুগান্তকারি নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ প্রণয়ন করে। আইনটি ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখে কার্যকর হয় এবং ২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখে একটি জাতীয় বিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ গঠিত হয়।

বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছালেও এখনো দেশের প্রায় অর্ধেক মানুষ বিশেষকরে নারী ও শিশুরা পুষ্টিহীনতায় এবং নানাবিধ খাদ্য ও পানিবাহিত রোগে ভুগছে। এ অবস্থা দূরীকরণে সবার জন্য নিরাপদ খাদ্যপ্রাপ্তির কোনো বিকল্প নাই। এ কথা অনস্বীকার্য যে, দেশে সবার জন্য নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করে সুস্থ্য ও সমৃদ্ধ জাতি গঠনের মাধ্যমেই অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জন করতে হবে।

রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য:

নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে অর্থাৎ বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির যথাযথ অনুশীলনের মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্যপ্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিতকরণে খাদ্য উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ, বিপণন ও বিক্রয় সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সমন্বয়ের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষেরঅগ্রযাত্রা অব্যাহত রয়েছে: এরই ধারাবাহিকতায় খাদ্যশৃঙ্খলের প্রতিটি ধাপে নিরাপদতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে কর্তৃপক্ষকর্তৃক রূপকল্প এবং অভিলক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

রূপকল্প: জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সকলের জন্য নিরাপদ খাদ্য।

অভিলক্ষ্য: নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থা, খাদ্য শিল্প ও খাদ্যব্যবসায়ী এবং সুশীলসমাজকে সাথে নিয়ে যথাযথ বিজ্ঞানসম্মত বিধি-বিধান তৈরি, নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন শিকল পরিবীক্ষণ এবং খাদ্য ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত সংস্থাসমূহের কার্যক্রম সমন্বয়ের মাধ্যমে ভোক্তার জীবনমান ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা।

সুদৃঢ় প্রত্যয়ে দীপ্ত অগ্রযাত্রা:

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ ২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখে গঠিত হলেও মাত্র ০৩ বছর বয়সের এ জাতীয় প্রতিষ্ঠানটি সুদৃঢ় প্রত্যয়ে অগ্রযাত্রা শুরু করেছে। ইতোমধ্যে কর্তৃপক্ষ মানুষের সুস্বাস্থ্য রক্ষার্থে নিরাপদ খাদ্যপ্রাপ্তি সহজলভ্য করার লক্ষ্যে নিম্নোক্ত বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে:

- বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের কৌশলগত পরিকল্পনা (২০১৭-২০২১) প্রণীত হয়েছে। ৩৩ সদস্য বিশিষ্ট জাতীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা পরিষদ এবং ৪০ সদস্য বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি পরিকল্পনা প্রণয়নে বাস্তবায়নে সক্রিয় রয়েছে। এছাড়াও নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ বাস্তবায়নে সহায়তা ও পরামর্শ প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে ৮টি টেকনিক্যাল ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করা হয়েছে। নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এর অধীনে নিম্নোক্ত ৪টি প্রবিধানমালা এবং ২টি বিধিমালা ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে:
  ১. নিরাপদ খাদ্য (খাদ্যদ্রব্য জব্দকরণ ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ পদ্ধতি) বিধিমালা, ২০১৪;
  ২. নিরাপদ খাদ্য (কারিগরি কমিটি) বিধিমালা, ২০১৭;
  ৩. খাদ্যের নমুনা সংগ্রহ, পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ প্রবিধানমালা, ২০১৭;
  ৪. খাদ্য-সংযোজন দ্রব্য ব্যবহার প্রবিধানমালা, ২০১৭;
  ৫. মোড়কাবদ্ধ খাদ্য লেবেলিং প্রবিধানমালা, ২০১৭; এবং
  ৬. নিরাপদ খাদ্য (রাসায়নিক দূষক, টক্সিন ও ক্ষতিকর অবশিষ্টাংশ) প্রবিধানমালা, ২০১৭।
- এছাড়াও নিরাপদ খাদ্য সংশ্লিষ্ট সকল ধরণের কার্যক্রম সমন্বয়ের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রন করার লক্ষ্যে খাদ্যে স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ সংরক্ষণ এবং প্রক্রিয়াকরণ প্রবিধানমালা, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ (কর্মচারি) চাকুরী প্রবিধানমালা, নিরাপদ খাদ্য (খাদ্য ব্যবসায়ির বাধ্যবাধকতা) প্রবিধানমালা এবং নিরাপদ খাদ্য (খাদ্যস্পর্শক) প্রবিধানমালা প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

মোহাম্মদ মাহফুজুল হক
চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ

- নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এর ক্ষমতাবলে ৬৪টি জেলায় এবং ৬টি মেট্রোপলিটন এলাকায় মোট ৭১টি বিশুদ্ধ খাদ্য আদালত গঠন করা হয়েছে;
- উৎপাদনকৃত এবং আমদানিকৃত খাদ্যপণ্যের নিরাপদতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যেনিরাপদ খাদ্য পরিদর্শক কর্তৃক সংগৃহিত নমুনা পরীক্ষণের জন্য ৫০টি সরকারি/স্বায়ত্বসাশিত প্রতিষ্ঠানের গবেষণাগারকে নেটওয়ার্কভুক্ত করে সমন্বিতভাবে খাদ্য নমুনা বিশ্লেষণের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের ১টি এবং চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের ১টি সহ মোট ৯টি খাদ্য পরীক্ষাগারকে ডেজিগনেট করা হয়েছে।
- খাদ্য স্থাপনা পরিদর্শন, নমুনা সংগ্রহ ও গবেষণাগারে প্রেরণ, মামলা দায়ের ও পরিচালনায় সহায়তা, ইত্যাদির জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, খাদ্য অধিদপ্তর, সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাসমূহের মোট ৭২৫জন স্যানেটারি ইন্সপেক্টরকে 'নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শক' হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। ২০১৬-২০১৭ বছরে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়োজিত নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শক কর্তৃক সর্বমোট ১৬২২৩টি খাদ্যনমুনা সংগ্রহ করে বিশ্লেষণের জন্য গবেষণাগারে প্রেরণ করা হয়েছে এবং বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের পক্ষে মোট ৫১৩টি মামলা দায়ের করা হয়েছে;
- Dublin Institute of Technology(DIT)-এর সহায়তায় বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪ বছর মেয়াদি ফুড সেফটি ম্যানেজম্যান্ট এন্ড রেগুলেটারী এ্যাফেয়ার্স বিষয়ে স্নাতক কোর্স চালুর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।
- খাদ্যে ভেজাল ও দূষণ রোধকল্পে জনগণকে সচেতন করার লক্ষ্যে ৮টি বিভাগীয় এবং ৪টি জেলা শহরে কর্মশালা, র‍্যালি এবং উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে সকল জেলা ও উপজেলায় জনসচেতনামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। নিরাপদ খাদ্য বিষয়ে জনগণকে সচেতন ও সক্রিয় করার নিমিত্ত ইতোমধ্যে যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে সেগুলো হলো:
  - (ক) জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে নিরাপদ খাদ্যবিষয়ক ১৪ লক্ষ পোস্টার, প্যাম্পলেট ও স্টিকার ইত্যাদি প্রচারসামগ্রী বিতরণ;
  - (খ) পাবলিক মিটিং, মাইকিং এবং নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক ভিডিও প্রদর্শনী;
  - (গ) দৈনিক পত্রিকা এবং টেলিভিশন চ্যানেলসমূহে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক বার্তা, শ্লোগান, স্ক্রল নিউজ, ফেইসবুক ক্যাম্পাইন, মোবাইল ফোনে ম্যাসেজ প্রদানসহ অন্যান্য প্রচারণা;
  - (ঘ) হোটেল রেস্টুরেন্টে খাদ্য কর্মীদের হাইজিন সেনিটেশন এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অনুসরণে উদ্বুদ্ধ করার জন্য প্রচারপত্র, এ্যাপ্রোন, হ্যান্ড গ্লোবস, মাথার চুল ঢাকার টুপি ইত্যাদি উপকরণ বিতরণ; এবং হাইজিন বুকলেট প্রদান।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনে নীতি ও কৌশল:

বৈশ্বিক দারিদ্র দূরীকরণ এবং মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশসহ বিশ্ব নেতৃবৃন্দের স্বাক্ষরে প্রণীত এবং জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত হয়েছে Sustainable Development Goals (SDGs) বা টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) ২০৩০। এসডিজিতে রয়েছে ১৭টি অভীষ্ট এবং ১৬৯টি লক্ষ্যমাত্রা। নিরাপদ খাদ্য সংশ্লিষ্ট অভীষ্টগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যমাত্রাসমূহ হলো:

এসডিজি- ২.১ ২০৩০ সালের মধ্যে সকল মানুষ, বিশেষ করে, অরক্ষিত পরিস্থিতিতে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী, দরিদ্র জনগণ ও শিশুদের জন্য বিশেষ অগ্রাধিকারসহ বছরব্যাপী নিরাপদ, পুষ্টিকর ও পর্যাপ্ত খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করে ক্ষুধার অবসান ঘটানো।

এসডিজি-৩.৩ ২০৩০ সালের মধ্যে এইডস, যক্ষ্মারোগ, ম্যালেরিয়া ও উপেক্ষিত রোগসমূহের মহামারির অবসান ঘটানো এবং হেপাটাইটিস, পানিবাহিত রোগ ও অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধির মোকাবেলা করা;

এসডিজি- ৩.৯ ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্যাদি এবং বায়ু, পানি ও ভূমি দূষণ ও সংক্রামক ব্যাধি ও মৃত্যুর সংখ্যা ২০৩০ সালের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমিয়ে আনা;

এসডিজি- ৬.২ ২০৩০ সালের মধ্যে সকলের জন্য পয়ঃনিষ্কাশন নিশ্চিতকরা এবং খোলা জায়গায় মলত্যাগের অবসান ঘটানো;

এসডিজি- ১২.৪ ২০২০ সালের মধ্যে সর্বসম্মত আর্ন্তজাতিক পরিকাঠামো অনুযায়ী রাসায়নিক পদার্থ ও সবধরনের ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার মাধ্যমে বায়ু, পানি ও মাটিতে এদের নিঃসরণের মাত্রা উল্লেখযোগ্যহারে কমিয়ে আনা।

নিরাপদ খাদ্য সংশ্লিষ্ট উক্ত লক্ষ্যসমূহ অর্জনের মাধ্যমে বাংলাদেশের সকল মানুষের জন্য নিরাপদ খাদ্যপ্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইতোমধ্যে ৫ বছর মেয়াদী কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রয়েছে। তবে, এ বিশাল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হলে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায় হতে শুরু করে স্থানীয় পর্যায় পর্যন্ত সরকারি, বেসরকারি এবং খাদ্য সংশ্লিষ্ট সকল পর্যায়ের অংশীজনের উদ্যোগে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে।

এসডিজি ২০৩০ অর্জনে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ যে সকল নীতি ও কৌশল অনুসরণ করে কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে তা হলো:

- নিরাপদ খাদ্য সংশ্লিষ্ট ভোক্তা স্বার্থ সংরক্ষণ প্রথম ও সর্বাগ্রে;
- সিদ্ধান্ত গ্রহণে বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ও পরামর্শের সর্বোত্তম ব্যবহার;
- নিরাপদ খাদ্য সংশ্লিষ্ট আইন-কানুনের ফলপ্রসূ ও যথাযথ প্রয়োগ;
- সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও অংশীজনের সাথে আলোচনা এবং অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কার্য সম্পাদন;
- স্বাধীন, উন্মুক্ত ও স্বচ্ছভাবে কার্যক্রম পরিচালনা; এবং
- জবাবদিহিতাসহ এবং সকল সম্পাদিত কার্যাদির দায়দায়িত্ব গ্রহণ।

জাতীয় খাদ্যনীতি ২০০৬, ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, রূপকল্প- ২০২১ এবং এসডিজি- ২০৩০ এর লক্ষমাত্রাসমূহ বিবেচনায় নিয়ে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত ৫ বছর মেয়াদী কৌশলগত পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহ নিম্নরূপ:

কৌশলগত লক্ষ্য ১: নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষকে স্টেট-অব-দ্যা-আর্ট তথা সেন্টার অব এক্সিলেন্স এবং জাতীয় পর্যায়ে একটি উপযুক্ত ও কার্যকর কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ হিসেবে গড়ে তোলা;

কৌশলগত লক্ষ্য ২: খাদ্য নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত সকল নীতিমালা, আইন-কানুন এবং খাদ্য ও খাদ্যোপকরণের নিরাপদ মান নিশ্চিত করা এবং পাশাপাশি সকল নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শককে উপযুক্তভাবে প্রশিক্ষিত এবং দক্ষতার সাথে নিজ দায়িত্ব পালন করার বিষয়টি নিশ্চিত করা;

কৌশলগত লক্ষ্য ৩: খাদ্য নিয়ন্ত্রণের সংগে জড়িত সকল সরকারি সংস্থা ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ফলপ্রসূ ও ধারাবাহিকভাবে নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এর যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করা এবং এতৎসংক্রান্ত কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন;

কৌশলগত লক্ষ্য ৪: নিরাপদ খাদ্য নীতিমালা প্রণয়ন, বিধি-প্রবিধান প্রণয়ন, কার্যকর এবং প্রয়োগ করতে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির অনুশীলন করে যথাযথ ও নিরপেক্ষ পরামর্শ দেয়ার জন্য জাতীয় পর্যায়ে বিজ্ঞানভিত্তিক উপদেশ প্রদান সংক্রান্ত পদ্ধতিগত ব্যবস্থা প্রবর্তন বা কাঠামো গঠন;

কৌশলগত লক্ষ্য ৫: খাদ্য নিয়ন্ত্রন কার্যাবলীর সমর্থনে খাদ্য পরীক্ষাগারের পর্যাপ্ত সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ এবং জাতীয় খাদ্য পরীক্ষাগার নেটওয়ার্ক শক্তিশালীকরণ। পাশাপাশি খাদ্যবাহিত রোগ এবং পশুরোগ সৃষ্টি ও বিস্তারের (ডিফিউশন এবং ট্রান্সমিশন) ওপর নজরদারি ব্যবস্থার আধুনিকায়ন; এবং

কৌশলগত লক্ষ্য ৬: সর্বোচ্চমানে নিরাপদ খাদ্য কমপ্লায়েন্স প্রতিপালনের লক্ষ্যে উৎসাহ যোগাতে সকল অংশীজন বিশেষতঃ খাদ্যশিল্পের সাথে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ ও সম্পৃক্ত থাকা এবং নিরাপদ খাদ্য সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

এক নজরে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহিত কার্যকর্মের বাস্তবায়ন।

• নিরাপদ খাদ্য বিধিমালা ও প্রবিধানমালা প্রকাশ	৬ টি
• নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের পক্ষে দায়েরকৃত মামলা	৪৯৩ টি
• নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শক কর্তৃক নমুনা সংগ্রহ	১৬২২৩ টি
• নিরাপদ খাদ্য আইনে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা	৫২৮ টি
• নিয়মিত বাজার পরিদর্শন	১০ টি
• বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের কৌশলগত পরিকল্পনা ও পথ নকশা প্রণয়ন	২০১৭-২০২১ সাল
• সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদন (৩৬৫ জনবল বিশিষ্ট)	অনুমোদিত
• বিশুদ্ধ খাদ্য আদালত স্থাপন	৭১ টি
• বিভাগ, জেলা ও উপজেলায় নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক সচেতনতামূলক কার্যক্রম	১২ টি
• নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শক এবং অন্যান্য অংশীজন প্রশিক্ষণ প্রদান	১৮৩ জন
• নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক সেমিনার ওয়ার্কশপ আয়োজন	১০ টি (২২০০ জন)

উপসংহার:

২০২৪ সালের মধ্যে স্বল্পোন্নত দেশের কাতার হতে বেরিয়ে মধ্যম আয়ের উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। দেশের খাদ্যশৃঙ্খলের বিভিন্ন ধাপে বিশেষ করে খাদ্য উৎপাদন হতে খাবার টেবিল পর্যন্ত খাদ্যকে জনগণের জন্য নিরাপদ করা খুবই জরুরি। এক্ষেত্রে নিরাপদ খাদ্যপ্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে খাদ্য উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ, বিপণন ও বিক্রয় সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক পর্যায়ে সমস্যাবলী এবং চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করে উত্তোরণের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। দেশে মানুষের জন্য খাদ্য নিরাপত্তার পাশাপাশি নিরাপদ খাদ্য সংস্থানের মাধ্যমে এসডিজি'র অভীষ্টসমূহ অর্জনে পর্যাপ্ত বিনিয়োগ, দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনশক্তি নিয়োগ, বিএফএসএর কার্যক্ষেত্র সম্প্রসারণ, ক্ষমতা বৃদ্ধি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে খাদ্যশৃঙ্খলের নিরাপদতার মান উন্নয়ন, তদারকি আইনের প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ পরামর্শ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রয়োগ এবং সর্বোপরি আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্ব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ মাত্র তিন বছরের একটি নবীন সংস্থা; এ সংস্থাকে যথাযথভাবে কার্যকর এবং শক্তিশালী করার জন্য সরকারের ও রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায়ের দিকনির্দেশনা মুখ্য ভূমিকা পালন করবে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের আজীবন লালিত স্বপ্ন ছিল এদেশের গণমানুষের কল্যাণ নিশ্চিত করা। তাঁর এই স্বপ্নকে বাস্তব করার নিমিত্ত বর্তমান সরকার নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করেছে। ফলশ্রুতিতে সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের উন্নয়নশীল দেশ, ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং ২০৪১ সালে উন্নত দেশ হিসেবে বাংলাদেশ আত্মপ্রকাশ করবে এবং দেশের সকল মানুষের নিরাপদ খাদ্যপ্রাপ্তি নিশ্চিত হবে- এ প্রত্যাশা সকলের।

জাতীয় নিরাপদ
খাদ্য দিবস ২০১৮

খাদ্যনিরাপত্তা অর্জনে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

ড. মোঃ আলী আকবর

ভূমিকা

মানুষের বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য অপরিহার্য এবং খাদ্যের মূল উৎস হলো কৃষি। কৃষি আমাদের সংস্কৃতির অনিবার্য অনুষঙ্গ। বাংলাদেশের মতো একটি কৃষিপ্রধান দেশে কৃষি উন্নয়ন মূলত জাতীয় উন্নয়নেরই সমার্থক। দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জীবন জীবিকা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির ওপর নির্ভরশীল। কৃষিতে অভাবনীয় উন্নয়ন সাধন করায় বিশ্বদরবারে বাংলাদেশ আজ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশ আজ খাদ্য নিরাপত্তায় ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন করেছে। সেই সাথে ক্রমাগতভাবে মাছ, মাংস, দুধ, ডিম, ফল ও শাকসবজির উৎপাদনও বৃদ্ধি পাচ্ছে দ্রুতগতিতে। দারিদ্র্য বিমোচন ও খাদ্য নিরাপত্তা বিধানে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি যথেষ্ট সহায়ক হয়েছে। বহুলাংশে এ সফলতার গর্বিত অংশীদার বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়।এখন প্রয়োজন খাদ্য পুষ্টি এবং খাদ্য নিরাপদতা নিশ্চিত করা। দেশের অর্থনৈতিক মুক্তির চাবিকাঠি তাই কৃষি ও কৃষকের উন্নয়ন তথা গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশকে অবারিত করার মাঝেই নিহিত। এজন্য প্রয়োজন দক্ষ জনবল, প্রয়োজন উচ্চ প্রশিক্ষিত কৃষিবিদ ও কৃষিবিজ্ঞানী। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশ পৃথিবীতে চাল উৎপাদনে ৪র্থ অবস্থানে, সবজি উৎপাদন হারের ভিত্তিতে ৩য়, আম উৎপাদনে ৭ম, মাছ উৎপাদনে ৫ম, পেয়ারা উৎপাদনে ৮ম অবস্থানে রয়েছে এবং দেশের জিডিপিতে কৃষি খাতের অবদান ১৬ শতাংশ। স্বাধীনতার পর হতে গত প্রায় পাঁচ দশকে কৃষি জমি আশঙ্কাজনকভাবে হ্রাস পেলেও শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে চারগুণেরও বেশি।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশে ভেজাল এবং অনিরাপদ খাদ্যজনিত রোগ বর্তমানে জনস্বাস্থ্যের ক্রমবর্ধমান সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত। তাই নিরাপদ খাদ্য আধুনিক জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। খাদ্যশৃঙ্খলে তথা খাদ্য উৎপাদন, পরিবহন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং খাদ্যগ্রহণ প্রক্রিয়ার যে কোনো পর্যায়ে খাদ্যের গুণগতমান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং খাদ্য অনিরাপদ হতে পারে। আমাদের এখন নিরাপদ খাদ্যের দিকে নজর দিতে হবে। খাদ্য উৎপাদন থেকে শুরু করে ভোক্তার পাত পর্যন্ত খাদ্যের গুণগত মান নিশ্চিত রাখা একটি বড় সরকারি ও বেসরকারি দায়িত্ব। খাদ্যশিল্পের দায়িত্ব উৎপাদিত খাদ্যসামগ্রী দ্বারা স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রতিষ্ঠানসমূহ এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য আধুনিক মান নির্ধারণ ব্যবস্থাপনা করতে আইনগতভাবে বাধ্য।

কৃষি শিক্ষায় বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

খাদ্য-শস্য উৎপাদনসহ কৃষির এই বিরল সাফল্য অর্জনে দেশের লাখো-কোটি কৃষকের পাশাপাশি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উত্তীর্ণ কৃষিবিদদের রয়েছে উল্লেখযোগ্য অবদান। ক্রমবর্ধমান বিপুল জনসংখ্যার বাংলাদেশে মানসম্মত উচ্চতর কৃষি শিক্ষাদান এবং কৃষি উন্নয়নের গুরুদায়িত্ব বহনে সমর্থ দক্ষ কৃষিবিদ, গবেষক ও প্রযুক্তিবিদ তৈরি করাই বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। বাংলাদেশে কৃষির ক্রমোন্নতি ও খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত দক্ষ কৃষিবিজ্ঞানীদের প্রায় সবাই ময়মনসিংহে অবস্থিত এ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি অর্জন করেছেন, যা আমাদের জন্য নিঃসন্দেহে গর্বের বিষয়।

ভেটেরিনারি ও কৃষি অনুষদ নামে দুটি অনুষদ নিয়ে ১৯৬১ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কয়েক মাসের মধ্যেই পশুপালন অনুষদ নামে তৃতীয় অনুষদের যাত্রা শুরু। এরপরে ১৯৬৩-৬৪ শিক্ষাবর্ষে কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীণ সমাজবিজ্ঞান অনুষদ, ১৯৬৪-৬৫ শিক্ষাবর্ষে কৃষি প্রকৌশল ও কারিগরি অনুষদ এবং ১৯৬৭-৬৮ শিক্ষাবর্ষে মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়। বর্তমানে ছয়টি অনুষদের আওতায় ৪৪টি শিক্ষা বিভাগের তত্ত্বাবধানে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। স্নাতকোত্তর পর্যায়ে মোট ৪৪টি বিষয়ে একটানা তিন সিমেস্টারে বিন্যস্ত কোর্স-ক্রেডিট ও গবেষণাভিত্তিক এম.এস. শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। পিএইচ.ডি. ডিগ্রি কার্যক্রম পূর্ণকালীন ৩ বছর মেয়াদি। বর্তমানে ৪৩টি শিক্ষা বিভাগে ৪২ বিষয়ে পিএইচ.ডি. কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

কৃষি গবেষণায় বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের রয়েছে বর্ণাঢ্য গবেষণা সাফল্য। গবেষণা প্রকল্পসমূহ সুষ্ঠুভাবে সমন্বয় ও ব্যবস্থাপনার স্বার্থে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর থেকে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় রিসার্চ সিস্টেম (বাউরেস)-এর তত্ত্বাবধানে ১৯২টি গবেষণা প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং বর্তমানে এর চলমান প্রকল্প সংখ্যা ৪৩২টি। বিদেশি অর্থায়নে চলমান মোট গবেষণা প্রকল্পের সংখ্যা ২২টি। অর্থায়নকারী দেশের মধ্যে বাংলাদেশ, জার্মানি, জাপান, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া, সুইডেন, নরওয়ে, ডেনমার্ক অন্যতম। বাউরেস-এর তত্ত্বাবধানে ৬টি অনুষদের মাধ্যমে ১৪০টি প্রযুক্তি মাঠপর্যায়ে হস্তান্তর করা হয়েছে। কৃষক পর্যায়ে হস্তান্তরিত প্রযুক্তিগুলোর মধ্যে সম্প্রতি গবেষণালব্ধ ৯টি কৃষি প্রযুক্তির প্যাটেন্ট রাইট অর্জন করেছে। বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ফসল ও প্রাণির রোগ দমন পদ্ধতি, ভ্যাকসিন, শস্য ও মাছের জাত ও উৎপাদনের আধুনিক প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক শস্যের জাত ও উৎপাদন প্রযুক্তিসমূহের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে বাউ-৬৩, বাউধান -২, নামে উফশী ধানের জাত; বরই-এর জনপ্রিয় জাত বাউকুল, 'সম্পদ' ও 'সম্বল', বাউ-এম/৩৯৫, বাউ-এম/৩৯৬ নামে ৪টি উফশী সরিষা

ড. মোঃ আলী আকবর
ভাইস-চ্যান্সেলর, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

জাত; ডেভিস, ব্র্যাগ, সোহাগ, জি-২ ও বিএস-৪ নামে ৫টি সয়াবিন জাত; কমলা সুন্দরী ও তৃপ্তি নামে আলুর জাত; লতিরাজ, বিলাসী ও দৌলতপুরী নামে তিনটি মুখীকচু জাত; কলা ও আনারস উৎপাদনের উন্নত প্রযুক্তি, রাইজোবিয়াল জৈব সার উৎপাদনে প্রযুক্তি; সহেল টেস্টিং কিট; পেয়ারা গাছের মড়ক নিবারণ পদ্ধতি; বীজের স্বাস্থ্য পরীক্ষা সহজ পদ্ধতি, সৌরতাপের সাহায্যে পাট ও ধান বীজের ফাংগাস আক্রমণ নিয়ন্ত্রণ, অ্যারোবিক পদ্ধতিতে ধান চাষ প্রযুক্তি, সেচ সাশ্রয়ী শুকনো পদ্ধতিতে বোর ধান চাষ পদ্ধতি। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) জার্মপ্লাজম সেন্টার কর্তৃক ৬টি নতুন জাতের রঙিন আলুর জাতসহ ৮১টি বিভিন্ন প্রজাতির ফলের জাত বের করা হয়েছে। এছাড়া ২২০ প্রজাতির ১০,৫০০ মাতৃগাছসহ ২১২টি আমের, পেয়ারার ৪৭টি, লিচুর ৩২টি, ৪৮ রকমের সাইট্রাস ফল ও ৬৮ জাতের ঔষধী গাছ, ৯৮ জাতের কাঁঠালসহ বিশ্বের ৪৯টি দেশ থেকে আনা নানা ফলের জার্মপ্লাজম রয়েছে এখানে। আফ্রিকান বৈগুনের অঙ্গজ প্রজনন, গার্লিক ট্যাবলেট, এলামনডা ট্যাবলেট, আইপিএম ল্যাব বায়োপেস্টিসাইড, বিলুপ্তপ্রায় শাকসবজি ও ফলের জার্মপ্লাজম সংরক্ষণ ও মলিকুলার বৈশিষ্ট্য শনাক্তকরণ কলাকৌশল, বিভিন্ন প্রকার সবজি অগ্রবর্তী লাইন ও হাইব্রিড জাত এবং মানুষ ও পশুখাদ্য হিসেবে কাসাবার বহুবিধ ব্যবহার উদ্ভাবন প্রভৃতি অন্যতম।

মোরগ-মুরগির রানিক্ষেত রোগ ও ফাউল পক্সের প্রতিষেধক টিকা উৎপাদন, হাঁসের প্লেগ ভ্যাকসিন ও হাঁস-মুরগির ফাউল কলেরার ভ্যাকসিন তৈরি, রানিক্ষেত রোগ সহজেই সনাক্তকরণের মলিকুলার পদ্ধতির উদ্ভাবন, মুরগির সালমোনোসিস রোগ শনাক্তকরণ প্রযুক্তি উদ্ভাবন, প্রাণীজ কৃষি উন্নয়নে উদ্ভাবিত প্রযুক্তির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো হাঁস-মুরগির টিকা উৎপাদন, সালমোনেলা বাইভ্যালেন্ট ভ্যাকসিন, বিসিআরডিভি ভ্যাকসিন, আরডিভি ভ্যাকসিন উদ্ভাবন, মুরগি ও গবাদিপশুর ক্যাম্পাইলোব্যাকটার সনাক্তকরণের প্রযুক্তি উদ্ভাবন, পিপিআর রোগ শনাক্তকরণে পদ্ধতি, বার্ড ফ্লু ডায়াগনোসিস করার মলিকুলার পদ্ধতি, কমিউনিটি ভিত্তিক উৎপাদনমুখী ভেটেরিনারি সেবা, গবাদিপশুর ভ্রূণ প্রতিস্থাপন, ছাগল ও মহিষের কৃত্রিম প্রজনন, কৃত্রিম প্রজননে ব্যবহৃত ষাঁড়ের অগ্রাম ফার্টিলিটি নির্ণয়, হরমোন পরীক্ষার মাধ্যমে গরু ও মহিষের গর্ভ নির্ণয়, গাভীর উলান প্রদাহ রোগ নির্ণয় কিট উদ্ভাবন ও প্রতিরোধ কৌশল, ভেড়ার কৃত্রিম প্রজননে হিমায়িত ভ্রূণ সংরক্ষণ এবং স্থানান্তরের মাধ্যমে বাচ্চা প্রসবে সাফল্যতা লাভ।

গো-খাদ্য হিসেবে খড়ের সঙ্গে ইউরিয়া মোলাসেস ব্লক উদ্ভাবন ও ব্যবহার, বাউ ব্রো-কালার, বাউ ব্রো-হোয়াইট নামের ব্রয়লার মুরগির জাত উদ্ভাবন, রেড চিটাগাং জাতের গরুর বনজারভেশন, দুর্লভ জাতের ফডার জার্মপ্লাজম, হাঁস-মুরগির সুষম খাদ্য তৈরি, গবাদিপশুর খাদ্য হিসেবে ফডার খেসারি চাষ, ফডার 'হে' সংরক্ষণ, গ্রামের বসতবাড়িতে চরে খাওয়া অবস্থায় উন্নতজাতের হাঁস-মুরগি পালন, হাওর এলাকায় হাঁস পালনের কলাকৌশল, সুষম পোল্ট্রি খাদ্য, দেশি জাতের গরুর সঙ্গে আমেরিকান ব্রাহমা গরুর কৃত্রিম প্রজননে দ্রুত বর্ধনশীল গরুরজাত, হাঁস-মুরগির উন্নত জাত উদ্ভাবন, মহিষের কৃত্রিম ভ্রূণ উৎপাদন প্রযুক্তি, গবাদিপশু মোটাতাজাকরণে প্লানটেইন উদ্ভিদ চাষ এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে স্বাস্থ্যসম্মত দই, মাখন, ঘি ইত্যাদি দুগ্ধজাত খাবার উৎপাদনের প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও বিপণন; কৃষি অর্থনীতি বিষয়ে মাঠপর্যায়ে বিভিন্ন অনুসন্ধানী গবেষণা তৎপরতার মাধ্যমে টেকসই শস্যবীমা কার্যক্রম, শস্যবহুমুখীকরণ, মুক্ত জলাশয়ে মৎসচাষীদের প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ সহায়তা দান ও বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের সমবায় সংগঠনকে সুসংহতকরণে বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ নীতিনির্ধারণী সুপারিশ প্রণয়ন, কৃষি অর্থনীতিতে নবায়নযোগ্য জ্বালানির ভূমিকা, বাংলাদেশে কৃষি পরিবারের বায়োগ্যাস উৎপাদনের দক্ষতার ওপর গবেষণা এবং কৃষক পর্যায়ে সম্প্রসারণ, শস্য, মৎস্য, পোল্ট্রি, ডেইরি সেক্টরে ভ্যালু-চেইন এনালাইসিস কার্যক্রম, পাংগাশ ও তেলাপিয়া মাছের ভ্যালু-চেইন এনালাইসিস, কৃষি অর্থনীতিতে সেচ ও সার ব্যবস্থাপনার সঠিক কৌশল নিরূপণ, জলবায়ু পরিবর্তনে কৃষক পর্যায়ের অভিযোজনের অর্থনৈতিক মূল্যায়নের সুপারিশ জাতীয় পর্যায়ে প্রদান অন্যতম।

স্বল্প ব্যয়ে সেচ নালা তৈরি, উন্নতধরনের লাঙ্গল ও স্প্রে মেশিন তৈরি, বাউ-জিয়া সার ও বীজ ছিটানো যন্ত্র, সৌর ড্রায়ার, বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট উদ্ভাবন, সবজি বীজ শোধন যন্ত্র, ভাইরাস শনাক্তকরণ যন্ত্র, সোলার ড্রায়ার, উন্নতধরনের হস্তচালিত টিউবয়েল পাম্প, পশুখাদ্য কাটার মেশিন, ঝিনুক চূর্ণ করার হস্তচালিত মেশিন, জ্বালানি সাশ্রয়ী উন্নত মানের দেশি চুলা, কেন্দ্রীয়ভাবে শস্য শুষ্ককরণ ব্যবস্থার উপযোগী কম্পিউটার সফটওয়ার তৈরি, খাদ্য হিসেবে গম ও ধানের ভূসির বিশেষায়িত ব্যবহার কৌশল, স্বল্প ব্যয়ে ধান কাটার মেশিন, ফলের রস সংরক্ষণের আধুনিক পদ্ধতি, পন্ড অ্যারেটর ও শাকসবজি ও ফলের জার্মপ্লাজম সংরক্ষণের বিদ্যুৎ বিহীন শীতলকরণ চেম্বার প্রযুক্তি, বিএইউ এসটিআর ড্রায়ার অল্প সময়ে ধান শুকানোর যন্ত্র আবিষ্কার; শিং ও মাগুর মাছের কৃত্রিম প্রজননের কলাকৌশল ও চাষ পদ্ধতি উদ্ভাবন, ভাসমান খাঁচায় মাছ চাষ পদ্ধতি, খাঁচায় পাঙ্গাশ চাষ, পেরিফাইটন বেইজড মৎস্য চাষ,ডাকউইড দিয়ে মিশ্র মৎস্যচাষ, মাছের জীবন্ত খাদ্য হিসেবে টিউবিফিসিড উৎপাদনের কলাকৌশল, পুকুরে মাগুর চাষের উপযোগী সহজলভ্য মৎস্য খাদ্য তৈরি, মাছের কৃত্রিম প্রজনন প্রযুক্তি উন্নয়ন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে অক্রাণু ক্রায়োপ্রিজারভেশনখাদ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার কৌশল, স্বল্প ব্যয়-মিডিয়ামে ক্লোরেলার চাষ, মাছের পোনা পালনের জন্য রটিফারের চাষ, মাছের রোগ প্রতিরোধকল্পে ঔষধী গাছের ব্যবহার এবং, রুই, কাতলা, মৃগেল, বিপন্ন প্রজাতির মাছ মহাশোল ও বাঘাইর, তারাবাইম, গুচিবাইম ও বাটা মাছের কৃত্রিম প্রজনন, নিরাপদ গুটকি তৈরির ট্যানেল উদ্ভাবন, ধানক্ষেতে মাছ ও চিংড়ি চাষ, সহজলভ্য উপায়ে মাছের তৈরি ও গুণগত মান নির্ণয় প্রযুক্তি, ফিশ বার্গার, ফিশ বল, ফিশ ফিংগারের মত জনপ্রিয় খাবার উদ্ভাবন, মাছের বিকল্প খাদ্যের জন্য ব্ল্যাক সোলজার ফ্লাই চাষ এবং বাড়ির ছাদে কীটনাশক ও রাসায়নিক সারবিহীন একইসাথে মাছ ও সবজি উলম্ব একোয়াপনিং পদ্ধতিতে চাষ করার কৌশল, ধানক্ষেতে মাছ চাষ প্রযুক্তি, ধানক্ষেতে বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়ায় মাছের আঙ্গুলি পোনা উৎপাদন, ইফকাস পদ্ধতিতে ভাসমান খাচা ও মাচায় মাছ ও সবজী উৎপাদন, জৈব সার হিসেবে পুকুরের কাদা ব্যবহার করে ঘাস উৎপাদন, গাভ মাগুরের কৃত্রিম প্রজনন, ক্ষতরোগের প্রতিকার নির্ণয় ইত্যাদি।

খাদ্য নিরাপদতা অর্জনে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

খাদ্য নিরাপদতা অর্জন বর্তমান সরকারের একটি অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত কার্যক্রম। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার দিকনির্দেশনা এবং মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরীর গতিশীল নেতৃত্বে কৃষির অভূতপূর্ণ উন্নয়ন সাধিত হয়েছে এবং বাংলাদেশ খাদ্যে বিশেষ করে নানাজাতীয় ফসলের ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জনের জন্য বহুমুখী কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। আমরা অবগতি আছি খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের জন্য তিনটি পিলার রয়েছে। যথা খাদ্যলভ্যতা (Food availability), খাদ্যপ্রাপ্তির সক্ষমতা (Food access) এবং খাদ্যের জৈবিক ব্যবহার (Food utilization)। এখন বাংলাদেশের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ হলো ১৬ কোটি মানুষের জন্য নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করা যা উল্লিখিত তৃতীয় পিলারের অন্তর্ভুক্ত। খাদ্য নিরাপদতা অর্জন করা গেলে আমরা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Sustainable Development Goal), রূপকল্প ২০২১ (Vision 2021) এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশ হবার গৌরব অর্জন করতে পারবো। এ অর্জনের জন্য আমাদের খাদ্য নিরাপদতা অর্জনের জন্য সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। পত্রপত্রিকা, ইলেকট্রনিক মিডিয়া, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, গবেষণা রিপোর্ট, ইত্যাদি থেকে দেশের মানুষের মধ্যে খাদ্য নিরাপদতা সম্পর্কে একধরনের আতঙ্ক রয়েছে। তবে বাংলাদেশে বিভিন্ন খাদ্যশৃঙ্খলে নিরাপদতা ঝুঁকি (Food Safety Risk) সম্পর্কিত গবেষণা ও গবেষণালব্ধ তথ্যের অপ্রতুলতা রয়েছে। খাদ্য নিরাপদতার মূল ঝুঁকি এবং সীমাবদ্ধতাগুলোর মধ্যে রয়েছে ফুড হাইজিন এবং স্যানিটেশনের অভাব এবং খাদ্যে অণুজীব ও রাসায়নিক (কীটনাশক, পশু ও মৎস্যরোগের ওষুধ, বৃদ্ধিনিয়ন্ত্রক, ভারী ধাতু ইত্যাদির ক্ষতিকর অবশিষ্টাংশ) দূষকের উপস্থিতি, এন্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স, উন্নত কৃষিজ অনুশীলন (Good Agricultural Practics)-এর অভাব ইত্যাদি। খাদ্য নিরাপদতা ঝুঁকিসমূহের নির্ভরযোগ্য বিশ্লেষণের জন্য দরকার দক্ষ গবেষক, আন্তর্জাতিক মানের গবেষণাগার এবং গবেষণায় জন্য পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ। আমি বিশ্বাস করি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে সক্ষম।

আমরা আশান্বিত হয়েছি যে, বাংলাদেশ সরকারের জারিকৃত নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩-এর আওতায় বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ গঠিত হয়েছে এবং কর্তৃপক্ষ সমন্বিত কার্যক্রমের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপদতা অর্জনে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে যুগোপযোগী বিধি ও প্রবিধানমালা প্রণীত হয়েছে। এখন প্রয়োজন আইন, বিধি ও প্রবিধানসমূহের যথাযথ প্রয়োগ। এরজন্য দরকার কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, প্রাণী অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তরসহ অন্যান্য খাদ্য নিরাপদতা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে কার্যকর সমন্বয়। একই সাথে দরকার খাদ্য নিরাপদতা বিষয়ে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত দক্ষ জনবল, যারা নিরাপদ খাদ্য আইন' ২০১৩ বাস্তবায়নে যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারবে। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এক্ষেত্রে অবদান রাখতে সক্ষম এবং খাদ্য নিরাপদতা ব্যবস্থাপনা বিষয়ে একটি ৪ বছর মেয়াদি বিএসসি কোর্স চালু করার নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এ প্রক্রিয়াটি অগ্রসরমান করার জন্য বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ (BFSA), জাতিসংঘের বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) এবং আয়ারল্যান্ডের ডাবলিন ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (DIT) সহায়তা প্রদান করছে। ইতিমধ্যে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে খাদ্য নিরাপদতা ব্যবস্থাপনা বিষয়ক বিভাগ (Department of Food Safety Management) খোলা হয়েছে। উক্ত ভবিষ্যৎ গ্রাজুয়েটবৃন্দ বাংলাদেশে নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩ বাস্তবায়ন এবং বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপদতা অর্জনে উল্লেখ্যযোগ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। আরো উল্লেখ্য যে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারডিসিপ্লিনারি সেন্টার ফর ফুড সিকিউরিটি (Interdisciplinary Centre for Food Security) নেদারল্যান্ড সরকারের কারিগরি ও আর্থিক সহায়তায়একটি আধুনিক ফুড সেফটি ল্যাবরেটরী প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে।

উপসংহার

বর্তমান সরকারের দারিদ্র্য বিমোচন ও খাদ্য নিরাপত্তা বিধানের প্রধান কৌশল হলো কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও সুষ্ঠু বিপণন ব্যবস্থার মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকার উন্নয়ন। ক্রমহ্রাসমান কৃষি জমি, জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশগত ভারসাম্যহীনতার প্রেক্ষিতে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির বর্তমান গতিধারাকে অব্যাহত রাখা আজকের বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। প্রতিকূল পরিবেশের জন্য উপযোগী ফসলের জাত ও সেগুলোর আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতি উদ্ভাবন করে কৃষকদের মাঝে ছড়িয়ে দেয়া কৃষি বিজ্ঞানীদের দায়িত্ব। জনগণের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে আমরা ইতোমধ্যেই সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী তৈরি করেছি এবং তার বিস্তৃতি বৃদ্ধির জন্য নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আগামী দিনগুলোতে কৃষির জন্য বড় চ্যালেঞ্জগুলো হলো পরিবেশ রক্ষা, জমির একক্প্রতি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং সকলের জন্য খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ। খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন তখনই সম্ভব হবে যখন খাদ্য নিরাপদতা নিশ্চিত হবে। খাদ্যশৃঙ্খলে প্রতিটি পর্যায়ে সঠিক ব্যবস্থাপনা এবং উন্নত কৃষিজ অনুশীলনের মাধ্যমে নিরাপদ ফসল, প্রাণীজ এবং মৎস্য জাতীয় খাদ্য উৎপাদন এবং বাজারজাত করা সম্ভব। এটি যেমন বাংলাদেশের ১৬ কোটি মানুষের জন্য নিরাপদ খাদ্য জোগাতে সাহায্য করবে তেমনি রপ্তানি বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় অতীতের ধারাবাহিকতায় আগামী দিনের এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দক্ষ গ্রাজুয়েট সৃষ্টি এবং কৃষি শিক্ষা, গবেষণা ও সম্প্রসারণ কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাবে। আমরা বিশ্বাস করি যথাযথ পরিকল্পনা ও বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে এর শিক্ষা ও গবেষণাসহ যাবতীয় কর্মকাণ্ডের বিকাশ অব্যাহত থাকবে এবং এর মধ্য দিয়েই কৃষি তথা জাতীয় উন্নয়নে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্জন আরো ফলপ্রসূ হবে। এ ধারা অব্যাহত রাখতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

Food Safety, a prime issue to protect public health

Dhiraj Kumar Nath

"One cannot think well, love well, sleep well, if one has not dined well", said Viginia Wolf while describing food as medicine. Food intake with conscientious understanding of its impact and daily physical activity combined can make a person safe and sound and as well free from any ailment to help ageing to enjoy. Safe food is thus a major influencing factor for sound and active health. Food safety is thus considered as major critical issue to protect public health and build a sound healthy nation.

According to World Health Organization and Food and Agricultural Organization, food is considered safe if there is reasonable certainty that no harm will result from its consumption. Food security exists when all people, at all times, have physical, social and economic access to sufficient, safe and nutritious food which meets their dietary needs and food preferences for an active and healthy life.

The food safety situation in Bangladesh is now alarming due to food adulteration, use of naturally occurring toxins, pesticide residues, microbiological contamination, veterinary drug resides and heavy metals. The consequences of such threats as observed in the past that 3 millions people suffered from Diarrhea during 2005-2009 and about 15 % of children died (2011) as reported by Directorate General of Health Services. The long term effects of unsafe food are so severe that lead to renal failure, liver damage and cancer and various non-communicable diseases threatening the public health in general and making the nation weak in particular.

Banned pesticides that caused serious health hazards have been found in fruits, vegetables, milk and milk products and dry fish. National Food Safety Laboratory found after examination that 40% of 82 samples contained pesticides those were banned more than one and half decades ago for high toxicity.

According to the findings of the NFSL, some regular food items like carrot, bean, tomato, lettuce, capsicum, banana, apple, pineapple, mango etc. were contaminated with toxin pesticides and presence of banned pesticides. Milk and milk products are contaminated with dangerous and poisonous particles.

Heavy metals, such as lead, chromium and arsenic accumulate in the body that might cause kidney and liver failure and develop abnormality among children. This was the observation of Sridhar Dharmapuri, Food Safety Officer of FAO few years back. Mr. Ruman Hafiz, Chairman of the Bangladesh Crop Protection Association once observed that it should be the duty of the enforcement agencies to check illegal trade of such prohibited chemicals. Food Safety Authority of Bangladesh as observed recently is taking serious actions to prevent use of such contaminants.

As at present in Bangladesh, juice and fruit drinks are mostly unsafe to drink. Rice and puffed rice full of urea, fish, milk and other green vegetables are full of formalin and chemicals and dry fish with DDT powder and burnt lubricants are used indiscriminately in the preparation of many food items. This situation is unprecedented and increasing rapidly due to the inadequate enforcement of law and absence of visible deterrent punishment to delinquents.

The Government is in process to finalize the Rules under the Food Safety Act 2013 and constituted Bangladesh Food Safety Authority. Besides, there is a plan to set up Food Courts to dispense with such cases. It is expected that government might take it as a national issue to address the crisis with firm commitments.

Dhiraj Kumar Nath
Former Secretary to the Government

This practice of adulteration and deceiving the customers was found prevalent in this sub-continent with different nature but within tolerable limits. To address the same, Pure Food Ordinance of 1959 was promulgated as a landmark, followed by Pure Food Rules, 1967 and Pure Food (Amendment) Act, 2005.

In 2005, Government constituted National Food Safety Advisory Council headed by Local Government Minister. But hardly this Council met to deliberate on these critical issues food safety.

The issue of coordination of food safety activities is prime factor to combat adulteration and bring back to track the whole process. The question of identification of level of adulteration needs laboratory test, detection of contents of mixture, legal authority to prosecute, sources of supply and production and legal agency to take the lead etc are very pertinent to streamline the system. In fact, Ministry of Health and Family Welfare, Ministry of Food, Ministry of Agriculture, Local Government Division, Ministry of Fisheries and Livestock, Ministry of Commerce, Ministry of Industry and Ministry of Home Affairs and Ministry of Information are very much concerned with food safety issues. Besides, Civil Society Organizations and mass media can also contribute much to generate awareness and control the same with strong public resistance. Food and Drug Administration was established in USA and Food Safety and Standard Authority started functioning in India with trained personnel with the capability of enforcement of law and understanding of its complications from scientific knowledge and background. Almost all countries round the world are concerned about the coordination of such complicates issues. The question of human right, detection of offence accurately and also extent of punishments are great concerns with food adulteration. Bangladesh has promulgated the Food Safety Act and constituted the Authority to ensure food safety but public expectation is to make the country free for food adulteration as quickly as possible.

Bangladesh Standard and Testing Institute were established in 1985, Consumer Right Act, 2009 was approved by the Parliament with the functioning of a Department under guidance of a Council headed by the Commerce Minister. Rapid Action Battalion is also maintaining strong vigilance to detect any such case of adulteration. In fact, there are arrangements to detect the defaulters with the laboratory test and enforce the exiting laws to combat the menace but concerted efforts are inadequate.

In addition to all, the Special Power Act 1974, Para 25 C empowers the authority to impose severe punishment. Local Government Division under its project Urban Public and Environmental Health Sector Development Project has started the construction of Food Laboratory at Chittagong and up-gradation of Food lab at Dhaka as testing laboratory and training centre with Taka 45 .00 crores through the technical support of consulting firm from FRG.

Food adulteration by unscrupulous traders, importers and manufacturers, growers and processing agencies involved in these practices are dominating the total trade since the law enforcing agencies are indifferent and the government is unconscientiously neglecting this critical threat to public health. Such adulteration is visible from "farm to pork" but who cares to control it.

In fact, there should not be any more delay to address such a public health threat after the approval of Food Safety Act, 2013, framing Rules under it and also formation of an Authority to control the same. A high powered coordination committee to oversee the total implementation and issue directives should play a significant role to make the authority more effective and strong to control such an alarming situation prevailing in Bangladesh.

"Crimes go unabated for lax of government watch" was the observation of a seminar held on the food safety in Bangladesh. The major point raised during discussion was whether public are taking "food or poison" in the country.

ফলমূল ও শাকসবজিতে ফরমালিন প্রয়োগ বিষয়ে বিভ্রান্তি দূরীকরনে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের

গণবিজ্ঞপ্তি

ফলমূল ও শাকসবজি সংরক্ষনে বা টাটকা ও সতেজ রাখতে ফরমালিন ব্যবহার করা হয় মর্মে জনমনে কিছু বিভ্রান্তির সঞ্চার হয়েছে। ফলে ফলমূল ও শাকসবজি গ্রহণে ভোক্তাদের মাঝে এক ধরনের ভীতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এ বিষয়ে সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ফলমূল ও শাকসবজি হচ্ছে তন্তু (ফাইবার) জাতীয় খাবার যেখানে প্রোটিনের উপস্থিতি অত্যন্ত কম। ফরমালিন হচ্ছে ৩৭% ফরমালডিহাইডের জলীয় দ্রবণ এবং অতি উদ্বায়ী একটি রাসায়নিক যৌগ যা মূলতঃ প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবারের সাথে বিক্রিয়া করে। তাই ফলমূল বা শাকসবজি সংরক্ষনে ফরমালিনের কোন ভূমিকা নেই। উপরন্তু প্রাকৃতিকভাবেই প্রত্যেক ফলমূল ও শাকসবজিতে একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় (গড়ে ৩-৬০ মিলিগ্রাম/কেজি মাত্রায়) ফরমালডিহাইড থাকে যা মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর নয়।

এ বিষয়ে সম্প্রতি **FAO**-এর সহযোগিতায় পরিচালিত গবেষণালব্ধ ফলাফলে দেখা যায় যে, দেশের ফলমূল, শাকসবজিসহ অন্যান্য খাদ্রব্যে ফরমালডিহাইডের উপস্থিতি স্ব স্ব খাদ্যপণ্যের প্রাকৃতিক মাত্রার মধ্যেই সীমাবদ্ধ এবং একজন প্রাপ্তবয়স্ক বাংলাদেশী গড়ে যে পরিমাণ ফরমালডিহাইড দৈনিক খাবার থেকে গ্রহণ করে, তা সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রায় চেয়ে অনেক কম।

বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে ফলমূলের সংরক্ষণকাল স্বাস্থ্যসম্মতভাবে বাড়ানো যায়, যেমন আপেল সংরক্ষনে আপেলের গায়ে খাওয়ার যোগ্য মোমের পাতলা প্রলেপ দেওয়া হয় যা আপেলের শ্বসন প্রক্রিয়া ও জলীয় অংশ হ্রাস রোধ করে এবং অনুজীবের আক্রমন থেকে রক্ষা করে আপেলকে দীর্ঘদিন সতেজ ও চকচকে রাখে।

তথাপি ফলমূল ও শাকসবজি কাঁচা বা রান্না করার পূর্বে বাহ্যিক ও অনুজৈবিক দূষক হ্রাস করার জন্য নিরাপদ পানি দিয়ে ধুয়ে খাওয়ার বা রান্না করার পরামর্শ প্রদান করা হচ্ছে। রোগ প্রতিরোধকারী খাবার হিসেবে ফলমূল ও শাকসবজি প্রাত্যহিক খাবার তালিকায় থাকা অপরিহার্য। একজন প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যাক্তির প্রতিদিনের পুষ্টি চাহিদা পূরণের জন্য অন্যান্য খাবারের সাথে কমপক্ষে ১০০ গ্রাম শাক, ২০০ গ্রাম অন্যান্য সবজি ও ১০০ গ্রাম ফল খাওয়া অত্যন্ত জরুরী।

কর্তৃপক্ষ জনসাধারণের অবগতির জন্য আরো জানাচ্ছে যে, যদি কেউ ফরমালিনসহ অন্য যে কোন অননুমোদিত রাসায়নিক দ্রব্য ফলমূল, শাকসবজিসহ অন্যান্য খাদ্য সংরক্ষণে ব্যবহার করে, সেক্ষেত্রে নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩-এ কঠোর শাস্তির (৫ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা ২০ লক্ষ টাকা জরিমানা অথবা উভয়দণ্ড) বিধান রয়েছে। এছাড়াও ফরমালিন নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৫ অনুযায়ী ফরমালিনের যে কোন অননুমোদিত ব্যবহার শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
Bangladesh Food Safety Authority
জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় নিরাপদ খাদ্য
৭১-৭২ ইস্কাটন গার্ডেন, প্রবাসি কল্যাণ ভবন (১৩ তলা), ঢাকা-১০০০।
ফোন: ৫৫১৩৮০০০, ফাক্স: ৫৫১৩৮৬০২, www.bfsa.gov.bd

নিরাপদ খাদ্য ও ক্যাবের কার্যক্রম

গোলাম রহমান

খাদ্য মাত্রই নিরাপদ হওয়া জরুরি এবং এটি একজন ভোক্তার অন্যতম অধিকার। সুস্থ থাকার জন্য খাদ্য নিরাপদ হওয়া প্রয়োজন। খাদ্য শৃঙ্খলের বিভিন্ন পর্যায়ে যেমন উৎপাদন, পরিবহন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণের বিভিন্ন ধাপে খাদ্যপণ্য অনিরাপদ হতে পারে। এছাড়া গৃহস্থালীতেও খাদ্য অনিরাপদ হতে পারে। খাদ্য অনিরাপদ হতে পারে প্রধানতঃ দুই ভাবে: ভেজাল ও দূষণের মাধ্যমে।

সকলের জন্য নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সরকার কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ সরকার ২০১৩ সালে নিরাপদ খাদ্যআইন প্রণয়ন করে এবং ২০১৫ সালে এই আইনের আওতায় খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করে। দেশে নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনায় জড়িত রয়েছে দেড় ডজনের মতো মন্ত্রণালয় ও সংস্থা। বিভিন্ন সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাসহ আরও ৪৮৬টি প্রতিষ্ঠান এর সাথে জড়িত। এসব প্রতিষ্ঠানের আওতায় ১২০টির মতো আইন ও প্রবিধানমালা আছে। দেশে প্রায় ২৫ লাখ খাদ্য ব্যবসায়ী রয়েছে। অধিকাংশ ব্যবসায়ী অপ্রাতিষ্ঠানিক। খাদ্য ব্যবস্থাপনায় রয়েছে অনেক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, দোকানদার ও পথখাবার বিক্রেতা। তাই সকলের জন্য নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করা একটি চ্যালেঞ্জের বিষয়।

নিরাপদ উপায়ে কৃষি, মৎস্য, গবাদিপশু উৎপাদন করা একান্ত প্রয়োজন। এজন্য সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর মাঠ পর্যায়ে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করা, প্রশিক্ষণ দেয়া, নিয়মিত মনিটরিং করা দরকার। খাদ্যদ্রব্যে উৎপাদন পর্যায়ে কীটনাশক বা বালাইনাশক, সংরক্ষণ পর্যায়ে পচনরোধক ও প্রক্রিয়াজাতকরণের পর্যায়ে পুষ্টিবর্ধক ও স্থায়িত্ববর্ধক হিসেবে বিভিন্ন ধরণের রাসায়নিক ব্যবহার করা হয়। এসবের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার বন্ধের জন্য বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ রাসায়নিক পদার্থের সর্বোচ্চ মাত্রা নির্ধারণ করে কয়েকটি প্রবিধানমালা ইতোমধ্যে জারি করেছে। উৎপাদক, ব্যবসায়ী ও ব্যবহারকারী যাতে খাদ্যদ্রব্যে মাত্রাতিরিক্ত রাসায়নিক ব্যবহার না করে তা নিশ্চিত করার জন্যই এসব প্রবিধানমালা জারি করা হয়েছে।

নিম্নে নিরাপদ খাদ্য নিয়ে ক্যাব-এর কার্যক্রম উল্লেখ করা হলো:

পণ্য পরীক্ষণ

নিরাপদ খাদ্য নিয়ে নিয়ে ক্যাব কাজ করছে আশির দশকের শুরু থেকে। তখন থেকে বাজারে ভেজাল ও নিম্নমানের পণ্য সম্পর্কে সবসময়ই ভোক্তাদের মধ্যে সচেতনতার কাজটি ক্যাব করে আসছে। সেসময় ক্যাব বিভিন্ন খাদ্যপণ্যে প্রথম বিজ্ঞানভিত্তিক পণ্য পরীক্ষণের কাজ হাতে নেয়। ১৯৮৫ সালে ক্যাব 'সরিষার তেলে ভেজাল' শীর্ষক একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। ঢাকা শহরের ৬টি খুচরা বাজার হতে বিভিন্ন ব্রান্ডের সরিষার তেল ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষার জন্য নমুনা সংগ্রহ করা হয় এবং এর ফলাফল সে সময় প্রকাশ করা হয়। একই সময়ে সয়াবিন তেলের নমুনা বাজার হতে সংগ্রহ করেও ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করা হয়। এছাড়া হলুদ-মরিচ ও ধনিয়ার গুড়া, কনডেন্সড মিল্ক, ডালডা, বাটার অয়েল, ঘি, বনস্পতি, নারকেল তেল, কোমল পানীয় প্রভৃতি পণ্যের নমুনা ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করে বিএসটিআই-এর এসব পণ্যের মানদণ্ডের সাথে তুলনা করে প্রাপ্ত ফলাফল সাধারণ ভোক্তা, সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও ব্যবসায়ীদের করণীয় বিষয় সম্পর্কে সভা-সেমিনারে ও পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়েছে।

ইন্সটিটিউশনালাইজেশন অফ হেলদি স্ট্রিট ফুড সিস্টেম ইন বাংলাদেশ

২০০৬ সালে স্ট্রিট ফুড বা পথখাবারের ওপর পথখাবার বিক্রেতাদের ওপর ঢাকায় একটি জরিপ পরিচালনা করে ক্যাব। উক্ত জরিপে দেখা যায়, প্রায় শতভাগ পথখাবার বিক্রেতাদের মধ্যে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে খাবার তৈরি ও ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে ধারণা খুবই কম। পরবর্তীতে ২০০৮ সালে এফএও-র কারিগরি সহযোগিতায় ঢাকায় ইন্সটিটিউশনালাইজেশন অফ হেলদি স্ট্রিট ফুড সিস্টেম ইন বাংলাদেশ শীর্ষক একটি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে ক্যাব। সেসময় ঢাকার প্রায় ৪০০ জন পথখাবার বিক্রেতা ও পথখাবারের ওপর জরিপ পরিচালনা করা হয়। পথখাবার বিক্রেতাদের নিরাপদ খাদ্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও প্রশিক্ষিত ১০ জন পথখাবার বিক্রেতাদের নিকট ভেন্ডিং কার্ট বা পথখাবর বিক্রির গাড়ী ও প্রয়োজনীয় তৈজসপত্র সরবরাহ করা হয়। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার বা এফএও'র কারিগরি সহযোগিতায় ও আইসিসিডিআর'বি, ঢাকা সিটি কর্পোরেশন, জনস্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান, বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদের প্রতিনিধিদের নিয়ে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে পথখাবার তৈরি ও তা বিক্রির জন্য ভেন্ডিং কার্টের ডিজাইন করা হয়। গবেষণায় দেখা যায়, যেসব পথখাবার বিক্রেতারা প্রশিক্ষণ ও ভেন্ডিংকার্ট পেয়েছেন তারা অন্য পথখাবার বিক্রেতাদের তুলনায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রেখে স্বাস্থ্যসম্মত খাবার তৈরি করছেন এবং তাদের আয়ও অন্যান্য বিক্রেতাদের তুলনায় বেশী।

গোলাম রহমান
সভাপতি, কনজুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব)

স্ট্রিট ফুড ভেন্ডিং প্রজেক্ট ইন সাতক্ষীরা ডিস্ট্রিক্ট

সাতক্ষীরা জেলায় স্বাস্থ্যসম্মত পথখাবার তৈরি ও বিক্রির জন্য বিক্রেতাদের জন্য ২০১০ সালে একটি প্রকল্প বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির সহযোগিতায় পরিচালনা করা হয়। প্রকল্পের আওতায় প্রায় ৪০০ জন পথখাবার বিক্রেতাদের স্বাস্থ্যসম্মতভাবে পথখাবার তৈরির ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষিত ৪০ জন পথখাবার বিক্রেতাদের প্রত্যেককে একটি করে পথখাবার বিক্রির গাড়ী ও প্রয়োজনীয় তৈজসপত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে দেখা যায়, প্রশিক্ষিত পথখাবার বিক্রেতাদের আয় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য নেটওয়ার্ক ও নিরাপদ খাদ্যের ওপর সচেতনতা কার্যক্রম

২০১০ সালে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার বা এফএও'র সহযোগিতায় বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য নেটওয়ার্ক বিএফএসএন গঠিত হয়। এই নেটওয়ার্কের বর্তমানে ৫টি সদস্য সংগঠন রয়েছে, সংগঠনগুলি হলো: ক্যাব, উবিনীপ, হাঙ্গার ফ্রি ওর্য়াল্ড, বিসেফ ফাউন্ডেশন ও শিশুউক।

ক্যাব এই নেটওয়ার্কের শুরু হতে অদ্যাবধি অস্থায়ী সচিবালয় হিসেবে কাজ করছে। ক্যাব বিগত সময়ে বিভিন্ন জেলায় নিরাপদ খাদ্য নিয়ে এডভোকেসি সেমিনার, প্রাইমারি স্কুলে নিরাপদ খাদ্যের ওপর ক্যাম্পেইন পরিচালনা, প্রাইমারি স্কুলে বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস উদযাপন, প্রিন্ট ও মিডিয়ার সাংবাদিকদের জন্য নিরাপদ খাদ্যের ওপর প্রতিবেদন তৈরি ও প্রকাশের ওপর কর্মশালা ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। ক্যাবের জেলা কমিটিগুলোর মাধ্যমে বিভিন্ন জেলায় নিরাপদ খাদ্যের ওপর এডভোকেসি সেমিনার অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

ভোক্তা সচেতনতা এবং সার্টিফাইড নিরাপদ আম ও টমেটোর প্রক্রিয়াকৃত পণ্য-এর ওপর প্রকল্প

ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের আর্থিক সহযোগিতায় এসএনভি নেদারল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশনের সাথে ক্যাব ভোক্তা সচেতনতা এবং সার্টিফাইড নিরাপদ আম ও টমেটোর প্রক্রিয়াকৃত পণ্যের ওপর বর্তমানে কাজ করছে। প্রকল্পের আওতায় রাজশাহী ও নাটোর জেলায় ৫০০০ আম চাষী ও ৫০০০ টমেটো চাষীর মাধ্যমে নিরাপদ আম ও টমেটো উৎপাদন, সরবরাহ এবং প্রক্রিয়াকরণ কোম্পানির মাধ্যমে আম ও টমেটোর প্রক্রিয়াকৃত পণ্য তৈরি করা হবে। নিরাপদ আম ও টমেটোর প্রক্রিয়াকৃত পণ্যের বিষয়ে ভোক্তাদের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করা এই প্রকল্পে ক্যাবের দায়িত্ব।

এই প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ দিকটি হলো টেকসই ও নিরাপদ সরবরাহ চেইন ব্যবস্থা উন্নয়নে ছোট ছোট উৎপাদকদেরকে সম্পৃক্ত করা। প্রসেসিং সেক্টরের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হলো উৎপাদনকারী, যাঁরা নিজেরা সংগঠিত এবং যাঁরা নিরাপদ ফসল উৎপাদন করে প্রসেসিং কোম্পানির নিকট পৌঁছে দিতে পারেন। নিরাপদ ও টেকসই চাষ পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে আম ও টমেটো চাষীরা তাঁদের মোট আয় বৃদ্ধি করতে পারেন। খাদ্য শৃঙ্খলের পুরো প্রক্রিয়াতে ঝুঁকি রয়েছে যেমন, মাঠ পর্যায়ের উৎপাদনে, পরিবহনে ও প্রক্রিয়াজাতকরণে। আম ও টমেটো চাষীদের উত্তম কৃষি পদ্ধতি বা Good Agricultural Practices অনুসরণ করে আম ও টমেটো উৎপাদন করা হচ্ছে, পরিবহনে উত্তম হ্যান্ডলিং পদ্ধতি বা Good Handling Practices এবং প্রক্রিয়াজাতকরণ কোম্পানি চাষীদের নিকট হতে সেই আম ও টমেটো সংগ্রহ করে উত্তম উৎপাদন পদ্ধতি বা Good Manufacturing Practices অনুসরণ করে পণ্য উৎপাদন করছে।

বাংলাদেশে মূলত ক্ষুদ্র কৃষকেরা ফল ও সবজি উৎপাদন করে থাকেন। এই প্রকল্পটি 'ইনক্লুসিভ বিজনেস এপ্রোচ' নিয়ে কাজ করছে যার মাধ্যমে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষকেরাই হচ্ছেন সাপ্লাই চেইনের প্রধান যোগানদাতা। বাংলাদেশের ভোক্তাদের চাহিদা অনুযায়ী ও পণ্যের মানদন্ড অনুযায়ী পণ্য তৈরি করা হয়। 'মাঠ থেকে টেবিল' পর্যন্ত একটি ব্যাপক পরিবর্তিত টেকসই ও নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা কাঠামো তৈরিতে সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান করা আমাদের প্রয়োজন।

ফুড সেফটি গর্ভনেন্স ইন পোল্ট্রি সেক্টর প্রকল্প

এ দেশে নব্বইয়ের দশক থেকে পোল্ট্রি শিল্প ব্যাপক প্রসার লাভ করে। দিন দিনই ব্রয়লার মুরগি পালনে আগ্রহী হয়ে উঠে বেকার যুবক-যুবতীরা। দেশে প্রাণীজ প্রোটিনের চাহিদার প্রায় শতকরা ৪৫ ভাগ পোল্ট্রি সেক্টর পূরণ করে। দাম তুলনামূলক সস্তা হওয়ায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য প্রোটিনের মূল উৎস হচ্ছে পোল্ট্রি। কিন্তু বর্তমানে নাগরিকদের ও বিশেষজ্ঞদের মধ্যে নিরাপদ খাদ্যের বিবেচনায় পোল্ট্রি সেক্টর নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে। নিম্নমানের পোল্ট্রি ফিড, পোল্ট্রি ফিডে মাত্রাতিরিক্ত ও অপ্রয়োজনীয় অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার পোল্ট্রি খাদ্যকে অনিরাপদ করে তুলছে।

ব্রিটিশ কাউন্সিলের PROKAS (Promoting Knowledge for Accountable Systems) প্রোগ্রামের কারিগরি সহায়তায় ও UKAid-এর আর্থিক সহায়তায় 'আইবিপি অন ফুড সেফটি গর্ভনেন্স ইন পোল্ট্রি সেক্টর ইন বাংলাদেশ' শীর্ষক প্রকল্পটি শুরু হয়েছে। প্রকল্পটির কার্যক্রম ৬টি জেলা/উপজেলায় পরিচালিত হচ্ছে। এর মধ্যে রংপুর সদর, চট্টগ্রামের পাঁচলাইশ থানা এবং রাজশাহীর পবা উপজেলায় ক্যাব কাজ করছে।

নিরাপদ পোল্ট্রি উৎপাদনের লক্ষ্যে ক্যাব জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সাথে সমন্বয় রেখে কাজ করবে। এছাড়াও ভোক্তা সাধারণ, সিভিল সোসাইটি, মুরগি খামারি, পোল্ট্রি ফিড বিক্রেতা, ডিলার ও বেসরকারি সংগঠনসমূহের সাথে ঘনিষ্টভাবে সম্পৃক্ত থেকে পোল্ট্রি ফিড উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে বিধিসম্মতভাবে পরিচালনার গতিপথ প্রদর্শনে সহায়তার জন্য এই প্রকল্প কাজ করছে। প্রধান কার্যক্রমের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে পোল্ট্রি সেক্টরের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণে জাতীয় ও প্রকল্প এলাকায় মতবিনিময় ও কর্মশালার আয়োজন। জেলা/উপজেলা পর্যায়ে ভোক্তা সংগঠনের কমিটি সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠন করা হবে যাঁরা স্থানীয় প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মুরগি খামারি, পোল্ট্রি ফিড বিক্রেতা, ডিলারদের সাথে যৌথভাবে কাজ করবে এবং মৎস্য ও পশুখাদ্য আইন ২০১০ বাস্তবায়নে সহযোগিতা প্রদান করবে।

এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো পোল্ট্রি ফিড সেক্টরের উন্নয়ন ও খাদ্য নিরাপদতা নিশ্চিতকরণের জন্যে যে সকল আইন, নীতি ও প্রবিধানমালা রয়েছে সেগুলোর যথাযথ প্রয়োগ ও খাদ্য নিরাপদতা নিশ্চিত করতে যেসব চ্যালেঞ্জ রয়েছে সেগুলো পোল্ট্রি সেক্টরের সকল স্টেকহোল্ডার বা অংশীজনদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে চিহ্নত করা এবং খাদ্য নিরাপদতা নিশ্চিত করার জন্যে একসাথে কাজ করার ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে সাহায্য সহযোগিতা করা।

আমরা আশা করি এই প্রকল্পটি জাতীয় পর্যায়ে নিরাপদ পোল্ট্রি খাদ্য উৎপাদনে সরকারের প্রবিধান আরও গণমুখী ও সহায়ক ভূমিকা পালন করবে এবং প্রকল্প এলাকায় পোল্ট্রি খাদ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে মধ্যসত্বভোগীদের সাথে পোল্ট্রি খামারিদের উন্নত সম্পর্ক তৈরি হবে। ফলে খামারিরা নিরাপদ পোল্ট্রি উৎপাদন নিশ্চিত করতে পারবে এবং প্রাণিসম্পদ বিভাগ ও বেসরকারি উদ্যোক্তাদের মাধ্যমে বাজারে প্রবেশে অধিকতর সহায়তা পাবে।

প্রয়োজন সম্মিলিত প্রচেষ্টা

বর্তমান সরকার সকলের জন্য নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। সরকার ইতোমধ্যে প্রতিবছর ০২ ফেব্রুয়ারি জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছে। ২০১৮ সালে প্রথমবারের মতো সারা দেশে দিবসটি উদযাপন করা হবে। এতে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে সরকারের অঙ্গীকার প্রতিফলিত হয়েছে। সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর ও বিভাগগুলোও এবিষয়ে আরও দায়িত্বশীল হবে। আমরা আশা করি, আগামী দিনগুলোতে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় দেশে সকলের জন্য নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণের পথে অনেক দূর এগিয়ে যেতে আমরা সক্ষম হব।

একটি অসাধারণ আত্মজীবনী

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

১. মাঝে মাঝেই আমার মনে হয় আমাদের কত বড় সৌভাগ্য যে বাংলাদেশের মাটিতে বঙ্গবন্ধুর মতো একজন মানুষের জন্ম হয়েছে, ঠিক যেই সময়টিতে দরকার হয়েছিল। তখন যদি তাঁর মতো একজন মানুষের জন্ম না হতো তাহলে কী হতো? তাহলে কি বাঙালিরা নিজের একটা দেশের স্বপ্ন দেখতে পারত? সেই দেশের জন্যে যুদ্ধ করতে পারত? অকাতরে প্রাণ দিতে পারত? যদি আমরা নিজের একটি দেশ না পেতাম, এখনও পাকিস্তান নামের সেই বিদঘুটে দেশটির অংশ হিসেবে থাকতাম তাহলে আমাদের কী হতো, সেই কথা চিন্তা করে আমি আতঙ্কে শিউরে উঠি।

এই মানুষটিকে পঁচাত্তরে সপরিবারে হত্যা করা হয়েছিল। পৃথিবীর অনেক দেশেই অনেক মহামানবকে নিজের দেশ কিংবা দেশের মানুষের জন্যে প্রাণ দিতে হয়েছে, কিন্তু বঙ্গবন্ধুর বিষয়টি ছিল অবিশ্বাস্য। তাঁকে সপরিবারে হত্যা করেই হত্যাকারীরা দায়িত্ব শেষ করেনি, এই দেশের ইতিহাস থেকে তাঁর চিহ্ন মুছে দেওয়ার জন্যে একুশটি বছর এমন কোনো কাজ নেই যেটি করা হয়নি। যে মানুষটির কারণে আমরা আমাদের দেশটি পেয়েছি সেই দেশের রেডিও টেলিভিশনে কোনোদিন তাঁর নাম পর্যন্ত উচ্চারিত হয়নি।

আমার মনে আছে প্রথমবার আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর আমি আমার স্ত্রীকে বলেছিলাম, "চল আমরা একটা টেলিভিশন কিনে আনি, এখন নিশ্চয়ই বঙ্গবন্ধুকে টেলিভিশনে দেখাবে।" শুধুমাত্র তাঁকে দেখার জন্যে আমরা একটা টেলিভিশন কিনে এনেছিলাম।

আমরা আমাদের চোখের সামনে বাংলাদেশকে জন্ম নিতে দেখেছি, আমরা এই দেশের ইতিহাসের সাক্ষী, ইতিহাসের অংশ। আমাদের চোখের সামনে বঙ্গবন্ধু ধীরে ধীরে বঙ্গবন্ধু হয়ে উঠেছিলেন। শৈশব-কৈশোরে তাঁর সবকিছুর গুরুত্ব সবসময় বুঝতে পারিনি। এখন বড় হয়ে যখন পিছনে ফিরে তাকাই কখনো বিস্মিত হই, কখনো রোমাঞ্চিত হই, কখনো হতচকিত হয়ে যাই। কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে একজন মানুষ হিসেবে অনুভব করার অবিশ্বাস্য ঘটনাটি ঘটেছে ২০১২ সালে, যখন তাঁর নিজের হাতে লেখা 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' বইটি হাতে পেয়েছি। আমি যখন নেলসন ম্যান্ডেলার আত্মজীবনীটি পড়ছিলাম তখন আমার বারবার মনে হয়েছিল, বছরের হিসাবে আমাদের বঙ্গবন্ধু তো নেলসন ম্যান্ডেলা থেকে খুব একটা কম সময় জেলে ছিলেন না, অবদান হিসেবে তাঁর অবদান তো নেলসন ম্যান্ডেলা থেকে কোনো অংশে কম নয়, তাহলে তিনি কেন তাঁর মতো করে নিজের আত্মজীবনী লিখে গেলেন না, আমরা কেন সেটি পড়ে রোমাঞ্চিত হবার সুযোগ পেলাম না। তাই শেষ পর্যন্ত যখন বঙ্গবন্ধুর নিজ হাতে লেখা আবিষ্কৃত হলো, সেটি প্রকাশিত হলো, আমার আনন্দের সীমা ছিল না।

শিশু-কিশোরেরা যেভাবে রুদ্ধশ্বাসে ডিটেকটিভ বই পড়ে আমি ঠিক সেভাবে রুদ্ধশ্বাসে বঙ্গবন্ধুর আত্মজীবনীটি পড়েছি। আমি মনে করি এই বইটি আমাদের দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি বই। যারা দেশকে ভালোবাসে তাদের সবাইকে এই বইটি পড়তে হবে। যারা দেশের ইতিহাস জানতে চায় তাদের এই বই পড়তে হবে। যারা রাজনীতি করে তাদের এই বই পড়তে হবে। যারা রাজনীতি করতে চায় তাদের এই বই পড়তে হবে। যারা দেশ শাসন করে তাদের এই বই পড়তে হবে। যারা দেশ শাসন করতে চায় তাদেরও এই বই পড়তে হবে। এই বইটি পড়লেই শুধুমাত্র একজন মানুষ বুঝতে পারবে কীভাবে একজন মানুষ একটি জাতি হয়ে ওঠে, একটি জাতি কীভাবে দেশ হয়ে ওঠে।

২. বইটিতে অসংখ্য বিষয় আছে, যেমন ধরা যাক বাঙালিদের কথা। তিনি বাঙালিদের কীভাবে দেখেছেন? বইয়ের অনেক জায়গায় তাদের কথা লেখা আছে। আমার পছন্দের একটা অংশ যখন তাদের পাকিস্তানিদের সাথে তুলনা করেছেন (পৃষ্ঠা ২১৪) :

"প্রকৃতির সাথে মানুষের মনেরও একটা সম্বন্ধ আছে। বালুর দেশের মানুষের মনও বালুর মতো উড়ে বেড়ায়। আর পলিমাটির বাংলার মানুষের মন ঐ রকমই নরম, ঐ রকমই সবুজ। প্রকৃতির অকৃপণ সৌন্দর্যে আমাদের জন্ম, সৌন্দর্যই আমরা ভালোবাসি।"

বাঙালির চরিত্রের নিখুঁত ব্যাখ্যাও করেছেন অন্য জায়গায়, (পৃষ্ঠা ৪৭):

"আমাদের বাঙালির মধ্যে দুইটা দিক আছে। একটা হলো আমরা মুসলমান, আর একটা হলো আমরা বাঙালি। পরশ্রীকাতরতা এবং বিশ্বাসঘাতকতা আমাদের রক্তের মধ্যে রয়েছে। বোধ হয় দুনিয়ার কোনো ভাষাতেই এই কথাটা পাওয়া যাবে না 'পরশ্রীকাতরতা'। পরের শ্রী দেখে যে কাতর হয়, তাকে 'পরশ্রীকাতর' বলে। ঈর্ষা, দ্বেষ সকল ভাষাতেই পাবেন, সকল জাতির মধ্যেই কিছু কিছু আছে, কিন্তু বাঙালিদের মধ্যে আছে পরশ্রীকাতরতা। ভাই ভাইয়ের উন্নতি দেখলে খুশি হয় না। এই জন্যই বাঙালি জাতির সকল রকম গুণ থাকা সত্ত্বেও জীবনভর অন্যের অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে। ... যুগ যুগ ধরে এরা শোষিত হয়েছে নিজের দোষে। নিজেকে এরা চেনে না, আর যতদিন চিনবে না এবং বুঝবে না ততদিন এদের মুক্তি আসবে না।"

বাঙালিদের নিয়ে এর চেয়ে খাঁটি মূল্যায়ন আমার চোখে আর কখনো পড়েনি।

মুহম্মদ জাফর ইকবাল
অধ্যাপক, কম্পিউটার সাইন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, শাবিপ্রবি

এই বাঙালিদের জন্যে তাঁর বুকে ছিল গভীর ভালোবাসা। নির্বাচনের সময় একবার হেঁটে হেঁটে প্রচারণার কাজ চালাচ্ছেন। তখন এক হতদরিদ্র বৃদ্ধা মহিলার সাথে দেখা। বঙ্গবন্ধুকে দেখার জন্যে কয়েক ঘন্টা থেকে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁকে ধরে নিজের কুঁড়েঘরে নিয়ে এক বাটি দুধ, একটা পান আর চার আনা পয়সা দিয়েছেন। বলেছেন, "খাও বাবা, আর পয়সা কয়টা তুমি নেও, আমার তো কিছু নেই।"

বঙ্গবন্ধু সেই পয়সা না নিয়ে উল্টো তাকে সাহায্য করার চেষ্টা করেছিলেন, লাভ হয়নি। সেই হতদরিদ্র মহিলার বাড়ি থেকে বের হবার পর, বঙ্গবন্ধু লিখছেন, (পৃষ্ঠা ২৫৬) :

"নীরবে আমার চক্ষু দিয়ে দুই ফোঁটা পানি গড়িয়ে পড়েছিল, যখন তার বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসি। সেইদিনই আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, 'মানুষরে ধোঁকা আমি দিতে পারব না।"

আমরা সবাই জানি বঙ্গবন্ধু তাঁর এই প্রতিজ্ঞা কখনো ভঙ্গ করেননি।

'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' এই পুরো বইটার একটা বড় অংশ হচ্ছে কীভাবে বঙ্গবন্ধু মুসলিম লীগের গুণ্ডা আর পুলিশের নির্যাতন সহ্য করেছেন, জেল খেটেছেন, পাকিস্তানের জন্যে আন্দোলন করেছেন কিন্তু দেশবিভাগের পরপরই খুব দ্রুত মুসলিম লীগের ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে গেছেন। আর এই মুসলিম লীগ সরকার তাঁর ওপর নির্যাতন করেছে, বিনা বিচারে দিনের পর দিন জেলখানায় আটকে রেখেছে। এক জায়গায় বর্ণনা আছে মাওলানা ভাসানীকে নিয়ে শোভাযাত্রা করছেন, তখন পুলিশ আক্রমণ করেছে। বঙ্গবন্ধু লিখছেন, (পৃষ্ঠা ১৩২) :

"আমার উপর অনেক আঘাত পড়ল। একসময় প্রায় বেহুঁশ হয়ে এক পাশের নর্দমায় পড়ে গেলাম। আমার পা দিয়ে খুব রক্ত পড়ছিল। কেউ বলে গুলি লেগেছে, কেউ বলে গ্যাসের ডাইরেক্ট আঘাত, কেউ বলে কেটে গেছে পড়ে যেয়ে।"

তারপর কীভাবে তাঁকে ধরাধরি করে পার্টির অফিসে নিয়ে যাওয়া হলো তার বর্ণনা আছে। সেখানে একটু চিকিৎসা করে বেদনায় কষ্ট পাচ্ছিলেন বলে ইনজেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া হলো। কিন্তু গভীর রাতে পুলিশ এলো তাদের গ্রেপ্তার করতে। মাওলানা ভাসানী খবর নিয়েছিলেন যেন কোনোভাবে গ্রেপ্তার না হন। তাই লিখছেন,

"আমার শরীরে ভীষণ বেদনা, জ্বর উঠেছে, নড়তে পারছি না। কী করি, তবুও উঠতে হল এবং কী করে ভাগব তা ভাবছিলাম। ... তিনতলায় আমরা থাকি, পাশেই একটা দোতলা বাড়ি ছিল। তিনতলা থেকে দোতলায় লাফিয়ে পড়তে হবে। দুই দালানের ভিতর ফারাকও আছে। নিচে পড়লে শেষ হয়ে যাব। তবুও লাফ দিয়ে পড়লাম।"

আমরা হলিউডের ছবিতে এরকম দৃশ্য দেখে অবিশ্বাসের হাসি হেসে থাকি। কিন্তু এটা হলিউডের ছবি নয়, বঙ্গবন্ধুর নিজের জীবনের ঘটনা, নিজের হাতে লেখা!

একবার পাকিস্তান থেকে লিপ্ত হয়ে বঙ্গবন্ধু পূর্ব বাংলায় ফিরে আসছেন। তিনি জানেন তাকে গ্রেপ্তার করা হবে। তিনিও পন্তুত আছেন। তাঁর ভাষায়, (পৃষ্ঠা ১৪৫) :

"আমিও প্রস্তুত আছি, তবে ধরা পড়ার পূর্বে একবার বাবা, মা, ভাইবোন, ছেলেমেয়েদের সাথে দেখা করতে চাই।" কারণ (পৃষ্ঠা ১৪৬) :

"কয়েক মাস পূর্বে আমার বড় ছেলে কামালের জন্ম হয়েছে, ভাল করে দেখতেও পারি নাই ওকে। হাচিনা তো আমাকে পেলে ছাড়তেই চায় না।" (এই বইয়ে শেখ হাসিনাকে বঙ্গবন্ধু সবসময় হাচিনা লিখেছেন)।

এরপর পুলিশের চোখে ধুলা দেওয়ার জন্যে ট্রেনে, স্টেশনে কী করেছেন তার চমকপ্রদ বর্ণনা আছে। সবচেয়ে বিচিত্র বর্ণনা হচ্ছে জাহাজে ওঠার অংশটুকু। বঙ্গবন্ধুর ভাষায়, (পৃষ্ঠা ১৪৬) :

"সকল যাত্রী নেমে যাওয়ার পরে আমার পাঞ্জাবি খুলে বিছানার মধ্যে দিয়ে দিলাম। লুঙ্গি পরা ছিল, লুঙ্গিটা একটু উপরে উঠিয়ে বেঁধে নিলাম। বিছানাটা ঘাড়ে, আর সুটকেসটা হাতে নিয়ে নেমে পড়লাম। কুলিদের মতো ছুটতে লাগলাম, জাহাজ ঘাটের দিকে। গোয়েন্দা বিভাগের লোক তো আছেই। চিনতে পারল না।"

বঙ্গবন্ধু গ্রেপ্তার এড়িয়ে শেষ পর্যন্ত বাড়ি পৌঁছাতে পেরেছিলেন। অল্প কিছুদিন স্ত্রী-পুত্র-কন্যার সাথে কাটাতে পেরেছিলেন। যখন যাবার সময় হয়েছে তখন লিখছেন, (পৃষ্ঠা ১৬৪) :

"ছেলেমেয়েদের জন্য যেন একটু বেশি মায়া হয়ে উঠেছিল। ওদের ছেড়ে যেতে মন চায় না, তবুও তো যেতে হবে। দেশসেবায় নেমেছি, দয়া-মায়া করে লাভ কী? দেশকে ও দেশের মানুষকে ভালোবাসলে ত্যাগ তো করতেই হবে এবং সে ত্যাগ চরম ত্যাগও হতে পারে।" বঙ্গবন্ধু যখন এই বাক্যটি লিখেছিলেন তখন কি তিনি জানতেন তাঁর জন্যে একদিন এটি কত বড় একটি সত্য হয়ে দাঁড়াবে।

জেলখানায় থাকতে থাকতে তাঁর ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে গেছে। অনেক কষ্টে একবার ছাড়া পেয়ে বাড়ি এসে সকালবেলা বিছানায় বসে স্ত্রীর সাথে গল্প করছেন, তার ছেলেমেয়ে নিচে বসে খেলছে। বঙ্গবন্ধু লিখেছেন, (পৃষ্ঠা ২০৯) :

"হাচু মাঝে মাঝে খেলা ফেলে আমার কাছে আসে আর 'আব্বা', 'আব্বা' বলে ডাকে। কামাল চেয়ে থাকে। একসময় কামাল হাচিনাকে বলছে, 'হাচু আপা, হাচু আপা, তোমার আব্বাকে আমি একটু আব্বা বলি।"

বঙ্গবন্ধু তখন বিছানা থেকে নেমে ছেলেকে কোলে নিয়ে বললেন, "আমি তো তোমারও আব্বা।" তাঁর ছেলে তাঁকে চেনে না, তাই কাছে আসতে চাইত না। এই প্রথমবার বাবার গলা ধরে পড়ে রইল। লেখক সাহিত্যিকেরা বানিয়ে বানিয়ে কত কী লিখে পাঠকদের মন দুর্বল করে ফেলে, কিন্তু এ রকম সত্যি ঘটনা কি তারা লিখতে পারবে?

ভাষা আন্দোলনের সময় বঙ্গবন্ধু জেলে। দুই বছর থেকে বেশি সময় বিনা বিচারে জেলে আটকা পড়ে আছেন। তখন ঠিক করলেন মুক্তির জন্যে আমরণ অনশন করবেন। খবর পেয়ে কর্তৃপক্ষ তাঁকে এবং তাঁর রাজনৈতিক সহকর্মীকে ফরিদপুর জেলে পাঠিয়ে দিয়েছে। অনশন শুরু করার দুইদিনের ভেতর খুব শরীর খারাপ হলে তাঁদের হাসপাতালে পাঠানো হলো।

চারদিন পর তাঁদের নাক দিয়ে জোর করে খাওয়াতে শুরু করল। বঙ্গবন্ধুর নাকে ঘা হয়ে গেছে, রক্ত আসে, যন্ত্রণায় ছটফট করেন। যখন বুঝতে পারলেন আর বেশিদিন বাঁচবেন না, গোপনে কয়েক টুকরা কাগজ আনিয়ে বাবা, স্ত্রী এবং তাঁর দুই রাজনৈতিক নেতা সোহরাওয়ার্দী এবং মাওলানা ভাসানীকে চিঠি লিখলেন। কারণ, তখন বুঝে গেছেন কয়েকদিন পর আর লেখার শক্তি থাকবে না।

বঙ্গবন্ধু অনশনে কীভাবে ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়েছেন তার বর্ণনা দিয়েছেন। চিঠি চারটি ঠিক জায়গায় পৌঁছানোর ব্যবস্থা করেছেন। লিখছেন, (পৃষ্ঠা ২০৪) :

"আমাদের অবস্থা এমন পর্যায়ে এসেছে যে, যে কোনো মুহূর্তে মৃত্যুর শান্তিছায়ায় চিরদিনের জন্যে স্থান পেতে পারি। সিভিল সার্জন সাহেব দিনের মধ্যে পাঁচ-সাতবার আমাদের দেখতে আসেন। ২৫ তারিখ সকালে যখন আমাকে তিনি পরীক্ষা করছিলেন হঠাৎ দেখলাম তার মুখ গম্ভীর হয়ে গেছে। তিনি কোনো কথা না বলে, মুখ কালো করে বেরিয়ে গেলেন। আমি বুঝলাম আমার দিন ফুরিয়ে গেছে। ডেপুটি জেলর সাহেব বললেন, 'কাউকে খবর দিতে হবে কি না? আপনার ছেলেমেয়ে ও স্ত্রী কোথায়? আপনার আব্বার কাছে কোনো টেলিগ্রাম করবেন?' বললাম, 'দরকার নাই। আর তাদের কষ্ট দিতে চাই না।' আমি আশা ছেড়ে দিয়েছি, হাত-পা অবশ হয়ে আসছিল।" এভাবে আরও দুদিন কেটে গিয়েছে। বঙ্গবন্ধু লিখেছেন, (পৃষ্ঠা ২০৫) :

"২৭ তারিখ রাত আটটার সময় আমরা দুইজন চুপচাপ শুয়ে আছি। কারও সাথে কথা বলার ইচ্ছাও নাই, শক্তিও নাই। দুইজনই শুয়ে শুয়ে কয়েদির সাহায্যে ওজু করে খোদার কাছে মাপ চেয়ে নিয়েছি।"

বঙ্গবন্ধু মৃত্যুর জন্যে পুরোপুরি প্রস্তুতি নিয়েছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত অনশনে তাঁকে মৃত্যুবরণ করতে হয়নি। এই জীবন-বাজি ধরা আন্দোলনের কাছে সরকার মাথানত করে তাদের মুক্তি দিতে বাধ্য হয়েছিল।

পুরো বইটিতে এরকম অসংখ্য ঘটনার বর্ণনা আছে। কীভাবে একেবারে শূন্য থেকে শুরু করে ধীরে ধীরে একটা রাজনৈতিক দল গড়ে তুলেছেন তার নিখুঁত বর্ণনা আছে। ষড়যন্ত্র, সাম্প্রদায়িকতা, বাধা-বিপত্তি, ভয়ঙ্কর অর্থকষ্ট, পুলিশের নির্যাতন, বিশ্বাসঘাতকতা সবকিছুকে সামাল দিয়ে কীভাবে একটা রাজনৈতিক দল গড়ে তুলতে হয় সেটি এর চেয়ে সুন্দর করে আর কোনো বইয়ে লেখা আছে বলে আমার জানা নেই।

মাঝে মাঝে যে হাস্যরস বা কৌতুক নেই তা নয়। রাতের বেলা নৌকা করে যাচ্ছেন, বঙ্গবন্ধু ঘুমিয়ে আছেন, তখন ডাকাত পড়েছে। এলাকার সবাই বঙ্গবন্ধুকে চেনে, তাঁকে ভালোবাসে, ডাকাতেরা যখন জানতে পারল নৌকায় বঙ্গবন্ধু শুয়ে আছেন তারা ডাকাতি না করেই মাঝিকে এক ঘা দিয়ে বলল, 'শালা, আগে বলতে পার নাই শেখ সাহেব নৌকায়'। ঘুম থেকে উঠে ঘটনাটা শুনে বঙ্গবন্ধু বললেন, (পৃষ্ঠা ১২৫) :

"বোধ হয় ডাকাতরা আমাকে ওদের দলের একজন বলে ধরে নিয়েছে।"

আরেকবার জনসভায় মাওলানা ভাসানীকে নিয়ে বক্তৃতা করতে গিয়েছেন, পুলিশ তখন ১৪৪ ধারা জারি করে দিয়েছে, কেউ আর বক্তৃতা করতে পারবে না। বঙ্গবন্ধু তেজস্বী মানুষ, বললেন, (পৃষ্ঠা ১২৮) :

"মানি না ১৪৪ ধারা, আমি বক্তৃতা করব।' মাওলানা সাহেব দাঁড়িয়ে বললেন '১৪৪ ধারা জারি হয়েছে। আমাদের সভা করতে দেবে না। আমি বক্তৃতা করতে চাই না, তবে আসুন আপনারা মোনাজাত করুন, আল্লাহু আমিন।' মাওলানা সাহেব মোনাজাত শুরু করলেন। মাইক্রোফোন সামনেই আছে। আধা ঘণ্টা চিৎকার করে মোনাজাত করলেন, কিছুই বাকি রাখলেন না, যা বলার সবই বলে ফেললেন। পুলিশ অফিসার ও সেপাইরা হাত তুলে মোনাজাত করতে লাগল। আধা ঘণ্টা মোনাজাতে পুরা বক্তৃতা করে মাওলানা সাহেব সভা শেষ করলেন। পুলিশ ও মুসলিম লীগওয়ালারা বেওকুফ হয়ে গেল।"

পুরো দৃশ্যটা কল্পনা করে এতদিন পরেও আমরা হেসে কুটিকুটি হই।

৩. এই অসাধারণ বইটি সম্পর্কে লিখে শেষ করার কোনো সুযোগ নেই। তারপরও আমি বই থেকে নানা বিষয়ে বঙ্গবন্ধুর কিছু কথা তুলে দিই। যেহেতু তিনি আপাদমস্তক রাজনীতিবিদ, তাই তার রাজনীতি নিয়ে কথাগুলো সবচেয়ে সুন্দর। রাজনীতিটা কখনো দলবাজি হিসেবে দেখেননি। লিখেছেন, (পৃষ্ঠা ২৩৯):

"ম্যানিফেস্টো বা ঘোষণাপত্র না থাকলে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান চলতে পারে না।"

আমলাতন্ত্র দুই চোখে দেখতে পারতেন না, তাই বলেছেন, (পৃষ্ঠা ২৩৫):

"রাজনৈতিক দল ছাড়া গণতন্ত্র সফল হতে পারে না।"

আবার একই সাথে অযোগ্য রাজনীতিবিদদের সম্পর্কে এভাবে সতর্ক করেছেন, (পৃষ্ঠা ২৭৩) :

"অযোগ্য নেতৃত্ব, নীতিহীন নেতা ও কাপুরুষ রাজনীতিবিদদের সাথে কোনোদিন একসাথে হয়ে দেশের কোনো কাজে নামতে নেই।"

বামপন্থি রাজনীতি সম্পর্কে বলেছেন, (পৃষ্ঠা ২৩৪) :

"আমি নিজে কমিউনিস্ট নই। তবে সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করি এবং পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে বিশ্বাস করি না।"

আমাদের দেশে বামপন্থি রাজনীতি কেন কখনো বেশি সুবিধা করতে পারেনি বঙ্গবন্ধু সেটি অর্ধশত বছরেরও আগে বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর বামপন্থি বন্ধুদের উলেখ করে বলেছেন, (পৃষ্ঠা ১০৯) :

"জনসাধারণ চলছে পায়ে হেঁটে, আর আপনারা আদর্শ নিয়ে উড়োজাহাজে চলছেন। জনসাধারণ আপনাদের কথা বুঝতেও পারবে না, আর সাথেও চলবে না। যতটুকু হজম করতে পারে ততটুকু জনসাধারণের কাছে পেশ করা উচিত।"

অতি প্রগতিবাদীদের সম্পর্কেও তাঁর কথাটা তখনো সত্যি ছিল, এখনো সত্যি। বঙ্গবন্ধু বলেছেন, (পৃষ্ঠা ২৪৫) :

"অতি প্রগতিবাদীদের কথা আলাদা। তারা মুখে চায় ঐক্য। কিন্তু দেশের জাতীয় নেতাদের জনগণের সামনে হেয় প্রতিপন্ন করতে এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি যাতে জনগণের আস্থা হারিয়ে ফেলে, চেষ্টা করে সেজন্যে।"

তবে বঙ্গবন্ধুর কাছে রাজনীতির বিষয়টি ছিল খুবই স্পষ্ট, সেটি ছিল একটা মহৎ কাজ। বারবার বলেছেন, (পৃষ্ঠা ১২৮) :

"যে কোনো মহৎ কাজ করতে হলে ত্যাগ ও সাধনার প্রয়োজন। যারা জীবনে ত্যাগ করতে প্রস্তুত নয় তারা জীবনে কোনো ভাল কাজ করতে পারে নাই।"

রাজনীতি করে তাঁর জীবনে এক ধরনের পূর্ণতা এসেছিল। কারণ, নির্বাচনে মুসলিম লীগকে পুরোপুরি ধরাশায়ী করে লিখেছেন, (পৃষ্ঠা ২৫৭) :

"আমার ধারণা হয়েছিল মানুষকে ভালবাসলে মানুষও ভালবাসে। যদি সামান্য ত্যাগ স্বীকার করেন, তবে জনসাধারণ আপনার জন্যে জীবন দিতেও পারে।"

বঙ্গবন্ধু মানুষের ভালোবাসা পেয়েছিলেন, একবার নয়, বারবার।

৪. এই লেখার শুরুতে আমি বলেছিলাম 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' বইটি সবার পড়া উচিত, যারা দেশ চালাচ্ছে তাদেরও। আমার কেন জানি মনে হয় যারা দেশ চালাচ্ছেন তাদের সবাই এই বইটি পড়েননি, কিংবা তার চেয়েও দুঃখের ব্যাপার হয়তো বইটি পড়েছেন কিন্তু বঙ্গবন্ধুর কথাগুলো বিশ্বাস করেননি। আমার এরকম মনে হওয়ার কারণ হচ্ছে এই বইয়ে সবচেয়ে বেশিবার যে কথাটি লেখা হয়েছে সেটি হচ্ছে (পৃষ্ঠা ১২৬) :

"শক্তিশালী বিরোধী দল না থাকলে গণতন্ত্র চলতে পারে না।" কিংবা (পৃষ্ঠা ১২০) :

"বিরোধী দল সৃষ্টি করতে না পারলে এ দেশে একনায়কত্ব চলবে।"

শক্তিশালী বিরোধী দল দূরে থাকুক আমরা কি এই দেশে কোনো বিরোধী দল দেখতে পাচ্ছি? দেশে আসলে কোনো বিরোধী দল নেই, একটা পৃষ্ঠপালিত বিরোধী দল আছে, তাদের থাকা না থাকাতে কিছু আসে যায় না। জামায়াতে ইসলামীর সাথে রাজনীতি করে এবং বঙ্গবন্ধুকে অস্বীকার করে বলে আমি মনে করি এই দেশে বিএনপির রাজনীতি করার কোনো নৈতিক অধিকার নেই।

এখন বাকি আছে সংবাদমাধ্যম। যতই দিন যাচ্ছে আমরা দেখছি সংবাদমাধ্যমকে কেমন জানি গলা টিপে ধরা হচ্ছে। মন্ত্রীরা কারণে অকারণে আজকাল সাংবাদিকদের গালাগাল করেন, ভয়ভীতি দেখান। গণজাগরণ মঞ্চ যখন আওয়ামী লীগের সমালোচনা করল তখন তাদেরও দুই টুকরো করে দেওয়া হলো। পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস হয়েছে বলে আমি যখন চেঁচামেচি করছিলাম তখন আমাকে নানাভাবে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল, আমি যেন সরকারকে বিপদে না ফেলি।

বঙ্গবন্ধু বারবার বলেছেন, সরকারকে ঠিক রাখতে হলে একটা শক্তিশালী বিরোধী দল দরকার। আমি এই দেশে তাই একটা বিরোধী দল খুঁজে বেড়াই। মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের একটা বিরোধী দল। সেটি কোথায়?

বি: দ্র: লেখকের 'একজন সাদাসিদে মা ও অন্যান্য' বই থেকে সংকলিত: ১৫ আগস্ট, ২০১৪

Food Safety: A SDG Priority

Dr. Hossain Zillur Rahman

The question of food safety cuts across many sectors. It is this strategic significance which has elevated food safety into a key SDG priority (SDG2). With agriculture largely commercialized and poorly regulated urbanization increasing risks for the consumers, food safety is as much a policy priority as it is a top citizen concern. Food safety is not, however, simply about what is on the plate in front of the consumer. Safety concerns starts much earlier with sound production practices which avoid use of harmful inputs in the production of food items and policies which restrain commercial spread of such harmful inputs. I was struck by the vehemence with which the mayor of a south-western district was warning in a recent health seminar of the danger of fruits and vegetables prematurely ripened with toxic chemicals. Safety concerns are thus not limited to the capital city but applies all across the country. The marketing chain and its effective regulation too is central to the food safety question. Adulteration and unhygienic storage and sale points have tended to dominate headlines and underscore the gravity of the food safety challenge. It is important, however, that on both the issues of safe production and safe marketing, the agenda cannot succeed if pursued only from a narrow punitive perspective. Appropriately educating the producers and those involved in the marketing chain is critical. Food safety will be ensured only if there are both right incentives and effective enforcement of regulation.

One issue often overlooked is the question of establishing standards which are scientifically backed-up and are customized for specific country contexts. The BFSA has a very important role to play in this regard. Producer and trade associations need to be brought into the consultation loop to ensure market awareness of standards. A very important tier in the food safety chain is eating places, both formal and informal. Simple steps to improve hygiene in eating places, particularly road-side ones, can go a long way towards improving food safety. This was one of the issues we discussed with the mayors during our recent regional dialogue series on Healthy Bangladesh. If road-side vendors are motivated to cover the food they sell and road-side eateries use hand gloves and clean water washing utensils, this will mark a big step forward for food safety.

Last but not the least is the issue of consumer empowerment. Consumers may be ill-informed and sometimes embrace unhealthy attitudes to food. It is important food products are properly labelled so that consumers can make informed choices. There is also an issue of educating consumers of various age groups on their attitudes to food. The spread of fast food is a case in point. The health consequences of unsafe foods is a very heavy burden for countries like Bangladesh which are aspiring to rise to middle income country status. Economic growth will be meaningless if health and nutrition standards of the people remain poor. This provides the biggest rationale for the food safety agenda. To conclude, while the multiple dimensions of food safety looks very challenging, with appropriate initiatives and attention the problem can be tackled over time. This is the big lesson from global experiences.

Dr. Hossain Zillur Rahman
Executive Chairman, PPRC

নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে বিরাজমান চ্যালেঞ্জসমূহ এবং করণীয়

আনোয়ার ফারুক

আগামী ২ ফেব্রুয়ারি দেশে প্রথমবারের মত 'জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস' পালিত হতে যাচ্ছে। এই সিদ্ধান্তটি নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে সরকারের সদিচ্ছাই প্রমাণ করে। দেশের প্রতিটি মানুষের জন্য নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার দায়িত্ব সরকারের। তবে উৎপাদন থেকে খাবার প্লেট পর্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির যথাযথ অনুশীলনের মাধ্যমে খাদ্যকে নিরাপদ রাখতে হলে সরকার শুধু একা নয়, বরং সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫ (ক) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সকল নাগরিকের খাদ্যের মৌলিক চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের অন্যতম 'মৌলিক দায়িত্ব'। জাতিসংঘের ঘোষণা অনুযায়ী, ব্যক্তির শারিরীক ও মানসিক চাহিদাপূরণ আত্মমর্যাদা এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ খাবারের স্থায়ী যোগানের নিশ্চয়তা বিধানই হচ্ছে খাদ্য অধিকারের মূল কথা। মানুষের খাদ্য নিরাপদ হবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু নানা প্রক্রিয়ায় এই স্বাভাবিক বিষয়টি আজ অস্বাভাবিক হয়ে পড়েছে। উৎপাদন থেকে শুরু করে প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ এবং বিপণনের বিভিন্ন পর্যায়ে আমাদের খাদ্য এমনভাবে ভেজাল ও দূষণের শিকার হয়েছে যে সাধারণ মানুষের আতঙ্কিত হওয়াটাই স্বাভাবিক।

অতি সম্প্রতি (গত মঙ্গলবার) 'ক্যাপাবল' নামের একটি নতুন স্বাস্থ্য গবেষণা কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দেশ-বিদেশের বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, 'দেশে সংক্রামক রোগের প্রকোপ কমে গেলেও ভয়ানকভাবে বেড়েছে অসংক্রমক রোগের বিস্তার। মোট মৃত্যুর ৬০ শতাংশের বেশি ঘটছে ক্যান্সার, হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, কিডনি রোগে। এ থেকে বাঁচতে হলে জীবনাচার ও খাদ্যাভাসে পরিবর্তন আনতে হবে, নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে হবে।'

বাংলাদেশে খাদ্যের কোন অভাব নেই। দেশের সর্বস্তরে মানুষের আয় রোজগার বৃদ্ধি পাওয়ায় মানুষের পক্ষে খাদ্য গ্রহণে অভিগম্যতাও বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশ আজ পর্বিত খাদ্য উৎপাদনে অভূতপূর্ব সফলতা অর্জনের জন্য। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ছিল প্রায় সাড়ে সাত কোটি কিন্তু সকলের চাহিদা মেটানোর মত খাদ্য তখন উৎপাদিত হতো না। অথচ এখন বাংলাদেশের জনসংখ্যা প্রায় ১৬ কোটি অর্থাৎ দ্বিগুণেরও বেশি হওয়া সত্ত্বেও আমরা খাদ্যাভাব বা খাদ্য সংকটের মত কোন ভয়াবহ পরিস্থিতি মোকাবেলা করছি না। বাংলাদেশ ধান উৎপাদনে বিশ্বের মধ্যে চতুর্থ, সবজি উৎপাদনে তৃতীয়, মিষ্টি পানির মাছ উৎপাদনে চতুর্থ। এই সূচকগুলো বাংলাদেশের সংগ্রামী মানুষগুলোর লুক্কায়িত প্রতিভা এবং আমাদের খাদ্য সার্বভৌমত্বের পরিচয় বহন করে। এটাই আমাদের গৌরব। এটাই আমাদের স্বাধীনতা ও বিজয়ের সার্থকতা।

সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সরকার কৃষি, কৃষক ও গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নের জন্য কর্মসূচী গ্রহণ অব্যাহত রাখার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার পুষ্টি চাহিদা পূরণ, সার্বিক বিবেচনায় নির্ভরযোগ্য খাদ্য নিরাপত্তা (সকল মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টিসম্মত খাদ্য সরবরাহ ও প্রাপ্তি নিশ্চিত করণ) ব্যবস্থা গড়ে তোলা, নিরাপদ ও বাণিজ্যিক কৃষির বিকাশ সাধন, কৃষিনির্ভর শিল্পের প্রসার, গ্রামীণ ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়ন, কৃষি ও অকৃষিজ পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধি এবং বহুমুখীকরণের মাধ্যমে দারিদ্র্য নিরসন ও গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন সরকারের একটি অন্যতম কৌশলগত লক্ষ্য। এই লক্ষ্যের অন্যতম হলো 'কৃষি উপকরণ সরবরাহ ও কৃষিপণ্য বাজারজাত করার উদ্দেশ্যে কৃষি সমবায়কে উৎসাহিত করা' এবং 'গ্রামীণ খাতে বেসরকারি বিনিয়োগ উৎসাহিত করা'।

ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ তাদের ২০তম জাতীয় সম্মেলনে গৃহীত ঘোষণাপত্রে ১.২ অনুচ্ছেদে উল্লেখ করেছে "জনগণের সুস্বাস্থ্যের জন্য কেবল ভাত নয়, তার সাথে আমিষ ও অন্যান্য জাতীয় খাবার যেমন-মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, ফলমূল, শাকসবজির উৎপাদনও ক্রমাগত বাড়িয়ে যাওয়া হবে। এজন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ, কৃষিঋণ, ভর্তুকিসহ উন্নত কৃষি প্রযুক্তি সরবরাহ সুলভ ও সহজলভ্য করার অঙ্গীকার অব্যাহত থাকবে। বিশেষ করে সাধারণ মানুষ যাতে ভেজালমুক্ত নিরাপদ খাবার গ্রহণ করতে পারে, সেজন্য ২০১৩ সালে প্রতিষ্ঠিত খাদ্য নিরাপত্তা কর্তৃপক্ষ শক্তিশালী করা হবে এবং নিরাপদ খাবার সম্পর্কিত সকল আইন প্রয়োজন মাফিক সংশোধন করে বাস্তবায়ন করা হবে।"

আনোয়ার ফারুক
সাবেক সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়

আপনারা জানেন, 'নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩' শিরোনামে বাংলাদেশে একটি যুগান্তকারী আইন প্রণীত হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের খাদ্য মন্ত্রণায়ের অধীনে প্রণীত এই আইনের দুটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো:

১। "বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির যথাযথ অনুশীলনের মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিতকরণে খাদ্য উৎপাদন, আমদানী, প্রক্রিয়াজাতকরণ, মজুদ, সরবরাহ, বিপণন ও বিক্রয় সংশ্লিষ্ট সমন্বয়ের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ"

২। একটি দক্ষ ও কার্যকর কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির যথাযথ অনুশীলনের মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিতকরণে খাদ্য উৎপাদন, আমদানী, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ, বিপণন ও বিক্রয় সংশ্লিষ্ট সমন্বয়ের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ, নিরাপদ খাদ্য আইনটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আইনের আওতায় 'নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ' নামে একটি কর্তৃপক্ষ গঠিত হয়েছে। আমরা জানি, একটি সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান হিসেবে এই কর্তৃপক্ষ 'খাদ্য চক্র' এর সাথে জড়িত বিদ্যমান বিভিন্ন সংস্থা ও দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে আইনের আলোকে সকলকে কর্মসূচী গ্রহণ ও পরিচালনায় সহায়তা করছে।

এই পটভূমিতে সকলের জন্য 'নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে বিরাজমান চ্যালেঞ্জসমূহ এবং করণীয়' আজকের আলোচনার মূল কেন্দ্রবিন্দু। আমরা অনুভব করি, সাধারণ মানুষের চাওয়ার সাথে সরকারের গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচীর সামঞ্জস্যতা রয়েছে কিন্তু সমন্বয় নেই। এক্ষেত্রে যথাযথ সমন্বয় সাধন এবং কার্যকর কর্মসূচী প্রণয়ন করে আমরা জনগণের আকাঙ্খা পূরণে সরকারের অঙ্গীকার বাস্তবায়নে সহায়তা করতে পারি। আসুন, আমরা নির্মোহভাবে বিষয়বস্তুটি পর্যালোচনা করি এবং আমাদের সুপারিশ প্রদানের মাধ্যমে সরকারকে সহায়তা করি।

নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন ও বিপণনে সমস্যা কোথায়?

নিরাপদ খাদ্য নিয়ে দেশের মানুষের মধ্যে অনেকদিন থেকে নানামুখী আলোচনা বিদ্যমান। বেশিরভাগ মানুষই মনে করেন উৎপাদন থেকে বিপণন পর্যন্ত আইনের যথাযথ প্রয়োগ, পরিবীক্ষণ ও বিনিয়োগ নিশ্চিত করা গেলে বাংলাদেশের ঘরে ঘরে নিরাপদ খাদ্য পৌঁছানো সম্ভব। জনস্বাস্থ্য এবং মোট জাতীয় উৎপাদনশীলতার আলোকে বিবেচনা করলে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে অর্থায়ন নিশ্চিত করা অপরিহার্য।

বাংলাদেশ এখন 'উন্নয়নশীল দেশ' হতে চলেছে। প্রবৃদ্ধির সূচক নিয়ে মতভিন্নতা থাকলেও সামগ্রিকভাবে এটা সত্য যে বাংলাদেশের মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটছে। কিন্তু এই 'উন্নতি' যদি ভালভাবে, সুস্থভাবে বেঁচে থাকার আয়োজন মেটাতে তথা 'নিরাপদ খাদ্য' প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে সহায়ক না হয় তাহলে এত উন্নতির চূড়ান্ত ফলাফল কী হবে? দেশে একদিকে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কাছে টাকার কোন অভাব নেই বলে আমরা শুনছি, আবার টাকার অভাবে অনেক পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হচ্ছে না এমন কথাও শোনা যায়। বিসেফ ফাউন্ডেশন তাদের কাজের অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছে, বাংলাদেশে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে বিরাজমান অন্যতম সমস্যাগুলো মোকাবেলায় করণীয় সমূহকে মোটা দাগে ৫টি ভাগে ভাগ করা যায়:

১. আইন, বিধি ও প্রয়োগ সম্পর্কিত/সার্টিফিকেশন ইত্যাদি

- গ্লোবাল গ্যাপ /কোডেক্স মান এর আলোকে বাংলাদেশ মানদন্ড (গ্যাপ) চূড়ান্ত করা
- কমিউনিটি সার্টিফিকেশন ব্যবস্থা (পিজিএস) তৈরি করা
- মান নিয়ন্ত্রণ পরীক্ষা সহজলভ্য করা (বাজার ও ভোক্তা পর্যায়ে)
- নিরাপদ খাদ্যআইন সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা
- জাতীয়, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে আইন বাস্তবায়নে কমিটি গঠন করা
- হাট/বাজারভিত্তিক কমিটি গঠন করে নিরাপদ খাদ্য বিপণন তদারকির দায়িত্ব প্রদান করা
- নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ বা দায়িত্বপ্রাপ্ত পরিবীক্ষণ কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে একটি 'হটলাইন সেবা' প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা (যেমন: কৃষি সেবা, দুদক, বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ সেল, ইত্যাদি)

২. নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন

- বিকল্প নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবনে গবেষণার কার্যক্রম জোরদার করা
- খাদ্য উৎপাদনে অনিয়ন্ত্রিত/ক্ষতিকারক রাসায়নিক উপাদান যেমন: আগাছানাশক, কীটনাশক, অ্যান্টিবায়োটিক, গ্রোথ হরমোন, ইত্যাদি) ব্যবহারের বিপদ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা ও আমদানী হ্রাস করা।
- খাদ্য উৎপাদনে বিকল্প নিরাপদ প্রযুক্তি (বায়ো ফার্টিলাইজার/পেষ্টিসাইড, ইফেকটিভ মাইক্রোঅর্গানিজম, স্বাস্থ্যসম্মত সংরক্ষক, ইত্যাদি) দেশে উৎপাদন ও বাজারে সহজলভ্য করা
- উৎপাদিত খাদ্যের বিবরণ (জৈব/অজৈব/জিএমও), ব্যবহৃত উপাদান, খাদ্য/পুষ্টিমান, সম্ভাব্য ঝুঁকি/পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি লেবেলিং নিশ্চিত করা
- নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনে সহায়ক উপকরণ সহজলভ্য করা, প্রয়োজনে ভর্তুকিমূল্যে সরবরাহ নিশ্চিত করা
- নিরাপদ খাদ্য উৎপাদক সমিতি বা কমিউনিটি এন্টারপ্রাইজ গঠনকে উৎসাহিত করা, রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা

৩. প্রক্রিয়াজাতকরণ, সরবরাহ, বিপণন

- নিরাপদ খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণে প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তি ও অর্থায়ন সহায়তা প্রদান করা
- ব্যক্তি উদ্যোগের পাশাপাশি কমিউনিটি উদ্যোগে প্রক্রিয়াজাতকরণ প্লান্ট স্থাপনে সহায়তা করা
- 'কমিউনিটি ষ্টোরেজ' গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রণোদনা সহায়তা প্রদান করা
- নিরাপদ খাবার বাজার ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ ও সহায়তা জোরদার করা
- বাজার কমিটি বা কমিউনিটি কর্তৃক সত্যায়িত নিরাপদ খাবার বিপণনের ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা
- গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ করে 'নিরাপদ' ব্র্যান্ডিং সৃষ্টির মাধ্যমে ভোক্তার আস্থা/ক্রেতার আগ্রহ বৃদ্ধিতে উদ্যোগ গ্রহণ করা
- উৎপাদিত খাদ্যপণ্যের সংগ্রহোত্তর নিরাপদ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা

৪. বিনিয়োগ/অর্থায়ন

- নিরাপদ খাদ্য গবেষণা ও সম্প্রসারণে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা। এই খাতে অনুদান প্রদানকে 'কর রেয়াত' সুবিধা প্রদান করা
- নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে বিশেষ তহবিল গঠন এবং বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান (যেমন: পিকেএসএফ, এসএমই ফাউন্ডেশন, হরটেক্স ফাউন্ডেশন, ইত্যাদি) গড়ে তোলা
- নিরাপদ খাদ্য 'ভ্যালু চেইন' ব্যবস্থাপনায় স্পেশাল ফিনানসিয়াল প্যাকেজ প্রদান করা এবং কৃষিঋণ নীতিমালায় অন্তর্ভুক্ত করা
- নিরাপদ খাদ্যে সহজলভ্য এবং স্বল্প সুদে ঋণ পাবার নিশ্চয়তা বৃদ্ধি করা
- বিনিয়োগ ও অর্থায়ন সম্পর্কিত বিদ্যমান তথ্যাদি সর্বস্তরে সহজবোধ্য ভাষায় প্রচার করা

৫. নিরাপদ খাদ্য সহায়ক অবকাঠামো উন্নয়ন/ বিকল্প পরিবহন

- দেশের সকল বাজারের ভৌত পরিবেশ ও অবকাঠামো উন্নত করা
- নিরাপদ খাদ্য/কৃষক/উৎপাদক বান্ধব বাজার তৈরিতে সহায়তা প্রদান করা
- খাদ্য অপচয়রোধ সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা, প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা
- নৌপথ, রেলপথসহ সকল ক্ষেত্রে বিশেষায়িত ও অগ্রাধিকারমূলক পরিবহন ব্যবস্থাপনা তৈরি করা
- পথখাবারের দোকান, মুচরা বিক্রেতা হোটেল, রেস্টোরাঁসহ খাদ্য পরিবেশনের সকল প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং স্বাস্থ্যসম্মত মান নিশ্চিত করার জন্য সহায়তা প্রদান

নিরাপদ খাদ্য আইন-২০১৩ বাস্তবায়ন এবং নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন ও বিপণনে বিসেফ ফাউন্ডেশন

বিসেফ ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠালগ্ন (২০০৯ সাল) থেকেই নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা তথা উৎপাদন থেকে বিপণন পর্যন্ত নানা পর্যায়ে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতাগুলো নিরসনে নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে এডভোকেসী করে আসছে। নিরাপদ খাদ্য আইন-২০১৩ বাস্তবায়নেও বিসেফ ফাউন্ডেশন নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষকে সম্ভাব্য সহযোগিতা দিতে আগ্রহী। যদিও বিসেফ ফাউন্ডেশন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে 'মানুষের জন্য আইন, আইনের জন্য মানুষ নয়'। আমরা বাংলাদেশকে একটা বৃহত্তর কারাগার হিসেবে দেখতে চাই না। কাউকে শাস্তি দেয়ার আগে বরং আইন অনুযায়ী বা আইনের আওতায় নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন, আমদানী, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ, বিপণন ও বিক্রয় সংশ্লিষ্ট সমন্বয়ের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্টদের প্রয়োজনীয় সহায়তা করার বিষয়ে মনযোগী হতে আমরা বিশেষভাবে প্রস্তাব করছি।

নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে কি করা প্রয়োজন সে সম্পর্কে আজ আমরা নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে কতিপয় প্রস্তাবনা তুলে ধরলাম। এর বাইরেও আরও বিজ্ঞ মতামত থাকতে পারে। আমরা সকল মতামতকে বিবেচনায় নিয়ে একটি কার্যকর পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য সরকারের কাছে প্রস্তাব উত্থাপন করছি। নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে আমাদের সহযোগিতা চাইলে বিসেফ ফাউন্ডেশন সানন্দে সহায়তা প্রদানে আগ্রহী।

এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকার বাংলাদেশকে উন্নত রাষ্ট্রের পথে পরিচালনা করছেন। আমাদের অর্থনৈতিক ভিত্তি প্রতিনিয়ত মজবুত হচ্ছে। আমরা উন্নয়নশীল দেশের রথে উঠেছি। নিরাপদ খাদ্যে বিনিয়োগ এসডিজি অর্জনেও সহায়ক। সে কারণেই আমরা আশাবাদী যে সরকার আগামীতে নিরাপদে খাদ্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবে এবং আমরা খাদ্য নিরাপদতায় বিশ্বের বুকে দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করতে সক্ষম হবো। বাংলাদেশের খাবারকে এমন একটা মানে নিয়ে যেতে সক্ষম হবো যাতে করে আমাদের রপ্তানিক্ষেত্রে কোন বাধা না থাকে। পর্যটকগণ বাংলাদেশে এসে নিরাপদে খাবার গ্রহণ করবেন এবং ফিরে গিয়ে আমাদের খাদ্যমান ও আতিথিয়তা সম্পর্কে অন্যদের উৎসাহিত করবেন এমন একটা ভবিষ্যতের স্বপ্ন

আমাদের সকলের। সুন্দর সেই বাংলাদেশ গড়ে তুলতে হলে নিরাপদ খাদ্যের সামাজিক আন্দোলনে যুব সমাজকে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত করতে হবে। যুবদের প্রশিক্ষণ ও আর্থিক সহায়তা দেয়ার মাধ্যমে আমরা বেকারত্ব অবসানের পাশাপাশি সকলের জন্য নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তি সহজতর করতে পারি। সরকারের নানা ধরণের আর্থিক প্রকল্প আছে। কিন্তু জনগণ সব প্রকল্পের কথা জানে না। সরকারী সুযোগ-সুবিধাগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠীর দখলে থাকে। সত্যিকারের উদ্যোক্তদের কাছে তা যথাযথভাবে পৌঁছায় না। এই অচলায়তন ভাঙতে হবে। জনগণকে জানাতে হবে সরকার কি কি সুবিধা দিচ্ছেন এবং কোথায় তাদের অধিকার কতখানি। তথ্যের এই অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করা এবং জনগণকে সঠিক পথে ধাবিত করার মধ্যেই আমাদের মাছে-ভাতে বাঙালির খাদ্য নিরাপদতা লুকিয়ে আছে।

খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির মত নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণেও আমরা সফল হবো। এই আত্মবিশ্বাস আমাদের রয়েছে। আমাদের জয় হবেই। সকলকে ধন্যবাদ।

নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনায় বিএসটিআই'র ভূমিকা

সরদার আবুল কালাম

বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই) শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে দেশের একমাত্র জাতীয় মান প্রণয়ন ও মান সনদ প্রদানকারী সংস্থা। বিএসটিআই অধ্যাদেশ (৩৭), ১৯৮৫-এর ক্ষমতাবলে জাতীয়ভাবে খাদ্যদ্রব্যসহ বিভিন্ন পণ্য উৎপাদনের সময় ব্যবহৃত কাঁচামালসমূহের মান ও সংরক্ষণ পদ্ধতি, পণ্য প্রক্রিয়াজতকরণ, মোড়কজাতকরণ, পরীক্ষণ পদ্ধতি, খাদ্যে সংযোজন (Food Additivies), স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে খাদ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিডিএস-৮২২ (Code of Practice for Food Hygiene in a Food Processing Unit) সহ মোট আট শতাধিক কারিগরি মান তৈরি করেছে। বিভিন্ন খাদ্যপণ্যের নিরাপদতা ও গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাসহ পরীক্ষণ পদ্ধতির জন্য বাংলাদেশ মানসমূহ (বিডিএস), Codex Alimentarius Commission (CAC) ও International Organization for Standardization (ISO) মানের সাথে Harmonization করে যাচ্ছে।

দূষণ ও ভেজাল প্রতিরোধ কার্যক্রমে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই) আইন অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে । জনস্বার্থ ও জনগুরুত্ব বিবেচনা করে সরকার বিভিন্ন সময় এসআরও জারির মাধ্যমে এ যাবৎ ৫৮টি খাদ্যপণ্যসহ মোট ১৫৪টি পণ্যের অনুকূলে সার্টিফিকেশন মার্কস লাইসেন্স (মান সনদ) গ্রহণ বাধ্যতামূলক করেছে। বিএসটিআই কর্তৃক খাদ্যমান (Food Standards) নিরূপণ, পরীক্ষণ ও বাধ্যতামূলক সিএম লাইসেন্সের আওতাভুক্ত ৫৮টি প্রক্রিয়াজাতকৃত এবং মোড়কজাতকৃত খাদ্যপণ্যের অনুকূলে মান সনদ প্রদানসহ সার্ভিল্যান্সের মাধ্যমে গুণগত মান তদারকি করা হয়ে থাকে।

পণ্যের মান ব্যবহারের সুবিধা হলো কোন পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে ব্যবহার্য উপকরণ, পণ্যের নিরাপদতা যাচাই করণার্থে প্রয়োজনীয় পরীক্ষণ ও পরীক্ষা পদ্ধতি, ভোক্তা সাধারণের জ্ঞাতার্থে মোড়ক/লেবেলে অত্যাবশ্যকীয় তথ্য প্রতিটি মানে উল্লেখ থাকে। একজন ব্যবসায়ী/উৎপাদনকারী সংশ্লিষ্ট পণ্যের মান (যা একটি কারিগরি ডকুমেন্ট) বাস্তবায়নের মাধ্যমে পণ্যের নিরাপদতা অক্ষুন্ন রাখতে পারেন। তাছাড়া, The Standards of Weights and Measures Ordinance, 1982 (Amendment) Act, 2001 অনুযায়ী প্রণীত পণ্যসামগ্রী মোড়কজাতকরণ বিধিমালা, ২০০৭ প্রকাশের মাধ্যমে মোড়কজাতকৃত প্রতিটি পণ্যের মোড়কে পণ্যের নাম, উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের পূর্ণ নাম ও ঠিকানা, উৎপাদনকারী যদি বাজারজাতকারী না হয় উৎপাদনকারী ও বাজারজাতকারী প্রতিষ্ঠানের পূর্ণ নাম ও ঠিকানা, উৎপাদনের তারিখ, মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ, ব্যাচ বা লট নম্বর, সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য, নেট পরিমাণ- এসকল তথ্য পণ্যের মোড়কে উল্লেখ করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

খাদ্যপণ্য প্রক্রিয়াজাত/উৎপাদন বিক্রয়-বিতরণের প্রতিটি ধাপে Good Manufacturing Practice (GMP) ও Good Hygienic Practice (GHP) অনুসরণের জন্য প্রযোজ্য বাংলাদেশ মান (বিডিএস) ৮২২:২০১২ এবং সংশ্লিষ্ট বিডিএস মান অনুযায়ী যাচাইয়ের পর নমুনা সংগ্রহ করে বিএসটিআই কর্তৃক অ্যাক্রিডিটেড ফুড ও মাইক্রো-বায়োলজিক্যাল ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষান্তে তৃতীয় নিরপেক্ষ (Third Party) সংস্থা হিসেবে মান সনদ প্রদান করা হয়।

বিএসটিআই কর্তৃক প্রদত্ত মান সনদ প্রোডাক্ট সার্টিফিকেশনের আন্তর্জাতিক মান আইএসও/আইইসি ১৭০৬৫:২০১২ অনুযায়ী ১৩টি খাদ্যপণ্যের অনুকূলে National Accreditation Board for Certification Bodies (NABCB), India হতে অ্যাক্রিডিটেশন অর্জন করেছে। পাশাপাশি বিএসটিআই'র ল্যাবরেটরিসমূহে সম্পাদিত ১৬১টি পরীক্ষণ প্যারামিটার National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL), India হতে অ্যাক্রিডিটেশন স্বীকৃতিপ্রাপ্ত। তাছাড়া সম্প্রতি Bangladesh Accreditation Board (BAB), বিএসটিআই'র পরীক্ষণ ল্যাবের ২১টি খাদ্যপণ্যসহ মোট ৩৮টি পণ্যের ৪১১টি পরীক্ষণ প্যারামিটারকে এ্যাক্রিডিটেশন তথা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি প্রদান করেছে। ইতোমধ্যে বিএসটিআই এবং ভারতের Bureau of Indian Standards (BIS) এর মধ্যে Memorandum of Understanding (MoU) স্বাক্ষরিত হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় গত এপ্রিল ২০১৭ খ্রিঃ FSSAI, India কর্তৃক বাংলাদেশ হতে ২১টি খাদ্যপণ্য ভারতে রপ্তানির ক্ষেত্রে বিএসটিআই'র পরীক্ষণ সনদ গ্রহণের নিমিত্ত নোটিফিকেশন জারী করা হয়েছে; যার মাধ্যমে বাংলাদেশ হতে ভারতে পণ্য রপ্তানী বানিজ্যে অতন্ত্র বাধা দূরীকরণে বিএসটিআই কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে। এছাড়াও Foreign Certification System-এর আওতায় দেশের একমাত্র জাতীয় মান সংস্থা বিএসটিআই-কে ভারতের রাষ্ট্রীয় মান সংস্থা BIS-এর পক্ষ হতে তৃতীয় নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে মানসনদ প্রদানের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

সরদার আবুল কালাম
মহাপরিচালক, বিএসটিআই

খাদ্য নিরাপদতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিএসটিআই ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষণ কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রাদির মধ্যে HPLC, GCMS, AAS ছাড়াও অতিসম্প্রতি LCMSMS, GCMSMS, ICPOES-এর ন্যায় অত্যাধুনিক পরীক্ষণ যন্ত্র স্থাপন কার্যক্রম চলমান রয়েছে; যা বাস্তবায়িত হলে এসকল যন্ত্রের মাধ্যমে বিভিন্ন খাদ্যপণ্যে ব্যবহৃত Artificial Colour, Artificial Flavour, Vitamin, Pesticide Residue সহ গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষণ সুবিধা সৃষ্টি হবে।

আন্তর্জাতিক মান আইএসও/আইইসি ১৭০২১ অনুসারে পরিচালিত বিএসটিআই'র ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সার্টিফিকেশন পদ্ধতিকে Bangladesh Accreditation Board (BAB) কর্তৃক অ্যাক্রিডিটেশন স্বীকৃতি প্রদান করেছে। এর ফলে খাদ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ ও বিপণনের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মান ২২০০০:২০০৫ (Including HACCP) অনুযায়ী বিএসটিআই থেকে নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি [Food Safety Management System (FSMS)] সনদ গ্রহণের মাধ্যমে উৎপাদনকারীগণ বিশ্ববাজারে পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে ক্রেতার চাহিদা (Buyer Requirement) পূরণে সক্ষম হচ্ছে। বিএসটিআই'র এ সকল কার্যক্রমের দ্বারা একদিকে যেমন ভোক্তার পণ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে আস্থা বৃদ্ধি পেয়েছে, অপরদিকে বিশ্ববাজারে পণ্য রপ্তানি বাণিজ্যে কারিগরি বাধা (Technical Barrier to Trade) হ্রাস পেয়েছে।

বিএসটিআই'র মান উইং-এর কৃষি ও খাদ্য বিভাগের আওতায় প্রণীত ৮১২টি মান/গাইড-এর মধ্যে ৫৮টি বাধ্যতামূলক সিএম লাইসেন্সের আওতাভুক্ত খাদ্যপণ্য ব্যতীত উৎপাদনকারী কর্তৃক অন্যান্য মান অনুযায়ী ঐচ্ছিক খাদ্যপণ্যের (Voluntary Food Products) অনুকূলে মান সনদ প্রদানের ক্ষেত্রে কারখানা পরিদর্শন, নমুনা সংগ্রহ, সংগৃহীত নমুনা পরীক্ষণ রিপোর্ট মূল্যায়ন করে নিরপেক্ষ প্রোডাক্ট সার্টিফিকেশন কমিটির সভায় ঐচ্ছিক পণ্যের (Voluntary Products) অনুকূলে সিএম লাইসেন্স অনুমোদন দেয়া হয়। লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ গুণগত মানসম্পন্ন পণ্য ক্রেতা-ভোক্তা পর্যায়ে নিশ্চিত করছে কিনা তার নিশ্চয়তা বিধানকল্পে পণ্যের নমুনা বাজার ও কারখানা হতে সার্ভিল্যান্স টিমের মাধ্যমে সংগ্রহ করে পরীক্ষান্তে মান যাচাই করা হয়। এ ক্ষেত্রে কোনো ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বরাবর কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান, লাইসেন্স স্থগিতকরণ, লাইসেন্স বাতিলসহ আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হয়।

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গঠনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকার ঘোষিত ২০২১ সালের মধ্যে শিল্পসমৃদ্ধ মধ্যম আয়ের, ২০৩০ সালে এসডিজি'র লক্ষ্যসমূহ অর্জন এবং ২০৪১ সাল নাগাদ উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণের অংশ হিসেবে বাজারে ফলমূল, মাছ-মাংস ইত্যাদি পণ্যের ভেজাল প্রতিরোধ তথা জনসাধারণকে তার নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করণার্থে বিএসটিআই তার স্বীয় দায়িত্বের পাশাপাশি বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণের নেতৃত্বে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে অপরাধীদের চিহ্নিত করে শাস্তি প্রদান নিশ্চিত করে আসছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণের নেতৃত্বে বিএসটিআই কর্তৃক ৭৮১টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে ৪৯৭.৮৮ লক্ষ টাকা জরিমানা আদায়সহ ৩০ জন ভেজালকারী অসাধু ব্যবসায়ীকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে।

বিএসটিআই'র সেবা কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রধান কার্যালয়, ঢাকাসহ বিভিন্ন আঞ্চলিক অফিসে ওয়ানস্টপ সার্ভিস সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। ওয়ানস্টপ সার্ভিস সেন্টার থেকে সহজে তৃণমূল পর্যায়ে সেবা প্রদান সম্ভব হচ্ছে। সেবা প্রদানে গতিশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিএসটিআই বিলিং সফট নামক একটি সফটওয়্যারের মাধ্যমে অল্প সময়ে যাবতীয় বিল প্রদান ও গ্রহণ করা হচ্ছে। তাছাড়া, আমদানি নীতি আদেশ অনুযায়ী কাস্টমস কর্তৃক চূড়ান্ত শুল্কায়নপূর্বক দেশে প্রবেশের পূর্বে পণ্যভেদে বেশ কয়েকটি রেগুলেটরি অথরিটির অনুমোদন প্রয়োজন হয়। আমদানি সংক্রান্ত কার্যক্রমে আরও গতিশীলতা আনার লক্ষ্যে কাস্টমস-এর কার্যক্রমের সাথে সম্পর্কযুক্ত সফটওয়্যার ASYCUDA WORLD-এর সাথে Other Government Organization (OGA)-এর মধ্যে একমাত্র বিএসটিআই'র সাথে কানেক্টিভিটি স্থাপন করা সম্ভব হয়েছে। এই অগ্রণী ভূমিকা পালনের মাধ্যমে মান অনুযায়ী বিভিন্ন পণ্য (বিশেষত খাদ্যপণ্য) পরীক্ষান্তে ASYCUDA WORLD System ব্যবহার করে অনলাইনে বিএসটিআই থেকে ছাড়পত্র প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে। এর ফলে আমদানিকৃত পণ্য বাংলাদেশ মানের সমতুল্যতা নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে।

জনগণের দোরগোড়ায় সেবা- এ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে মাননীয় শিল্পমন্ত্রীর নির্দেশনায় ও মাননীয় শিল্প সচিবের পরামর্শক্রমে বিএসটিআই থেকে সার্টিফিকেশন মার্কস (সিএম) বিষয়ক সেবা প্রদান কার্যক্রমকে অধিকতর সহজিকরণের নিমিত্ত ইতোমধ্যেই বিশ্বব্যাংকের আওতাধীন আইএফসি'র সহযোগিতায় সার্টিফিকেশন মার্কস কার্যক্রম অটোমেশনের আওতায় আনায়ণের জন্য সফটওয়্যার প্রণয়ন সমাপ্ত হয়েছে। এই অটোমেশন কার্যক্রমে আবেদনপত্র জমাদানসহ সিএম লাইসেন্স প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অটোমেটেড/অনলাইন সার্ভিস গ্রহণ , সরকারি ফি জমাদানের ক্ষেত্রে ই-পেমেন্টের সুবিধা প্রদান করার বিষয়টি বিবেচনা করা হয়েছে, যা বাস্তবায়িত হলে সেবা গ্রহণকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান তৃণমূল পর্যায়ে ইউনিয়ন তথ্যসেবা কেন্দ্র বা ঘরে বসেই বিএসটিআই'র মান সনদ গ্রহণ করত পারবে, যা হবে খাদ্য নিরাপদতায় একটি অনন্য মাইলফলক। প্রসঙ্গত, স্বাধীনতা উত্তরকাল হতেই দেশের মানুষের খাদ্যের নিরাপদতা বিধানকল্পে পিউর ফুড অর্ডিন্যান্স, ১৯৫৯ প্রচলিত ছিল যা পরবর্তীতে সংশোধন করে বাংলাদেশ পিউর ফুড আইন, ২০০৫ জারি করা হয়। আইনটিকে যুগোপযোগী করে দেশের নাগরিকের জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তির

অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তথা প্রতিটি মানুষের সুস্থভাবে বেঁচে থাকার নিশ্চয়তা বিধানকল্পে সরকার নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ জারি করেছে। পরবর্তীতে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির যথাযথ অনুশীলনের মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করতে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, আমদানি, মজুদ, সরবরাহ, বিপণন ও বিক্রয় সংরক্ষণ ও বিক্রয়-বিতরণ কার্যক্রম সমন্বয়ের মাধ্যমে সহযোগিতা প্রদান এবং নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষে সরকার ২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ তারিখে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ গঠন করেছে।

দূষণ ও ভেজালমুক্ত নিরাপদ খাদ্যের নিশ্চয়তা দিয়ে দেশীয় ভোক্তা অধিকার প্রতিষ্ঠা ছাড়াও এদেশে উৎপাদিত কাঁচা শাকসবজি, প্রক্রিয়াজাতকৃত খাদ্যপণ্য, মাছ-মাংস বিদেশে রপ্তানি করে রপ্তানি আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ববাজারে বাণিজ্যের প্রসার ঘটানো উৎপাদনকারী ও রপ্তানিকারকদের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। জাতীয় এসব চ্যালেঞ্জ বাস্তবায়নে জাতীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা জরুরি। খাদ্যের নিরাপদতা নিশ্চিতকরণে/নিয়ন্ত্রণে ও এসব চ্যালেঞ্জকে বাস্তবায়নে বিএসটিআইসহ বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন ফুড এজেন্সি/দপ্তর/মন্ত্রণালয় স্ব-স্ব আইন অনুযায়ী কাজ করে যাচ্ছে। বেশ কিছু কৃষি গবেষণাগার, রাসায়নিক গবেষণাগার ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবরেটরি কর্তৃক খাদ্যশস্যে উপস্থিত ক্ষতিকর কীটনাশকের পরিমাণ এবং প্রক্রিয়াজাতকৃত খাদ্যপণ্যের পুষ্টিমান পরীক্ষা করা হয়ে থাকে। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে এসকল ল্যাবরেটরির পরীক্ষণ সনদের গ্রহণযোগ্যতার জন্য ল্যাবরেটরিসমূহের অ্যাক্রিডিটেশন আবশ্যক।

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কেন্দ্রীয়ভাবে দেশে নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি গড়ার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট খাদ্য আইন বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয় করার জন্য আইন অনুযায়ী দায়বদ্ধ। সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় একটি নিরাপদ খাদ্য বলয় তৈরি করে রূপকল্প ২০২১ এবং ২০৩০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে Sustainable Development Goal (SDG) বাস্তবায়নের মাধ্যমে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সুখী-সমৃদ্ধ ও বাসযোগ্য সোনার বাংলা গড়াই হোক আগামীর প্রত্যয়।

নিরাপদ মৎস্য ও মৎস্যপণ্য : মৎস্য অধিদপ্তরের গৃহীত পদক্ষেপ

সৈয়দ আরিফ আজাদ

বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম প্রথম সারির মাছ উৎপাদনকারী দেশ। অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে মৎস্য আহরণে বিশ্বে ৪র্থ ও অভ্যন্তরীণ বদ্ধ জলাশয়ে মৎস্য উৎপাদনে বিশ্বে ৫ম স্থান অধিকার করেছে বাংলাদেশ। ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে ২০১০-১১ অর্থবছরে যেখানে মাছের উৎপাদন ছিল ৩২.৩৪ লক্ষ মে. টন, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৪০.৫০ লক্ষ মে. টন চাহিদার বিপরীতে ৪১.৩৪ লক্ষ মে. টন মাছ উৎপাদনের মাধ্যমে বাংলাদেশ মাছ উৎপাদনে স্বয়ম্ভর ও উদ্বৃত্ত দেশে পরিণত হয়েছে। দেশের খাদ্য ও পুষ্টির নিরাপত্তা বিধান এবং নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য সরবরাহেও মৎস্য খাতের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জাতীয় খাদ্যগ্রহণ নির্দেশিকা ২০১৫ অনুযায়ী জনপ্রতি প্রতিদিন ৬০ গ্রাম মাছের চাহিদার বিপরীতে বিবিএস'র Preliminary Report on Household Income and Expenditure Survey (HIES) ২০১৬ অনুযায়ী দেশের মানুষ বর্তমানে জনপ্রতি প্রতিদিন ৬২.৫৮ গ্রাম মাছ গ্রহণ করছে।

মানসম্মত নিরাপদ মৎস্য ও মৎস্যপণ্য রপ্তানিতে বাংলাদেশ এশিয়া তথা বিশ্বে এক অনন্য মডেল। বিগত ২০-৩০ এপ্রিল, ২০১৫ তারিখে EU-FVO অডিট পরিচালিত হয়। উক্ত অডিটে NRCP নন-কম্প্লায়েন্ট নমুনা সংখ্যা ও RASFF (Rapid Alert Sytem for Food & Feed) নোটিফিকেশনভুক্ত কনসাইনমেন্টের সংখ্যা হ্রাস এবং মৎস্য মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরিসমূহের মানোন্নয়ন ও পরীক্ষণ সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে অডিট কর্তৃপক্ষ সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। এর ফলে বাংলাদেশ হতে ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশসমূহে রপ্তানিতব্য মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের কনসাইনমেন্টের সাথে রাসায়নিক পরীক্ষার রিপোর্ট সংযোজনের বাধ্যবাধকতা তুলে নেয়া হয়, যা দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর মধ্যে এক অনন্য দৃষ্টান্ত। উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ সর্বসাধারণের জন্য নিরাপদ মৎস্য ও মৎস্যপণ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা। নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তির অধিকার প্রতিটি নাগরিকেরই রয়েছে। এজন্য প্রয়োজন উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াজাতকরণ, মজুদ, সরবরাহ, বিপণন ও বিক্রয় প্রতিটি স্তরেই সঠিক ব্যবস্থাপনা, সচেতনতা সৃষ্টি, নজরদারি ও সমন্বয় সাধন। মৎস্য অধিদপ্তর এ লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। উৎপাদন থেকে শুরু করে ভোক্তা পর্যন্ত প্রতিটি ধাপেই গুরুত্বসহ কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, যাতে মানসম্মত নিরাপদ মৎস্য ও মৎস্যপণ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা যায়।

নিরাপদ মৎস্য ও মৎস্যপণ্য নিশ্চিতকরণে বিদ্যমান আইন, বিধি ও নীতিমালা:

নিরাপদ মৎস্য ও মৎস্যপণ্য উৎপাদন, বাজারজাতকরণ ও রপ্তানির নিমিত্ত মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক নিম্নবর্ণিত আইন, বিধিমালা, নীতিমালা, গাইডলাইন ইত্যাদি যথাযথভাবে অনুসরণ ও বাস্তবায়ন করা হয়-

আইন ও বিধিমালাসমূহ:

- মৎস্য ও মৎস্যপণ্য (পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ, ১৯৮৩ ও মৎস্য ও মৎস্যপণ্য (পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ১৯৯৭ (২০০৮ ও ২০১৪ সালে সংশোধিত)
- মেরিন ফিশারিজ অধ্যাদেশ, ১৯৮৩ ও মেরিন ফিশারিজ বিধিমালা, ১৯৮৩
- মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য আইন, ২০১০ ও মৎস্যখাদ্য বিধিমালা, ২০১১
- মৎস্য হ্যাচারি আইন, ২০১০ ও মৎস্য হ্যাচারি বিধিমালা, ২০১১

জাতীয় নীতিমালা ও গাইডলাইনসমূহ:

- জাতীয় মৎস্য নীতি, ১৯৯৮
- ন্যাশনাল রেসিডিউ কন্ট্রোল প্লান ও পলিসি গাইডলাইনস, ২০১১ (২০১২ সালে সংশোধিত)
- জাতীয় চিংড়ি নীতিমালা, ২০১৪
- ফিস এন্ড ফিশারি প্রোডাক্টস অফিসিয়াল কন্ট্রোল প্রোটোকল, ২০১৫
- অ্যাকোয়াকালচার মেডিসিনাল প্রোডাক্টস নিয়ন্ত্রণ নির্দেশিকা, ২০১৫
- চিংড়ি হ্যাচারির জন্য অনুসরণীয় দিকনির্দেশনা
- মৎস্যখাদ্য উৎপাদন, আমদানি ও বিপণন বিষয়ে প্রতিপালনীয় দিকনির্দেশনা

সৈয়দ আরিফ আজাদ
মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর বাংলাদেশ

মৎস্য হ্যাচারি আইন, ২০১০ ও মৎস্য হ্যাচারি বিধিমালা, ২০১১ :

নিরাপদ মাছ সরবরাহের অন্যতম শর্ত হলো মাছ চাষ ও আহরণের অগ্র-পশ্চাৎ সংযোগের (Forward-Backward linkage) প্রতিটি স্তরেই কঠোর নজরদারি ও জনসচেতনতা সৃষ্টি । এ লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তর বিভিন্ন আইনি ব্যবস্থার পাশাপাশি জনসচেতনতা সৃষ্টি এবং চাষি ও কর্মকর্তা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে যাচ্ছে। মানসম্মত মৎস্যবীজ নিশ্চিতকরণের জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে মৎস্য হ্যাচারি আইন, ২০১০ ও মৎস্য হ্যাচারি বিধিমালা, ২০১১। হ্যাচারির কাঙ্ক্ষিত পরিবেশ বজায় রাখা, মানসম্মত উন্নত ব্রুড ব্যবহার, জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর অননুমোদিত উপকরণ ব্যবহার রোধকল্পে মৎস্য হ্যাচারি আইন ও বিধিমালার আওতায় নিয়মিত পরিদর্শন, অভিযান ও মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হচ্ছে। দেশের সব হ্যাচারিকে লাইসেন্স প্রদান ও নিবন্ধনের আওতায় আনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ পর্যন্ত দেশের মোট ৯৫৫টি বেসরকারি হ্যাচারির মধ্যে ৬৩৪টি হ্যাচারিকে নিবন্ধন ও লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরের নভেম্বর পর্যন্ত ৪৩১টি অভিযান ও ১১৮টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়েছে। নিয়মিত পরিদর্শন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ সময় আইন অমান্য করার কারণে ২টি মামলা, ৫০০০০ টাকা জরিমানা ও ৯টি হ্যাচারির কার্যক্রম বন্ধ করা হয়েছে।

মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য আইন, ২০১০ ও মৎস্যখাদ্য বিধিমালা, ২০১১:

মাছচাষে জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর খাদ্য উপকরণের ব্যবহার রোধ ও গুণগত মানসম্পন্ন মৎস্যখাদ্য নিশ্চিতকরণের জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য আইন, ২০১০ ও মৎস্যখাদ্য বিধিমালা, ২০১১। এ আইন ও বিধির আওতায় দেশের খাদ্য উৎপাদন ও বিপণনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে রেজিস্ট্রেশন ও লাইসেন্স প্রদান করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত ২১৬১টি মৎস্যখাদ্য উৎপাদনকারী, আমদানিকারক ও বিপণন প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। মৎস্যখাদ্য কারখানা ও বিপণনকেন্দ্রসমূহ নিয়মিত মনিটরিং ও পরিদর্শন করা হয়। ২০১৭-১৮ অর্থবছরের নভেম্বর পর্যন্ত এ আইনের আওতায় ৯৮৩টি অভিযান ও ২৫৩টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়েছে। এ সময় আইন অমান্য করার কারণে ৩টি মামলা, ৫০০০০ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। এ বিধিমালার প্রয়োগ নিশ্চিতকরণে নিয়মিত মৎস্যখাদ্যে এন্টিবায়োটিক, হেভিমেটাল, মাইকোটক্সিন ইত্যাদির উপস্থিতি এবং গুণাগুণ (Proximate composition) পরীক্ষা করা হয়ে থাকে।

উত্তম মাছচাষ অনুশীলন ও ব্যবস্থাপনা:

নিরাপদ মৎস্য উৎপাদনের উপায় হলো উত্তম মাছচাষ অনুশীলন ও ব্যবস্থাপনার প্রবর্তন। উত্তম মাছচাষ অনুশীলন ও ব্যবস্থাপনা ধারাবাহিক কতগুলো কার্যক্রমের সমষ্টি, যা দক্ষ ও দায়িত্বশীল ব্যবস্থাপনা এবং সহনশীল পরিবেশ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে নিরাপদ মাছ উৎপাদন নিশ্চিত করে। উত্তম ব্যবস্থাপনার ধাপসমূহ হলো- স্থান নির্বাচন, সঠিক উৎপাদন পরিকল্পনা প্রণয়ন, চাষে ব্যবহৃত মৎস্যবীজ, জৈবনিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, খাদ্য ব্যবস্থাপনা, খাদ্য সংগ্রহ ও মজুত, মাছের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা, হাইজিন ও স্যানিটেশন, মাছ আহরণ, আহরণোত্তর পরিচর্যা ও সঠিক সংরক্ষণ। মৎস্য অধিদপ্তর উত্তম মৎস্যচাষ অনুশীলন নিশ্চিতকরণের নিমিত্তে কাজ করে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে খামারসমূহ রেজিস্ট্রেশন, চাষি পর্যায়ে প্রশিক্ষণ, উৎপাদন পর্যায়ে নিয়মিত পরিদর্শন ও তদারকি করা হচ্ছে। ২০১২-১৩ হতে ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত গুড একুয়াকালচার প্র্যাকটিস এন্ড ফুড সেফটির ওপর ৩৪,০৮৯ জন এবং এনআরসিপি (ন্যাশনাল রেসিডিউ কন্ট্রোল প্লান) নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষণের ওপর ৪২৭২ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ পর্যন্ত প্রায় ২,০৭,০০০টি চিংড়ি ও ৯৬২৪টি সাদা মাছের খামারকে রেজিস্ট্রেশনের আওতায় আনা হয়েছে।

মাছ সংরক্ষণে ফরমালিন ব্যবহার রোধ:

ফরমালিন জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর একটি উদ্বায়ী রাসায়নিক পদার্থ, যার সংস্পর্শে মানুষের চর্মরোগ, ডায়রিয়া, অ্যাজমা, অন্ধত্ব, কিডনি রোগ, এমনকি ক্যানসারের মতো মরণব্যাধিও হতে পারে। একসময় মাছসহ অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণে ফরমালিনের ব্যবহার সর্বসাধারণের মাঝে ব্যাপক আতঙ্ক সৃষ্টি করে। মৎস্য অধিদপ্তর জনগণের জন্য নিরাপদ মাছ সরবরাহে অঙ্গীকারবদ্ধ। ফরমালিনের ব্যবহার রোধকল্পে জনসচেতনতা সৃষ্টি, অভিযান ও মোবাইল কোর্ট পরিচালনা, ফরমালিনের উপস্থিতি শনাক্তকরণের জন্য উপযোগী কিট সরবরাহ করে মৎস অধিদপ্তর। এ লক্ষ্যে 'মৎস্য সংরক্ষণের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ও গণসচেতনতা সৃষ্টি' নামক একটি বিশেষায়িত প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এ প্রকল্পের মাধ্যমে মাঠপর্যায়ে ৮০টি ফরমালিন শনাক্তকরণ ডিজিটাল কিট বক্স বিতরণ করা হয়। ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ২৪৯৯টি উদ্বুদ্ধকরণ সভা, ৩৩টি কর্মশালা, ৩১৪৫০ জন আড়ৎদার ও সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ৫৭৬টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়েছে। প্রকল্প শেষে রাজস্ব বাজেটের আওতায় এ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টি, অভিযান পরিচালনা ও আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে মাছ সংরক্ষণে ফরমালিনের ব্যবহার প্রায় শূন্যের কোঠায় নেমে এসেছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে নভেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত ২১২২টি অভিযান ও ২৯৪টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়। বর্তমানে মাছে কোনো ফরমালিন পাওয়া যাচ্ছে না।

ন্যাশনাল রেসিডিউ কন্ট্রোল প্লান:

ন্যাশনাল রেসিডিউ কন্ট্রোল প্লান (National Residue Control Plan, NRCP) হলো বাংলাদেশে মৎস্য ও মৎস্যপণ্য উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায়ে অবাঞ্ছিত দ্রব্যের অবশিষ্টাংশ (Residue) পর্যবেক্ষণের একটি কার্যক্রম। এ কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য হলো ভোক্তার জন্য বাংলাদেশী মৎস্যপণ্য নিরাপদ করা। মৎস্য ও মৎস্যপণ্য (পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ১৯৯৭ (২০০৮ ও ২০১৪ সালে সংশোধিত) এর আওতায় ন্যাশনাল রেসিডিউ কন্ট্রোল প্লান অনুযায়ী নিয়মিত রেসিডিউ মনিটরিং করা হয়।

মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রতি বছর ন্যাশনাল রেসিডিউ কন্ট্রোল প্ল্যান প্রণয়ন করা হয় এবং সে অনুযায়ী মাছ ও চিংড়ির নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষণ করা হয়ে থাকে। এর পাশাপাশি মৎস্যচাষে ব্যবহৃত মৎস্য খাদ্যে কোন রেসিডিউ আছে কিনা তা পরীক্ষণের জন্য বিভিন্ন মৎস্য খাদ্য কারখানা ও চাষী পর্যায়ে উৎপাদিত খাদ্য নমুনা পরীক্ষা করা হয়ে থাকে। NRCP একটি risk-based পরীক্ষণ পদ্ধতি এবং এর আওতায় বর্তমানে মাছ ও চিংড়ির নমুনার ৩০টি রাসায়নিক প্যারামিটারের পরীক্ষণ করা হয়ে থাকে। এ কার্যক্রমের আওতায় যে রেসিডিউসমূহ পরীক্ষণ করা হয় তা নিম্নের সারণিতে উল্লেখ করা হলো-

পদার্থের শ্রেণী	পরীক্ষণ প্যারামিটারসমূহ
এ১ (A1)	স্টিলবিনস (ডাইইথাইল স্টিলবেস্টেরল)
এ৩ (A3)	স্টেরয়েডস (মিথাইল টেস্টোস্টেরন)
এ৬ (A6)	নিষিদ্ধ এন্টিবায়োটিকসমূহ (ক্লোরামফেনিকল (CAP), নাইট্রোফুরান মেটাবোলাইটস (AHD, AMOZ, AOZ, SEM), মেট্রোনিডাজল)
বি১ (B1)	এন্টিব্যাক্টেরিয়াল পদার্থসমূহ (টেট্রাসাইক্লিন, অক্সিটেট্রাসাইক্লিন ও ক্লোরটেট্রাসাইক্লিন (TC, OTC, CTC)
বি২এ (B2a)	অ্যাঙ্কেলমেন্টিকস (ফ্লুবেনডাজল, মেবেনডাজল)
বি৩ (এ) (B3(a)	কীটনাশকসমূহ (অর্গানোক্লোরিন/অর্গানোফসফরাস) (ডিডিটি, এলড্রিন, হেপ্টাক্লোর, এনড্রিন এবং ডাইএলড্রিন), PCBs
বি৩ (সি) (B3(c)	ভারী ধাতুসমূহ (As, Cd, Cr, Hg, Pb)
বি৩ (ডি) (B3(d)	মাইকোটক্সিন (আফ্লাটক্সিন (বি১, বি২, জি১ ও জি২)
বি৩ (ই) (B3(e)	রঞ্জক পদার্থসমূহ (ম্যালাকাইট গ্রিন, লিউকোম্যালাকাইট গ্রিন, ক্রিস্টাল ভায়োলেট ও লিউকোক্রিস্টাল ভায়োলেট)

২০১৩ সালে পরীক্ষিত মোট ১৩৩২টি নমুনার মধ্যে মাত্র ৪৯টি নমুনা নন-কম্প্লায়েন্ট (CAP-08, SEM-33, AHD-02, CV-01, Pb-04, Afl-01) হয়েছে অর্থাৎ নন-কম্প্লায়েন্ট নমুনার শতকরা হার ৩.৬৮। ২০১৪ সালে পরীক্ষিত মোট ১৩৮৮টি নমুনার মধ্যে মাত্র ২৩টি নমুনা নন-কম্প্লায়েন্ট (CAP-02, SEM-19, AHD-01, As-01) হয়েছে অর্থাৎ নন-কম্প্লায়েন্ট নমুনার শতকরা হার ১.৬৬। ২০১৫ সালে পরীক্ষিত মোট ১৩৫৫টি নমুনার মধ্যে মাত্র ০৭টি নমুনা নন-কম্প্লায়েন্ট (SEM-06, CV-01) হয়েছে অর্থাৎ নন-কম্প্লায়েন্ট নমুনার শতকরা হার ০.৫২। ২০১৬ সালে মোট ১৩৬৩টি মাছ ও চিংড়ি নমুনা পরীক্ষা করা হলেও কোনো নমুনা নন-কম্প্লায়েন্ট হয়নি। অর্থাৎ মৎস্য অধিদপ্তরের নিরন্তর কার্যক্রম গ্রহণের ফলে নন-কমপ্লায়েন্সের হার সাম্প্রতিক বছরগুলোতে উল্লেখযোগ্য হারে কমে এসেছে এবং ২০১৬ সালে তা শূন্য হয়েছে।

আহরণোত্তর মনিটরিং:

মানসম্মত ও নিরাপদ মৎস্য ও মৎস্যপণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ নিশ্চিত করার নিমিত্ত মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক মৎস্য ও মৎস্যপণ্য (পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-১৯৯৭ (২০০৮ ও ২০১৪ সালে সংশোধিত)-এর আওতায় বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। এ বিধিমালা অনুযায়ী অস্বাস্থ্যকর, পচা বা দূষিত মাছ প্রক্রিয়াজাতকরণ, বাজারজাতকরণ ও রপ্তানি নিষিদ্ধ ও এর সাথে জড়িত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে শাস্তির বিধান রয়েছে। এ আইনের অধীনে নিরাপদ মৎস্য ও মৎস্যপণ্য বাজারজাতকরণ ও রপ্তানি নিশ্চিত করার নিমিত্তে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট ও অভিযান পরিচালনা অব্যাহত রয়েছে। ২০১৭ সালের জানুয়ারি হতে নভেম্বর পর্যন্ত তিনটি মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ দপ্তর কর্তৃক স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় মোট ১৩৭টি মোবাইল কোর্ট, ২১৯টি পুশ বিরোধী অভিযান ও ৬৯টি অন্যান্য অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। এর মাধ্যমে মোট ২১,৩৩,৭০০ টাকা জরিমানা আদায়, ১১,০১৪ কেজি চিংড়ি ও ৪০০ কেজি মাছ বিনষ্ট এবং ৯ জনকে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে। তাছাড়া নিরাপদ মৎস্য ও মৎস্যপণ্য রপ্তানি মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক নিম্নলিখিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে-

- আহরণোত্তর মাছ পরিবহন ও বাজারজাতকরণকালে জড়িত সাপ্লাই চেইন মনিটরিংয়ের আওতায় যথা: আড়ৎ, ডিপো, বরফ কল ইত্যাদি মনিটরিং করা হয়
- প্রত্যেক চালু মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা মাসে অন্তত একবার রুটিন পরিদর্শন করা হয়।
- প্রক্রিয়াজাতকরণকালে মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা নিয়মিত মনিটরিং করা হয়
- রপ্তানিতব্য কনসাইনমেন্টের নমুনা পরীক্ষণ করা হয় ও স্বাস্থ্যকরত্ব সনদপত্র ইস্যু করা হয়। এ সকল মনিটরিং কালে HACCP ও Hygiene পর্যবেক্ষণ করা হয়।
- রপ্তানিতব্য কনসাইনমেন্টের নমুনাসমূহ বিধিমোতাবেক ও আমদানিকারক দেশের চাহিদার ভিত্তিতে বিভিন্ন মাইক্রোবায়োলজিক্যাল ও রাসায়নিক প্যারামিটারসমূহের পরীক্ষণ করা হয়।

মৎস্য মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরিসমূহঃ

রপ্তানিতব্য কনসাইনমেন্টের পণ্যের প্রাক-রপ্তানি পরীক্ষণ ও NRCP নমুনা পরীক্ষণে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনায় তিনটি আন্তর্জাতিক মানের মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এ তিনটি মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি **ISO (International Standard Organization)** এর বিধি-বিধান অনুযায়ী পরিচালিত। এ তিনটি ল্যাবরেটরির বিভিন্ন প্যারামিটারের পরীক্ষণ পদ্ধতিসমূহ ISO/IEC 17025:2025 অনুযায়ী অ্যাক্রিডিটেশন প্রাপ্ত। মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরিসমূহে যে সকল প্যারামিটার পরীক্ষা করা হয় তার তালিকা নিম্নের সারণিতে উল্লেখ করা হলো-

অণুজীবতাত্ত্বিক পরীক্ষণ প্যারামিটারসমূহ	রাসায়নিক ও অন্যান্য পরীক্ষণ প্যারামিটারসমূহ
• Standard Plate Count • Total coliforms • Faecal coliforms/*E. coli* • *Salmonella* spp. • *Vibrio cholerae* • *Vibrio parahaemolyticus* • *Staphylococcus aureus* • *Listeria monocytogenes* • *Shigella spp.* • White Spot Syndrome Virus (WSSV) • Yellow Head Virus (YHV)	• এ্যান্টিবায়োটিকসমূহ - নাইট্রোফুরান মেটাবোলাইটস (AOZ, AMOZ, AHD, SEM) - ক্লোরামফেনিকল - মেট্রোনিডাজল - টেট্রাসাইক্লিন, অক্সি-টেট্রাসাইক্লিন, ক্লোরটেট্রাসাইক্লিন • রঞ্জক পদার্থসমূহ (ম্যালাকাইট গ্রিন ও লিউকোম্যালাকাইট গ্রিন এবং ক্রিস্টাল ভায়োলেট ও লিউকোক্রিস্টাল ভায়োলেট) • অ্যাঙ্গেলমেন্টিকস (ফ্লুবেনডাজল, মেবেনডাজল, ফেনবেনডাজল) • মিথাইলটেস্টোস্টেরন (MTS), ডাই ইথাইল স্টিলবেস্টেরল (DES) • টোটাল ভোলাটাইল বেসিক নাইট্রোজেন (Total Volatile Basic Nitrogen বা TVBN)ট্রাইমিথাইল এমাইন (Trimethyl Amine বা TMA) • কীটনাশকসমূহ (ডিডিটি, এলড্রিন, ডাই-এলড্রিন, এনড্রিন, হেপ্টাক্লোর) • হিস্টামিন • ভারী ধাতুসমূহ (As, Cd, Hg, Pb & Cr) • ফিল্থ (Filth) • ফরমালিন • আর্দ্রতা • ফসফেট লবণসমূহ • মৎস্য খাদ্যের প্রক্সিমেট কম্পোজিশন

উপরের সারণিতে উল্লিখিত প্যারামিটারসমূহের পরীক্ষণের নিমিত্তে মৎস্য মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরিসমূহে বিভিন্ন অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যেমন: LC-MS-MS (৬টি), GC-MS-(TOF) (২টি), UPLC (২টি), ELISA (৫টি), AAS (২টি), ICP-MS (২টি), PCR (৩টি), NIR (১টি), DUMAS Nitrogen (Protein) Analyzer (১টি) ইত্যাদি।
এ সকল মেশিন পরিচালনার মাধ্যমে বিভিন্ন প্যারামিটারের টেস্ট পরিচালনায় মৎস্য মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরিসমূহে নিয়োজিত অ্যানালিস্টদের দেশে-বিদেশে হাতে-কলমে নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এর পাশাপাশি প্রত্যেকটি ল্যাবরেটরি প্রতি বছর বিভিন্ন টেস্ট প্যারামিটারে আন্তর্জাতিক প্রফিসিয়েন্সি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হয়ে চলেছে। নিরন্তর মান উন্নয়নের লক্ষ্যে আন্তঃল্যাবরেটরি নিরীক্ষা কার্যক্রম চালু রয়েছে। ফলে পরীক্ষণ সক্ষমতার বিচারে মৎস্য অধিদপ্তরের তিনটি মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবেরেটরি বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর ল্যাবরেটরির সমকক্ষতা অর্জন করেছে।

নিরাপদ মৎস্য ও মৎস্যপণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে বাংলাদেশের সাফল্য:

মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের মাননিয়ন্ত্রণে সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০১১ সালে EU FVO Audit Mission-এর সুপারিশের ভিত্তিতে ইউরোপীয় ইউনিয়নে রপ্তানিকৃত ২০% কনসাইমেন্টের বাধ্যতামূলক পরীক্ষণের শর্ত প্রত্যাহার করা হয়েছে এবং ২০১৫ সালের অডিট প্রতিবেদনের আলোকে ইউরোপীয় ইউনিয়নে রপ্তানিকৃত মৎসপণ্যের কনসাইনমেন্টসমূহের সাথে রাসায়নিক প্যারামিটার পরীক্ষণের রিপোর্ট প্রেরণের বাধ্যবাধকতা তুলে নেয়া হয়েছে। নিরাপদ মৎস্য ও মৎস্যপণ্য উৎপাদন, সরবরাহ ও বাজারজাতকরণ নিশ্চিতকরণে মৎস্য অধিদপ্তর নিরন্তর কাজ করে চলেছে। এর স্বীকৃতিস্বরূপ ২০১৫ সালে পরিচালিত অডিট প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে-

- The system in place for residues controls in aquaculture offers guarantees equivalent to EU requirements.
- The residue monitoring plan satisfies the minimum requirements laid down in EU legislation and both it and PET program are effectively implemented as evidenced by a significant decrease in the no. of N/C samples relative to previous years.
- Significant improvements have also been noted in the performance of the laboratory network, accreditation of laboratories and validation of analytical methods and the competent authority can in general, have confidence in the reliability of analytical results.

উপসংহার:

মাছ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের পর আমাদের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ সর্বসাধারণের জন্য নিরাপদ মৎস্য ও মৎস্যপণ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা। মৎস্য অধিদপ্তরের একার পক্ষে এটা প্রায় দুরূহ। এজন্য প্রয়োজন নিরাপদ খাদ্য সরবরাহের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠান ও অংশীজনের সমন্বিত উদ্যোগ। মৎস্য অধিদপ্তর সে লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। মৎস্য অধিদপ্তরের উদ্যোগে সকল অংশীজনের সহায়তায় প্রতিটি নাগরিকের জন্য নিরাপদ মাছ সরবরাহ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে ইনশাআল্লাহ।

নিরাপদ প্রাণিজ আমিষ:
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কার্যক্রম এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা

ডা. মোঃ আইনুল হক

ভূমিকা:

জনবহুল বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তাবলয় তৈরি, সুষম পুষ্টি নিশ্চিতকরণ, বেকার সমস্যা সমাধান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, নারীর ক্ষমতায়ন, জিডিপিতে ক্রমবর্ধমান হারে অবদান রাখা, প্রাণিজাত পণ্য রপ্তানি বৃদ্ধির মাধ্যমে অধিক হারে দেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সহায়তা প্রদান, সর্বোপরি দেশের আর্থসামাজিক অবস্থার মানোন্নয়নে বর্তমানে প্রাণিসম্পদ একটি অপরিহার্য ও সম্ভাবনাময় খাত হিসেবে বিবেচিত। বিশেষ করে যেখানে দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৮০% গ্রামীণ এলাকায় বসবাস করে এবং যাদের প্রধান জীবিকা হলো কৃষি। এ সকল দরিদ্র মানুষের আয়ের উৎস, পুষ্টি সরবরাহ এবং আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে প্রাণিসম্পদ সেক্টরের গুরত্ব অপরিসীম। আর এ কারণে শ্রমঘন, তুলনামূলক স্বল্প বিনিয়োগ এবং স্বল্প ভূমিতে বাস্তবায়নযোগ্য বিধায় অনুকূল জাতীয় প্রেক্ষাপটে দেশে প্রাণিসম্পদ শিল্প দ্রুত বিকাশ লাভ করছে। ফলশ্রুতিতে বিগত কয়েক বছর ধরে জিডিপিতে প্রাণিসম্পদ উপ-খাতের প্রবৃদ্ধির হার লক্ষণীয় হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। তদপ্রেক্ষিতে দেশে শিল্পায়ন, নগরায়নের এ যুগেও জনগণ পশুপালন থেকে বিচ্যুত হয়নি, ফলশ্রুতিতে প্রতি বছর গবাদিপশু ও হাঁস মুরগির সংখ্যা বেড়েই চলছে।

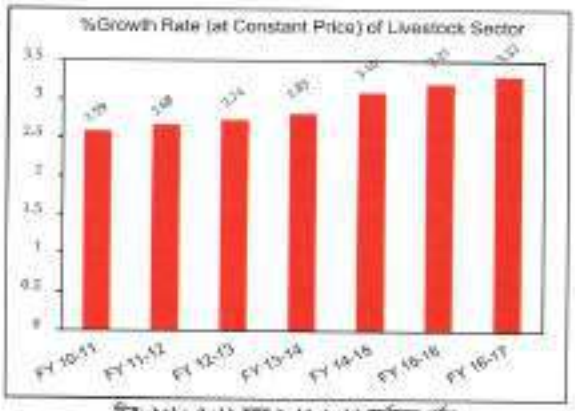

চিত্র: ২০১০-২০১১ হতে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছর পর্যন্ত জিডিপিতে প্রাণিসম্পদ উপ-খাতের প্রবৃদ্ধির হার।

টেবিল: প্রজাতিভেদে পশুপাখির বছরওয়ারী সংখ্যা

অর্থবছর	প্রজাতি (লক্ষ সংখ্যায়)					
	গরু	মহিষ	ছাগল	ভেড়া	মুরগি	হাঁস
২০১০-১১	২৩১.২১	১৩.৯৪	২৪১.৪৯	৩০.০২	২৩৪৬.৮৬	৪৪১.০২
২০১১-১২	২৩১.৯৫	১৪.৪৩	২৫১.১	৩০.৮	২৪২৮.৬০	৪৫৭.০০
২০১২-১৩	২৩৩.৪১	১৪.৫	২৫২.৭৭	৩১.৪৩	২৪৯০.১১	৪৭২.৫৪
২০১৩-১৪	২৩৪.৮৮	১৪.৫৭	২৫৪.৩৯	৩২.০৬	২৫৫৩.১১	৪৮৮.৬১
২০১৪-১৫	২৩৬.৩৬	১৬.৬৪	২৫৬.০২	৩২.৭০	২৬১৭.৭০	৫০৫.২২
২০১৫-১৬	২৩৭.৮৫	১৪.৭১	২৫৭.৬৬	৩৩.৩৫	২৬৮৩.৯৩	৫২২.৪০
২০১৬-১৭	২৩৯.৩৫	১৪.৭৮	২৫৯.৩১	৩৪.০১	২৭৫১.৮৩	৫৪০.১৬

সূত্র: Livestock Economy at a Glance, 2016-2017

Glance, 2016-2017

তবে প্রাণিসম্পদের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি এবং খাদ্যশস্য উৎপাদনে বাংলাদেশ অনেকদূর এগিয়ে গেলেও এখন পর্যন্ত আমাদের আপামর জনগণের পুষ্টি চাহিদা পুরণ হয়নি। এখনও এদেশের অর্ধেকেরও বেশি মানুষ পুষ্টিহীনতায় ভুগছে। আর এ সমস্যা শিশু ও নারীদের মধ্যে আরো প্রকট। এদেশের ৫ বছরের কমবয়সী শিশুর প্রায় দুই-তৃতীয়াংশই কোনো না কোনো মাত্রার অপুষ্টিতে ভুগছে। আর একথা সর্বজনস্বীকৃত যে, অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জন করতে হলে সবার আগে পুষ্টিহীনতা দূর করতে হবে। আর 'সবার জন্য পুষ্টি নিশ্চিত করার' ক্ষেত্রে প্রাণিসম্পদ যে একটি সম্ভাবনাময় খাত তা আজ সর্বজনস্বীকৃত। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ২০১৫-২০১৬ খ্রি: এর তথ্য মতে নিট প্রাণিজ আমিষের উৎপাদন প্রাণিসম্পদ খাত থেকে ৪৬.৫৭ লক্ষ মেট্রিক টন। আর তাই বর্তমান সরকার সম্ভাবনাময় প্রাণিসম্পদ খাতকে সর্বাধিক অগ্রাধিকার দিয়ে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করে যাচ্ছে। কারণ, এ বিষয়টি সহজেই অনুমেয় যে, প্রাণিসম্পদের উৎপাদনশীলতা (নিরাপদ দুধ, মাংস ও ডিম) বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় আমিষের চাহিদা পূরণপূর্বক মেধাবী, স্বাস্থ্যবান ও বুদ্ধিদীপ্ত জাতি গঠন নিশ্চিত করা সম্ভব।

ডা. মোঃ আইনুল হক
মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের দুধ, মাংস ও ডিম উৎপাদনে সফলতা:

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের রূপকল্প বা ভিশন (Vision) হচ্ছে দেশে দুধ, ডিম, ও মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় আমিষের চাহিদা পূরণপূর্বক মেধাবী স্বাস্থ্যবান ও বুদ্ধিদীপ্ত জাতি গঠন করা। প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর দেশের গবাদিপশু ও হাঁসমুরগি উৎপাদন, দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিসহ গবাদিপশু-পাখির পুষ্টি উন্নয়ন, রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ ও উন্নত জাত বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছর থেকে অদ্যাবধি তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে অপরিহার্যতার আলোকে প্রাণিজ আমিষের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং চাহিদানুযায়ী উৎপাদন ঘাটতি হ্রাস পেয়েছে উল্লেখযোগ্য হারে। এই দুধ, মাংস ও ডিমের উৎপাদন বৃদ্ধির মূল কারণ হলো কিছু প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, নীতিমালা সংশোধন, এ খাতের সহিত সংশ্লিষ্ট সেবা প্রতিষ্ঠানসমূহের নিরলস পরিশ্রম এবং খামারি সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে প্রতিটি প্রাণির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি।

টেবিল: দুধ, মাংস ও ডিমের উৎপাদন এবং চাহিদা অনুযায়ী ঘাটতি

	প্রাণিজ আমিষ উৎপাদন			চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদন (ঘাটতি)		
অর্থবছর	মাংস (মিলিয়ন মে. টন)	দুধ (মিলিয়ন মে. টন)	ডিম (বিলিয়নটি)	মাংস (মিলিয়ন মে. টন)	দুধ (মিলিয়ন মে. টন)	ডিম (কোটিটি)
২০১৩-১৪	৪.৫২	৬.০৯	১০.১৪	২.২১	৭.৯৩	৫৮০.৬৪
২০১৪-১৫	৫.৮৬	৬.৯৭	১১.০০	১.০৯	৭.৫১	৫৫০.৯৬
২০১৫-১৬	৬.১৫	৭.২৮	১১.৯১	০.০৯	৭.৮২	৪৮৩.১৬
২০১৬-১৭	৭.১৫	৯.২৮	১৪.৯৩	০.০১৯	৫.৫৮	২০০.৮৫

(অতিরিক্ত উৎপাদন)

গত ১০ বছরে দুধ, মাংস ও ডিমের উৎপাদন বৃদ্ধি হয়েছে যথাক্রমে ৩.২০ গুণ, ৫.৪৪ গুণ এবং ২.১৯ গুণ এবং জনপ্রতি প্রাপ্যতা বেড়ে দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ১২৫.৫৯ মিলি/দিন, ১০৬.২১ গ্রাম/দিন ও ৭৫.০৬টি/বছর। মাংস উৎপাদনে আমরা ইতোমধ্যে লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে যেতে সক্ষম হয়েছি। ডিম আর দুধ উৎপাদনে আমরা অচিরেই লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করতে পারবো। তথাপি ক্রমবর্ধমান লোকসংখ্যার চাহিদার আলোকে প্রাণিজ আমিষ উৎপাদন আরো বৃদ্ধি করতে হবে। তাই বিগত কয়েকটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ছাড়াও স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার আওতাধীন সাম্প্রতিক সময়ে প্রণীত পরিকল্পনা 'ভিশন ২০২১ ও ভিশন ২০৪১' ঘোষণায় অন্যান্য খাতের ন্যায় প্রাণিসম্পদের উৎপাদন ২ গুণ বৃদ্ধির তাগিদ দেয়া হয়েছে। কারণ, প্রণীত পরিকল্পনা দুটি'র মূল লক্ষ্য হচ্ছে বাংলাদেশকে ২০২১ সালে মধ্যম আয়ের ও ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার প্রত্যাশা।

নিরাপদ প্রাণিজ আমিষ উৎপাদনে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ভূমিকা:

নিরাপদ প্রাণিজ আমিষ বলতে বুঝায় সেই আমিষকে যা মানুষের খাবার উপযোগী, যা যেকোনো প্রকার জীবাণু মুক্ত, যেখানে মানবদেহের জন্য ক্ষতিকারক কোনো উপাদান নেই, যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে নির্দিষ্ট স্থানে, নিয়মানুযায়ী প্রস্তুত করা হয়। বর্তমানে জনগণের চাহিদা মোতাবেক জনস্বাস্থ্য ও নিরাপদ প্রাণিজ আমিষ উৎপাদন পরস্পরের পরিপূরক। কারণ, নিরাপদ প্রাণিজ আমিষ গ্রহণ না করলে তা জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ঝুঁকির কারণ হতে পারে। আর তাই আজ বাংলাদেশসহ বিশ্বব্যাপী স্বাস্থ্যসম্মত প্রাণিজ আমিষসহ অন্যান্য খাদ্য উৎপাদনের কলাকৌশল অনুশীলনের মাধ্যমে অধিকতর নিরাপদ প্রাণিজ আমিষ বা অন্যান্য খাদ্য উৎপাদনের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য রক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কাজ করে যাচ্ছে। পশুখাদ্যে ভেজাল রোধের জন্য ইতোমধ্যে মৎস্য ও পশুখাদ্য আইন এবং পশুখাদ্য বিধিমালা অনুমোদিত হয়েছে। দেশের নাগরিকের জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সহিত গত ২৩/১০/১৭ইং তারিখে সমঝোতা স্মারক চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। এ চুক্তির মাধ্যমে নিরাপদ প্রাণিজ আমিষ নিশ্চিতকরণের জন্য কারিগরি সহায়তার পাশাপাশি মাঠপর্যায়ে নিবিড় পর্যবেক্ষণে উভয় প্রতিষ্ঠানটি একযোগে কাজ করে যাচ্ছে।

চিত্র: প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সহিত সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

নিরাপদ প্রাণিজ আমিষ নিশ্চিতকরণের আওতায় প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর স্থানীয় প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সহায়তায় অপরাধ দমন অভিযান পরিচালনা করছে। উক্ত অভিযানে পশুখাদ্য জব্দ, জরিমানা আদায় ও ভেজাল পশুখাদ্য বিনষ্ট করা হয়েছে। একই সময়ে পশুখাদ্যে ভেজাল প্রদানের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। পশুখাদ্যে ফরমালিনসহ বিভিন্ন নিষিদ্ধ রাসায়নিক পদার্থ ও ভেজাল মিশ্রণের কুফল সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সভা/সেমিনার, স্থানীয়/জাতীয় দৈনিকে বিজ্ঞপ্তি প্রচার, রেডিও/টেলিভিশনে

চিত্র: স্থানীয় প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর উপস্থিতিতে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক জব্দকৃত ভেজাল পশুখাদ্য ধ্বংস করা।

বিজ্ঞাপন প্রচার, মাইকিং, বিলবোর্ড স্থাপন, লিফলেট বিতরণ ও স্টেকহোল্ডারদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও FAO ফুড সেফটি কার্যক্রমের যৌথ উদ্যোগে একটি পোল্ট্রি ফুড সেফটি কার্যক্রম পাইলট হিসেবে সারাদেশের ৭টি বিভাগের ১৩টি জেলার ২৫টি উপজেলায় বাস্তবায়ন করা হয় এবং ১০০০ ব্রয়লার খামারিকে এ কার্যক্রমের আওতায় আনা হয়। খামারিদের ব্রয়লার পালনে ভাল ব্যবস্থাপনা মেনে চলার মাধ্যমে কীভাবে নিরাপদ ব্রয়লার মাংস উৎপাদন করা যায় তার ওপর সম্যক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। উক্ত পাইলট প্রকল্পের প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে অধিদপ্তর "বাংলাদেশে নিরাপদ পোল্ট্রি ভ্যালু চেইন উন্নয়ন নির্দেশিকা"-এর খসড়া প্রণয়ন করেছে। এ নির্দেশিকা অনুযায়ী পোল্ট্রি সরবরাহ চেইনের সাথে সংশ্লিষ্ট মূল ব্যক্তিবর্গ এবং সরকারের সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রক বিভাগ ও সংস্থার খাদ্য নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সক্ষমতা উন্নয়নের মাধ্যমে নিরাপদ প্রাণিজ আমিষের (ডিম ও মাংস) সরবরাহ নিশ্চিতকরণ সম্ভব হবে।

এ প্রকল্পের আওতায় সারাদেশে ১০টি নিরাপদ ব্রয়লার বিক্রয় কেন্দ্র চালু করা হয়েছে এবং ঐ সকল বিক্রয় কেন্দ্রে উত্তম জবাই কার্যক্রম নিশ্চিত করতে মাংস প্রস্তুত সামগ্রী (ড্রেসিং মেশিন, বিডিং কোন এবং ড্রেসিং টেবিল) সরবরাহ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ভোক্তাদের উল্লেখযোগ্য মাত্রায় আকর্ষণ করা সম্ভব হয়েছে এবং ক্রমাগত অধিক সংখ্যক বিক্রয়কেন্দ্র চালু হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য লক্ষাধিক আইইসি সামগ্রী (লিফলেট, পোস্টার, ক্যালেন্ডার ইত্যাদি) ১৩ জেলার সকল উপজেলায় সরবরাহ করা হয়েছে।

চিত্র: প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও FAO ফুড সেফটি কার্যক্রমের আওতায় আইইসি সামগ্রী।

চিত্র: যশোর বেজপাড়ায় নিরাপদ ব্রয়লার বিক্রয়কেন্দ্র উদ্বোধন

চিত্র: উত্তম বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় মুরগি খামারে উৎপাদিত বর্জ্যকে জৈব সারে রূপান্তর এবং মৃত মুরগি সৎকারের জন্য পিট স্থাপন করা হয়েছে।

নিরাপদ প্রাণিজ আমিষ উৎপাদন এবং দেশব্যাপী প্রচারণার অংশ হিসেবে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর গত ২৩-২৭ শে ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ খ্রিঃ প্রথমবারের মতো দেশব্যাপী প্রাণিসেবা সপ্তাহ পালন করে, যার প্রতিপাদ্য ছিল 'নিরাপদ প্রাণিজ আমিষের প্রতিশ্রুতি সুস্থ সবল মেধাবী জাতি'। এই সেবা সপ্তাহে কেন্দ্রীয়, বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে র‍্যালি, খামারিদের মধ্যে প্রাণিসম্পদ সংশ্লিষ্টসেবা প্রদান, স্কুল পর্যায়ে ডিম ও দুধ খাওয়ানো, প্রজেক্টী প্রদর্শনী, প্রাণিসম্পদ বিষয়ক মেলা, সেমিনার এবং আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল। এর মাধ্যমে খামারি পর্যায়ে ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টির ফলে নিরাপদ প্রাণিজ আমিষ উৎপাদনে আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে।

চিত্রঃ প্রাণিসেবা সপ্তাহ ২০১৭ এর কিছু খন্ড চিত্র

এরই ধারাবাহিকতায় প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর আগামী ২০-২৫ শে জানুয়ারি, ২০১৮ দ্বিতীয়বারের মতো দেশব্যাপী প্রাণিসেবা সপ্তাহ, ২০১৮ পালন করতে যাচ্ছে। এ সেবা সপ্তাহের উদ্বোধন করার জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ আব্দুল হামিদ সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন।

উপসংহারঃ

প্রাণিসম্পদ সেবার মান উচ্চতর মাত্রা এবং যুগপোযোগী করার অঙ্গীকার, সেবা গ্রহীতাগণের সাথে আরো নিবিড় সমন্বয় সাধন, প্রাণিসম্পদ খাতের ক্রমবর্ধমান প্রবৃদ্ধির অগ্রযাত্রাকে সমুন্নত রাখা, পুষ্টি নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার মাধ্যমে সরকারের লক্ষ্য অর্জনে এ খাত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। নিরাপদ প্রাণী ও প্রাণিজাত খাদ্য উৎপাদনের অঙ্গীকার এবং রেগুলেটরি সার্ভিসে রূপান্তরের প্রত্যয় এ খাতের রয়েছে। ক্রমবর্ধমান ডিম, দুধ ও মাংস উৎপাদন বাজার চাহিদার সাথে বহুলাংশে সামঞ্জস্যপূর্ণ। রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ, রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা, ডিজিজ সার্ভিল্যান্স, ট্রান্সবাউন্ডারি প্রাণিরোগ দমন কার্যক্রম জোরদার করার জন্যে অধিদপ্তর কাজ করে যাচ্ছে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ডিজিটালাইজেশন প্রক্রিয়ায় অংশ হিসেবে ই-প্রাণিসম্পদ সেবা, আইসিটি উন্নয়ন, উদ্ভাবনী কার্যক্রম, প্রাণিসম্পদ সহায়ক মোবাইল অ্যাপ, ২৪ ঘন্টা সেবা সংক্রান্ত এসএমএস সার্ভিস এবং সফটওয়্যারভিত্তিক রিপোর্টিং চালুর মাধ্যমে অগ্রসরমান। এখন আমরা প্রস্তুত ভেটেরিনারি পাবলিক হেলথ, এপিডেমিওলজি, পোল্ট্রি ভেল্যু চেইনে ফুড সেফটি কার্যক্রম এবং প্রডাক্ট ভাইভারসিফিকেশনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্যে। প্রাণিবর্জ্য, জবাই উপজাত, ওষুধ উৎপাদন ও ব্যবহার, পরস্পর সংক্রমণযোগ্য (জুনোটিক) রোগ দমন, আবির্ভূত ও পুনরাবির্ভূত রোগ নিয়ন্ত্রণ বর্তমানে প্রাণিসম্পদ খাতের অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ। মানুষের পুষ্টি নিরাপত্তা এবং নিরাপদ প্রাণি ও প্রাণিজাত খাদ্য উৎপাদন জনস্বাস্থ্য রক্ষায় অপরিহার্য হিসেবে প্রতিভাত হয়েছে। এর জন্যে সার্ভিস রেগুলেশন জোরদারকরণ এবং প্রাণিকল্যাণ নীতিমালা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে আন্তঃবিভাগ সমন্বিত কার্যক্রমের উদ্যোগ নেয়া জরুরি। একইসাথে প্রয়োজন সরকারের অন্যান্য সংস্থার গ্রামীণ বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে তাঁদের সেবাখাত সম্প্রসারণ করা এবং প্রাণিসম্পদ শিল্প গ্রুপ পর্যায়ে আরো জনপ্রিয় করে তোলা।

বাংলাদেশে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ভূমিকা

মোঃ আব্দুল আজিজ

বেঁচে থাকার জন্য আমাদের খাদ্য দরকার। কিন্তু সেই খাদ্য যদি নিরাপদ খাদ্য না হয় তবে তা খেয়ে বেঁচে থাকার বদলে মৃত্যু ঘটতে পারে। এদেশে এমন একটা সময় ছিল যখন শুধু পেট ভরার জন্য আমরা খাদ্য খেতাম। এখন সে অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। এখন আর শুধু পেট ভরা বা বেঁচে থাকার জন্য নয়, সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য আমাদের এখন পুষ্টিকর ও নিরাপদ খাদ্যের ওপর জোর দিতে হচ্ছে। নিরাপদ খাদ্য হলো সেসব খাদ্য যা আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য কোনো ক্ষতির কারণ হবে না। সবার জন্য সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত ও মানসম্মত পণ্য উৎপাদন করে রপ্তানি আয় বৃদ্ধির জন্য নিরাপদ খাদ্য সহজলভ্য করা দরকার।

বর্তমান পরিস্থিতি ও কারণ

দেশে বর্তমানে প্রায় ৩ কোটি ৮৬ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য উৎপাদিত হচ্ছে। দেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। তথাপি, এ দেশে আমরা যেসব খাদ্য খাই তার অধিকাংশ খাদ্যই নিরাপদ নয়। ভেজাল, আর্সেনিক দূষণ, পরিবেশ দূষণ, বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য দ্বারা দূষণ, খাদ্য তৈরির সময় দূষণ, পচন ইত্যাদি নানাভাবে খাদ্য অনিরাপদ হচ্ছে। দেশের প্রভূত অর্থনৈতিক উন্নয়ন হলেও বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির মতে দেশের এখনো সিকিভাগ লোক নিরাপদ খাবার খেতে পারছে না। ফলে খাদ্যবাহিত নানা রোগে মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে। দেশের প্রায় ৬০ শতাংশ লোক এখন অপুষ্টি ও খাদ্যজনিত বিভিন্ন রোগের শিকার। এদেশে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৫০০ জন শুধু ডায়রিয়া আক্রান্ত রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়। খাদ্য দূষণ বা অনিরাপদ খাদ্য গ্রহণই এর মূল কারণ। পেটের বিভিন্ন অসুখের পাশাপাশি ক্যান্সারের মতো ভয়াবহ দুরারোগ্য রোগও অনিরাপদ খাদ্য গ্রহণের ফলে হচ্ছে। উৎপাদন পর্যায়ে খামারে ক্ষতিকর বিষাক্ত বালাইনাশকের এলোপাতাড়ি ব্যবহার, অধিক রাসায়নিক সার ব্যবহার, ফসলে বিভিন্ন রোগ ও পোকার আক্রমণ, সেচের পানি দূষণ ইত্যাদি কারণে এবং ফসল তোলার পর যথাযথ প্রক্রিয়াজাতকরণ ব্যবস্থার অভাবে অনেক খাদ্য নষ্ট হচ্ছে ও সেসব দূষিত খাদ্য গ্রহণ স্বাস্থ্যঝুঁকির কারণ হচ্ছে। অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের কারণে বাংলাদেশী পণ্য রপ্তানির ওপর মারাত্মক বিরূপ প্রভাব পড়ছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, স্বাস্থ্যসম্মত মান বজায় না রাখার কারণে ১৯৯৭ সালে ইউরোপিয় ইউনিয়ন বাংলাদেশ থেকে চিংড়ি আমদানি বন্ধ করে দেয়।

বাংলাদেশে ফল পাকানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্যাদি ব্যবহার করা হয়। আম, কলা, কাঁঠাল, লিচু এবং অন্যান্য ফল পাকানোর জন্য ক্যালসিয়াম কার্বাইড ব্যবহার করা হয়। ক্যালসিয়াম কার্বাইড জলীয় বাষ্পের সংস্পর্শে এসিটিলিন তৈরি করে। এসিটিলিন একটি অতি বিক্রিয়াশীল দাহ্য পদার্থ যাহা সাধারণত ওয়েলডিং কারখানায় ব্যবহার করা হয়। ক্যালসিয়াম কার্বাইডে অতিসামান্য পরিমাণ বিষাক্ত আর্সেনিক এবং ফসফরাস থাকে যা ফলকে বিষাক্ত করে ফেলে। কার্বাইড দ্বারা পাকানো ফল স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর বিশেষ করে স্নায়ুতন্ত্রের জন্য। বেশি দিন কার্বাইড দ্বারা পাকানো ফল খেলে স্মরণশক্তি লোপ পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কার্বাইড দ্বারা পাকানো ফল খাওয়ার সাথে সাথে পেট ব্যথা, বমি এবং ডায়রিয়া হতে পারে। এছাড়া গা জ্বালাপোড়া, এলার্জি, জন্ডিস ইত্যাদি হতে পারে। তেমনি টমেটো পাকানোর জন্য অনিরাপদ মাত্রায় কখনো কখনো ইথিলিন, ইথোফোন, ইথাফোন ইত্যাদি রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করা হচ্ছে।

অনিষ্টকারী পোকা এবং রোগের হাত থেকে ফসল রক্ষার জন্য রাসায়নিক বালাইনাশক ব্যবহার করা হয়। কিন্তু প্রায়শই বাংলাদেশের কৃষকগণ অনুমোদিত মাত্রার চেয়ে বেশি পরিমাণ বালাইনাশক ব্যবহার করে থাকেন। ফলে অতিরিক্ত বালাইনাশক পানির সাথে মিশে এবং ফসলের মধ্যেও এর অবশিষ্টাংশ থেকে যায়, যা পানি এবং অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যকে অনিরাপদ করে তোলে।

নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনে ডিএই'র ভূমিকা/কার্যক্রম

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকারের নীতি অনুসরণ করে দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার পর এখন পুষ্টিকর ও নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনের ওপর জোর দিয়েছে। পাশাপাশি রপ্তানিমুখী উচ্চমূল্যের মানসম্মত ফসল চাষের দিকেও গুরুত্ব দিয়েছে। ডিএই-তে বর্তমানে চলমান প্রকল্পসমূহের মধ্যে ৬টি প্রকল্প এ বিষয়ে প্রত্যক্ষভাবে কাজ করে যাচ্ছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) আইপিএম কৌশলের মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদন প্রকল্প, সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা অঙ্গ (IFMC), জাতীয় কৃষি প্রযুক্তি প্রকল্প (NATP), উত্তম কৃষি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদন কর্মসূচি (SCPGAP), বাংলাদেশে ফাইটোস্যানিটারি সামর্থ্য শক্তিশালীকরণ প্রকল্প, সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা প্রকল্পসহ বিভিন্ন কার্যক্রমের

মোঃ আব্দুল আজিজ
মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা

আওতায় নিরাপদ ফসল উৎপাদন কৌশলের ওপর ডিএই'র বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কৃষকদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদন করে যাচ্ছে। নিরাপদ ফসল তথা খাদ্য উৎপাদনের জন্য বর্তমানে জৈব পদ্ধতিতে ফসল উৎপাদন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। উদ্দেশ্যে বছরে অত্র বিভাগের মাধ্যমে কম্পোস্ট, ভার্মিকম্পোস্ট, খামারজাত সার, সবুজ সার ইত্যাদি উৎপাদন করে তা ফসলের জমিতে ব্যবহার করা হচ্ছে। দেশে এখন প্রচুর জৈব সার উৎপাদিত হচ্ছে। জৈব সারকে বাজারে সহজলভ্য ও কৃষকরা যাতে সহজে ব্যবহার করতে পারে সে বিষয়ে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। জৈব বালাইনাশক ব্যবহারে কৃষকদের উৎসাহিত করা হচ্ছে। বিষাক্ত বালাইনাশকমুক্ত ফল, সবজি ও অন্যান্য ফসল উৎপাদনে বর্তমানে সেঙ ফেরোমোন ফাঁদ ব্যবহার, আলোক ফাঁদ ব্যবহার, পার্চিং, উপকারী পোকার ব্যবহার ইত্যাদি কার্যক্রম মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

এ দেশে নিরাপদ ফসল উৎপাদনের লক্ষ্যে ২০০২ সালে আইপিএম নীতিমালা প্রণয়ন হয়েছে। এ নীতির আলোকে বর্তমানে পরিবেশবান্ধব জৈব বালাইনাশক ও সেঙ ফেরোমন এবং এমনকি বায়ো এজেন্ট বাজারজাতকরণ শুরু হয়েছে। সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা বিষয়ে উৎপাদনকারী ও ভোক্তা উভয়েরই সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। পোকাখেকো পাখির জন্য জমিতে ডালপালা পুঁতা, আলোক ফাঁদের ব্যবহার, ফলে ব্যাগিং করা (আম, পেয়ারা, কলা), সেঙ ফেরোমন ফাঁদের (আম, পেয়ারা, কুমড়া জাতীয় সবজি) প্রচলন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকারি-বেসরকারি ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাগুলোও আইপিএম বিষয়ে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করতে শুরু করেছে। "বিষমুক্ত সবজি-ফল" বাজারজাতকরণে বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কাজ করছে। ২০১৫-১৬ বছরে কুমড়া জাতীয় সবজির মাছি পোকা দমনে সেঙ ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় ৭,৮৮৫ জন কৃষকের মাঝে ১৯৬.৪৪৬৮৩ লক্ষ টাকার উপকরণ বিতরণ করা হয়।

দীর্ঘদিন ধরে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর নিরাপদ ফসল তথা খাদ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে ফসলে বালাইনাশকের ব্যবহার নিরুৎসাহিত করা বা কমানোর জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে আসছে। বিশেষ করে এ দেশে বিমান থেকে কীটনাশক ছিটানো বন্ধ করা হয়, কৃষি ক্ষেত্রে অতিমাত্রায় বিষাক্ত বালাইনাশক (শ্রেণি-I A) নিষিদ্ধ হয়। এসব কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে দেশে বালাইনাশকের ব্যবহার প্রায় ৩০ শতাংশ কমেছে। ফলে দেশে উত্তরোত্তর নিরাপদ খাদ্যের যোগান বাড়ছে।

নিরাপদ ও মানসম্মত কৃষিপণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে উত্তম কৃষি ব্যবস্থাপনা (জিএপি) অনুসরণ করে ফসল উৎপাদনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে দেশ থেকে এ পদ্ধতিতে আম উৎপাদন করে ইউরোপের বাজারে তা রপ্তানি করা সম্ভব হয়েছে। পান, লেবু ও কিছু শাকসবজি উৎপাদনে বর্তমানে জিএপি অনুসরণ করা হচ্ছে। BARC-FAO'র সহযোগিতায় নিরাপদ ফসল উৎপাদন ও সার্টিফিকেশনের জন্য 'Bangladesh GAP' প্রণয়ন করেছে; যেখানে ডিএই'র সরেজমিন উইংকে সার্টিফিকেশনের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। SCPGAP কর্মসূচির আওতায় 'Bangladesh GAP'-এর ওপর ডিএই'র মাঠপর্যায়ের ২১০ জন উপজেলা কৃষি অফিসার/অতিরিক্ত কৃষি অফিসার/ কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার, ৮৭০ জন উপসহকারী কৃষি অফিসার ও ৮২৫০ জন কৃষককে সরাসরি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। 'Bangladesh GAP'-এর পরিপূর্ণ বাস্তবায়নের জন্য (সার্টিফিকেশনসহ) 'Bangladesh GAP' অনুসরণের মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদন' শীর্ষক কর্মসূচির প্রস্তাব করা হয়েছে যা অর্থ মন্ত্রণালয়ে অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে।

নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনে করণীয়/সুপারিশ

- খাদ্যজনিত রোগ থেকে সুরক্ষা এবং খাদ্যের মান উন্নয়নের জন্য এ সংক্রান্ত শিক্ষা বিস্তার ও জনসচেতনতা সৃষ্টি জোরদার করা প্রয়োজন। এ জন্য ফসল উৎপাদনকারী কৃষকগণ থেকে শুরু করে ছোট থেকে মাঝারি খাদ্য ব্যবসায়ী ও ভোক্তাদের খাদ্যের নিরাপদতা, গুণাগুণ ও পুষ্টি বিষয়ে শিক্ষাদান করতে হবে। এর ফলে খাদ্য নিরাপদতা এবং স্বাস্থ্যকর বিষয় এবং কিভাবে খাদ্যজনিত রোগব্যাধি থেকে নিজেকে দূরে রাখা যাবে সে বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি হবে।
- ভোক্তাদের অধিকার নিশ্চিত করতে ভোক্তা অধিকার আইনের বাস্তবায়নসহ প্রয়োজনীয় সকল ধরনের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করতে হবে।
- খাদ্য ব্যবসায়ীদের জন্য প্রশিক্ষণ এবং কারিগরি সেবা প্রদান কার্যক্রম জোরদার করতে হবে। তাদের নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতার ব্যবস্থা করতে হবে।
- ক্ষুদ্র থেকে মাঝারি উদ্যোক্তাদের উত্তম উৎপাদন ব্যবস্থা (Good Manufacturing Practices), উত্তম স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থা (Good Hygienic Practices) এবং দূষণ পরম মাত্রা নির্ণয় (Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) পদ্ধতি প্রবর্তনের দিকনির্দেশনা দেয়ার জন্য প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং কারিগরি ইউনিট অন্তর্ভুক্ত থাকা প্রয়োজন।
- নিরাপদ খাদ্য বিষয়টি একটি জটিল ও চ্যালেঞ্জিং ইস্যু। এটা শুধু উৎপাদনের ক্ষেত্রে নিরাপদতার বিষয় নয়, বরং খাদ্যদ্রব্য মাঠ থেকে খাওয়ার টেবিলে যাওয়া পর্যন্ত খাদ্য শৃঙ্খলের পুরোটা জুড়েই নিরাপদতার বিষয় জড়িত। এর মধ্যে খাদ্যপণ্য উৎপাদন, উৎপাদন পরবর্তী কার্যক্রম, বিতরণ, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, পরিবহন, বিপণন ও ভক্ষণ অন্তর্ভুক্ত। সরবরাহ শৃঙ্খল যত লম্বা হবে নিরাপদতার ঝুঁকিও ততটা বৃদ্ধি পাবে। খাদ্য নিরাপদতাকে সুরক্ষিত করতে হলে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদেরকে একত্রে প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
- 'Bangladesh GAP'-এর দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে।
- বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্যের উন্নয়ন ঘটানোর জন্য ২০১৩ সালে প্রণীত নিরাপদ খাদ্য আইন দ্রুত বাস্তবায়ন প্রয়োজন।

নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তি ভোক্তার অধিকার

মোঃ শফিকুল ইসলাম লস্কর

খাদ্য মানুষের প্রধান মৌলিক চাহিদা। বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য অপরিহার্য। তবে অনিরাপদ খাদ্য স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। মানুষ খাদ্যের জন্য সাধারণত উদ্ভিদ এবং প্রাণীর উপর নির্ভরশীল। বিভিন্ন উপকরণ ব্যবহার করে উদ্ভিদজাত ও প্রাণীজ খাদ্য উৎপাদন করা হয়। উৎপাদন কালে নানা প্রকার রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহারের ফলে খাদ্য ক্ষতিকর দ্রব্য ব্যবহারের ফলে সেগুলো অনিরাপদ হয়ে পড়ে। এসব খাবার খেয়ে মানুষ নানা প্রকার রোগে ভোগে। কোনো কোনো খাদ্য এতটাই ক্ষতিকর হয়ে পড়ে যে সেগুলো খেয়ে মানুষ মৃত্যুবরণও করতে পারে। তাই মানুষের জন্য নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করা অতীব জরুরী। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই প্রথম বারের মতো জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস পালিত হচ্ছে।

নিরাপদ পণ্য বা সেবা পাওয়ার অধিকার ভোক্তার অধিকার হিসেবে জাতিসংঘ কর্তৃক স্বীকৃত হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫ অনুচ্ছেদ এ নাগরিকদের ৫টি মৌলিক প্রয়োজনের মধ্যে খাদ্যকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া ভোক্তা অধিকার বিরোধী কার্য প্রতিরোধকল্পে ৬ এপ্রিল ২০০৯ তারিখে প্রণীত ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ একটি উল্লেখযোগ্য সুসংহত আইন, যেখানে নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তির মাধ্যমে ভোক্তার অধিকার সংরক্ষণের বিধান রয়েছে। এ সম্পর্কে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯-এ নিম্নোক্ত বিধান রয়েছে:

ক) ধারা ৩৭: কোন ব্যক্তি কোন আইন বা বিধি দ্বারা কোন পণ্য মোড়কাবদ্ধভাবে বিক্রয় করিবার এবং মোড়কের গায়ে সংশ্লিষ্ট পণ্যের ওজন, পরিমাণ, উপাদান, ব্যবহার-বিধি, সর্বোচ্চ খুচরা বিক্রয় মূল্য, উৎপাদনের তারিখ, প্যাকেটজাতকরণের তারিখ এবং মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করিবার বাধ্যবাধকতা লঙ্ঘন করিয়া থাকিলে তিনি অনূর্ধ্ব ১ (এক) বৎসর কারাদণ্ড, বা অনধিক ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

খ) ধারা ৪১: কোনো ব্যক্তি জ্ঞাতসারে ভেজাল মিশ্রিত পণ্য বা ওষুধ বিক্রয় করিলে বা করিতে প্রস্তাব করিলে তিনি অনূর্ধ্ব ৩ (তিন) বৎসর কারাদণ্ড, বা অনধিক ২,০০,০০০ (দুই লক্ষ) টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

গ) ধারা ৪২: মানুষের জীবন বা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক কোন দ্রব্য, কোন খাদ্য পণ্যের সহিত যাহার মিশ্রণ কোন আইন বা বিধির অধীনে নিষিদ্ধ করা হইয়াছে, কোন ব্যক্তি উক্তরূপ দ্রব্য কোন খাদ্য পণ্যের সহিত মিশ্রিত করিলে তিনি অনূর্ধ্ব ৩ (তিন) বৎসর কারাদণ্ড বা অনধিক ২,০০,০০০ (দুই লক্ষ) টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

ঘ) ধারা ৪৩: কোন ব্যক্তি মানুষের জীবন বা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হয় এমন কোন প্রক্রিয়ায়, যাহা কোন আইন বা বিধির অধীনে নিষিদ্ধ করা হইয়াছে, কোন পণ্য উৎপাদন বা প্রক্রিয়াকরণ করিলে তিনি অনূর্ধ্ব ২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ড, বা অনধিক ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

ঙ) ধারা ৫০: কোন ব্যক্তি কোন পণ্যের নকল প্রস্তুত বা উৎপাদন করিলে তিনি অনূর্ধ্ব ৩ (তিন) বৎসর কারাদণ্ড, বা অনধিক ২,০০,০০০ (দুই লক্ষ) টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

চ) ধারা ৫১: কোন ব্যক্তি মেয়াদ উত্তীর্ণ কোন পণ্য বা ওষুধ বিক্রয় করিলে বা করিতে প্রস্তাব করিলে তিনি অনূর্ধ্ব ১ (এক) বৎসর কারাদণ্ড, বা অনধিক ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

এছাড়াও ধারা ৫৫ মোতাবেক উল্লিখিত কোন অপরাধের জন্য দণ্ডিত ব্যক্তি যদি পুনরায় একই অপরাধ করেন তবে তিনি উক্ত অপরাধের জন্য সর্বোচ্চ দণ্ডের দ্বিগুন দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ, ভোক্তা অধিকার বিরোধী কার্য প্রতিরোধ ও প্রতিকারের লক্ষ্যে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর অধীনে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। ভোক্তারা আইন অনুসারে ৩ ধরনের অর্থাৎ ফৌজদারী, দেওয়ানী ও প্রশাসনিক প্রতিকার পেতে পারেন। কোনো ভোক্তা বা অভিযোগকারি অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বা তাঁর ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট অথবা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা তাঁর ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট কারণ উদ্ভব হওয়ার ত্রিশ দিনের মধ্যে লিখিত অভিযোগ দায়ের করতে পারবেন। তবে কোনো ভোক্তা প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট কিংবা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে সরাসরি মামলা দায়ের করতে পারবেন না। মহাপরিচালক বা তাঁর ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অথবা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা তাঁর ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সমীচীন মনে করলে ভোক্তার অভিযোগ প্রাপ্তির পর তদন্ত করে ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট কিংবা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে দাখিল করবেন। খাবার বা ওষুধে ভেজাল মিশ্রণ বা নকল প্রস্তুত, ইত্যাদি অপরাধের জন্য উচ্চতর শাস্তি বিধানকল্পে ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের পরিবর্তে বিশেষ ক্ষমতা আইন, ১৯৭৪ এর অধীন গঠিত বিশেষ ট্রাইব্যুনালে অধিদপ্তরের পক্ষ হতে মামলা দায়ের করা যাবে।

মোঃ শফিকুল ইসলাম লস্কর
মহাপরিচালক, জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর

ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর অধীনে কোন বিক্রেতার ভোক্তা- অধিকার বিরোধী কার্যের দ্বারা ভোক্তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকলে এবং উক্ত ক্ষতির পরিমাণ আর্থিক মূল্যে নিরূপণযোগ্য হলে নিরূপিত অর্থের অনূর্ধ্ব পাঁচগুণ পরিমাণ আর্থিক ক্ষতিপূরণ দাবী করে উপযুক্ত আদালতে দেওয়ানী মামলা দায়ের করতে পারবেন।

জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বা তাঁর ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিকট ভোক্তা প্রশাসনিক প্রতিকার পেতে পারেন। জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বা তাঁর ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ভোক্তা অধিকার বিরোধী কার্য প্রতিরোধকল্পে বা কার্যক্রম গ্রহণের ক্ষেত্রে অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা এই আইনে বর্ণিত অপরাধ সংঘটিত হলে প্রশাসনিক ব্যবস্থায় জরিমানা আরোপ, ব্যবসায় লাইসেন্স বাতিল, ব্যবসায়িক কার্যক্রম সাময়িক বা স্থায়ীভাবে স্থগিতকরণের আদেশ দিতে পারেন। ভোক্তার লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত পূর্বক অভিযোগটি প্রমাণিত হলে প্রশাসনিক ব্যবস্থা আরোপিত ও আদায়কৃত জরিমানার ২৫ শতাংশ অভিযোগকারী পাবে। এইদিক দিয়ে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষন আইন একটি অনন্য ও ব্যতিক্রমী আইন। পদাধিকারবলে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (মহাপরিচালকের সকল ক্ষমতাপ্রাপ্ত) স্থানীয় অধিক্ষেত্রে ভোক্তা-অধিকার বিরোধী অপরাধ প্রতিরোধকল্পে এই আইনের অধীনে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন।

নাগরিকদের জন্য নিরাপদ খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা আধুনিক রাষ্ট্রের অন্যতম কর্তব্য। নিরাপদ খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে সরকার নিরাপদ খাদ্য আইন প্রণয়ন করেছে। যেহেতু খাদ্যের ক্রেতা একই সাথে ভোক্তাও তাই ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯-এ অনিরাপদ খাদ্য সরবরাহকারী তথা বিক্রেতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান রাখা হয়েছে। জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠার পর থেকেই ভোক্তাদের অধিকার রক্ষায় কাজ করে যাচ্ছে। একই সাথে খাদ্যে ভেজাল মিশ্রণকারী ও অনিরাপদ খাদ্য বিক্রেতাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ লঙ্ঘনের কারণে ৬ এপ্রিল ২০১০ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত ৩৫,০১৮টি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানকে ২৫,৫১,১৮৫০০ (পঁচিশ কোটি একান্ন লক্ষ আঠার হাজার পাঁচশত) টাকা জরিমানা আরোপ ও আদায় করে এবং ২৫% হিসেবে ৪১,৭৪,০০২ (একচল্লিশ লক্ষ চুয়াত্তর হাজার দুই) টাকা অভিযোগকারীগণকে প্রদান করা হয়। তন্মধ্যে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ভোক্তাদের নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকল্পে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর সংশ্লিষ্ট ধারায় সর্বমোট ১৩৮০৫টি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানকে ১৩,০২,৩৯৭০০ টাকা জরিমানা আরোপ করে আদায় করে। এছাড়াও খাদ্যে ভেজাল বা নিরাপদ খাদ্য বিরোধী কার্যক্রম প্রতিরোধকল্পে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য মাঠ পর্যায়ে ব্যাপক প্রচারনামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। সর্বোপরি ভোক্তাদের নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে ভোক্তার অধিকার সংরক্ষণ করতে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর বদ্ধপরিকর।

খাদ্যে রাসায়নিকের ব্যবহার ও জনমনে আতঙ্ক

ড. নীলুফার নাহার

প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জন করেছে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত উন্নতমানের সার, বীজ, প্রয়োজনীয় সেচ, বলাইনাশক, প্যান্ট গ্রোথ রেগুলেটর, রাইপেনিং ইত্যাদি ব্যবহার করে।

প্রোটিনের অভাব দুর হয়েছে উন্নত উপায়ে মাছ চাষ, ব্রয়লার মুরগির খামার এবং গবাদি পশু চাষ করে। শহর ও গ্রামাঞ্চলের মানুষের পুষ্টিকর খাবার যথা মাছ, মাংস ও ডিমের ঘাটতি পুরণ হয়েছে। দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সংরক্ষণ করা হচ্ছে। ভক্তার সুবিধার্থে খাদ্য সহজ লভ্য করতে ব্যবসায়িরা পেকেট জাত চাল, ডাল, আটা, ময়দা, মসালা ইত্যাদি বাজারজাত করছেন। তাতে শুধু নগরবাসি নয় সারা দেশের মানুষের পরিশ্রম অনেক খানি লাঘব হচ্ছে। কৃষক সমাজের অক্লান্ত পরিশ্রম আর সরকারের সহযোগিতায় সাফল্য এসেছে দেশে।

খাদ্য নিরাপত্তা লাভের সাথে সাথেই যোগ হয়েছে নিরাপদ খাদ্য ও ভক্তার অধিকার। অনিরাপদ খাদ্যে স্বাস্থ্য-ঝুঁকি জনগণের আতঙ্কিত হওয়ার কারণ। সরকারের ও চেষ্টা কিভাবে জনগণের জন্য নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন, সংরক্ষণ ও সরবরাহ করা যায়। নিরাপদ খাদ্য আইন করা হয়েছে এবং সে আইন যথাযথ প্রয়োগের জন্য গঠন করা হয়েছে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ।

জনগণ চায় বিষাক্ত কেমিক্যাল মুক্ত খাবার। সহনীয় মাত্রা অতিরিক্ত যে কোনো কেমিক্যাল স্বাস্থের জন্য ক্ষতিকারক। শাকসবজি উৎপাদনে যেমন ব্যবহৃত হচ্ছে নানা রাসায়নিক যৌগ তেমনি গরু মোটা তাজা করা এবং ব্রয়লার মুরগির দ্রুত বৃদ্ধির লক্ষ্যে এন্টিবায়োটিক ও হরমোন ব্যবহার করা হচ্ছে।

উৎপাদিত শাকসবজি, ফলমূল, মাছ এবং মাংস কতটা নিরপদতা নিয়ে জনমনে আতঙ্ক রয়েছে। সহনীয় মাত্রার অতিরিক্ত রাসায়নিক যৌগের রয়েছে স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী মানবদেহ ও পরিবেশের ক্ষতি।

কৃষি কাজে রাসায়নিক যৌগের ব্যবহার

কৃষি ক্ষেত্রে ব্যবহৃত বালাই নাশক প্রধানত তিন প্রকার: কীটনাশক, ছত্রাক নাশক ও আগাছা নাশক। এই তিন প্রকার বালাইনাশক ব্যবহার ছাড়া অধিক খাদ্য উৎপাদন সম্ভব নয়। খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন করা দুরুহ।

অর্গানোক্লোরিন কীটনাশক

অরগানোক্লোরিন কীটনাশক অত্যন্ত শক্তিশালী কিন্তু দীর্ঘদিন পরিবেশে অবস্থান করে এবং মানুষ, পরিবেশ ও জীব বৈচিত্রের ক্ষতি সাধন করে। স্টকহোম কনভেনশনে অরগানোক্লোরিন কীটনাশক নিষিদ্ধ করার পর বাংলাদেশ সরকার কনভেনশনে স্বাক্ষর করে এবং অরগানোক্লোরিন কীটনাশকের

ব্যবহার নিসিদ্ধ করে। তবে ম্যালরিয়া, ডেঙ্গু ও ফাইলেরিয়া ইত্যাদি রোগ মহামারী আকারে দেখা দিলে উক্ত কীটনাশক ব্যবহার করার অনুমতি রয়েছে। পার্শ্ববর্তী দেশে নিষিদ্ধ না করায় অবৈধ পথে আনিত কীটনাশক বাংলাদেশের চাষীরা কৃষি ক্ষেত্রে ব্যবহার করে বলে অনেকে সন্দেহ করেন, প্রকৃত পক্ষে কোন পরীক্ষায় এর সত্যতার প্রমাণ পাওয়া যায়নি। অর্গানোক্লোরিন কীটনাশক পানিতে স্বল্প মাত্রায় দ্রবণীয়, কৃষি কাজে ব্যবহৃত কীটনাশক বৃষ্টির অথবা বর্ষার সময় পানি থেকে মাছের টিস্যুতে জমা হয়। মাছ উক্ত কীটনাশকের উপস্থিতির নির্দেশক।

ডি.ডি.টি. এবং ডি.ডি.টি.-র মেটাবোলাইটের অনুপাত বর্তমান এবং পূর্বের ব্যবহার নির্দেশক। কীটনাশক খাদ্য চেইনের মাধ্যমে মানব দেহের চর্বিতে জমা হয়। ২০০৪ সাল থেকে উক্ত কীটনাশক কি পরিমাণ মাছে রয়েছে এবং তা সহনীয় মাত্রার অধিক রয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য বিভিন্ন নদীর, বাজারের এবং সমুদ্রের মাছের নমুনা এবং বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের রক্ত পরীক্ষা হয়। ডি.ডি.টি. এবং এর মেটাবোটাইটের পরিমাণ সহনীয় মাত্রার অধিক পাওয়া যায়নি এবং এদের অনুপাতও বর্তমান সময়ের ব্যবহার প্রমাণ করেনা।

কৃষি কাজে অনুমোদিত কীটনাশক

রাসায়নিক গঠন অনুসারে বর্তমানে অনুমোদিত এবং কীটনাশক প্রধানত তিন প্রকার: অরগানো ফসফরাস, পাইরিথ্রয়েড ও কারবামেইট। এদের কার্যকারিতা অত্যন্ত শক্তিশালী কিন্তু দীর্ঘ মেয়াদি নয় এবং বায়ো-একোমুলেশন করে এমন তথ্য জানা নেই।

বিভিন্ন কোম্পানির ট্রেড নামে বাজারে পাওয়া যায় তরল, পাউডার এবং গ্রেনুল হিসাবে। ডায়াজিনন, সাইপারমেথ্রিন, ক্লোরপাইরিফস, ইভারমেকটিন, ইমামেকটিন, ইমামেকটিন বেনজোয়েট, ফেনভেলারেট ইমিডাক্লোরপ্রিড, কারবোসালফান, কারবোফিউরান ইত্যাদি আবার এদের দুটি অথবা তিনটির মিশ্রণ ও বাজারে পাওয়া যায়।

ড. নীলুফার নাহার
অধ্যাপক, রসায়ন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

কৃষকগণ তাদের ইচ্ছা এবং ক্রয় ক্ষমতা অনুযায়ী ব্যবহার করেন। অনেকেই স্থানীয় কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তার পরামর্শও গ্রহণ করেন। স্বল্প শিক্ষিত কৃষকগণ জানেন না কোন সময়ে, কি পরিমাণ ব্যবহার করতে হবে, কৃষি জমিতে কীটনাশক প্রয়োগের কতদিন পর জমি থেকে সবজি তুলে বিক্রির ব্যবস্থা করতে হবে। কীটনাশক প্রয়োগ করার সময় নিজেদের কি সাবধানতা গ্রহণ করতে হবে। শিশুদেরকে মাঠে নিয়ে তাদের সামনেই কীটনাশক প্রয়োগ করা ঠিক নয় ঘরে কীটনাশক মজুত রাখাও ঠিক নয় এবং জানেন না ব্যবহৃত পেকেট বা কৌটা কোথায় ফেলতে হবে।

শহরের ভুক্তা সম্প্রদায় সকল দোষ কৃষকের উপর চাপিয়ে দিয়ে সদা সর্বদা নিরাপদ খাদ্যের চাহিদা ব্যক্ত করছেন। কখনও চিন্তা করেছনা কৃষকের ক্ষতি কতটুকু হলো, তার পরিবারের সদস্যদের কতটুকু ক্ষতি হচ্ছে।

বাজারে থেকে কেনা সবজিতে কি পরিমাণ বিশাক্ত কেমিক্যাল রয়েছে তা সহজে বলা সম্ভব নয়। প্রয়োজন দক্ষ এনালাইটিকেল রসায়নবিদ, উন্নত মানের যন্ত্রপাতি ও আনুসাঙ্গিক এপারেটাস, কেমিক্যালস, রিয়েজেন্টস এবং সার্টিফাইড রেফারেন্স স্টেন্ডার্ডাস। কৃষি জমি অথবা বাজারে গিয়ে অথবা যেকোনো গবেষণাগারে করাও সম্ভব নয়।

কীটনাশকের অবশিষ্টাংশ

কীটনাশকের অবশিষ্টাংশ নির্ণয়ের জন্য বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গার চাষ করা ক্ষেত থেকে সবজি সংগ্রহ করে এবং বিভিন্ন জেলার কাচা বাজার থেকে শব্জি কিনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগে গবেষনা

করা হচ্ছে এক দশকেরও অধিক সময় থেকে। পি.এইচ.ডি. , এম.এস. ও ৪র্থ বর্ষ ছাত্রদের দ্বারা করানো কাজ দেশিয় ও আন্তর্জাতিক পিয়ার রিভিউ জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে এবং অনেক গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ার পথে রয়েছে।

জামালপুর জেলার নুরুদ্দির সবজি ক্ষেতে ছাত্র শিক্ষকদের উপস্থিতিতে বেগুন, কাচা মরিচ, টমেটো, মিষ্টিকুমড়ায় বিভিন্ন কোম্পানির সাইপারমেথ্রিন প্রয়োগ করে দু'ঘন্টা পর সবজি সংগ্রহ করে রসায়ন বিভাগে এনে কক্ষ তাপ মাত্রায় রেখে এক দিন পর পর এনালাই-সিস করা হয়। সবজি সংগ্রহে সহায়তা করে স্থানীয় প্রশাসন, কৃষি সমপ্রসারন কর্মকর্তা, বিনার (বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ইনিজনিয়ারিং)-র ডাইরেক্টর এবং প্রিন্সিপাল বিজ্ঞানী। কৃষকদেরকে কীটনাশক ব্যবহার ও প্রয়োগের উপর সেমিনার করা হয়। সুইডেনের অধ্যাপক হেনরিক শিলিনও উপস্থিত ছিলেন। জেলা প্রশাসক সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করেন। এনালাইসিস করে দেখা যায় সাইপারমেথ্রিন দুদিনের মধ্যেই সহনীয় মাত্রা নীচে চলে আসে।

ঝিনাইদহ জেলার কৃষি খামারে ঝিংগা, চিচিঙ্গা, ধুন্দুল, পটল-এ ক্লোরপাইরিফস, ফেনভেলারেট, ডায়াজিনন, সাইপারমেথ্রিন প্রয়োগ করে একই পদ্ধতিতে এনালাইসিস করা হয়। ময়মনসিংহ ও কুমিলা জেলার স্থানীয় বাজার থেকে একই শব্জি কিনে এনালাইসিস করে দেখা হয়। বাজারের শব্জিতে কীটনাশক এর অবশিষ্টাংশ-এর পরিমাণ কৃষি খামার থেকে সংগৃহীত সবজির তুলনায় অনেক কম।

কুমিল্লার নুরিটুলায় অনুরূপ একটি কৃষক সচেতন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় বিনার ডাইরেক্টর এবং বিজ্ঞানীর সহযোগিতায় । স্থানীয় নির্বাহী কর্মকর্তা ও কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা ঐ অনুষ্ঠানে

কৃষকদেরকে কীটনাশক অধিক পররিমান ব্যবহার করলে তাদের, জনগণের এবং পরিবেশের ক্ষতিকারক প্রভাব নিয়ে আলোচনা করা হয়।

উক্ত কৃষি খামারে ৫টি কীটনাশক যথা- ভিটাবেন ৪৮ EC (ক্লোরপাইরিফস), ডাবল ৫০ EC (ইমিডাক্লোরপ্রিড ও সাইপারমেথ্রিন), নাইট্রো ৫০৫ EC (ক্লোরপাইরিফস ও সাইপারমেথ্রিন) এসাফেট ৭৫ (এসিফেট), ও রীডা ২.৫ EC (সাইহেলোথ্রিন)

আটটি সবজি; টমেটো, বাধা কপি ফুলকপি, লাউ, মিষ্টি কুমড়া, ধুন্দল, শসা ও কাচা মরিচ-এ প্রয়োগ করে দু'ঘন্টা পর সংগ্রহ করে রসায়ন বিভাগে কক্ষ তাপমাত্রায় রেখে এনালাইসিস করা হয়। এনালাইসিস করে দেখা যায় একই শব্জিতে দু টি কীটনাশকের অবশিষ্টাংশ এক নয়। কীটনাশক একক অথবা সংমিশ্রণের অবশিষ্টাংশ ও ভিন্নতর এবং

কোন কোন সবজিতে অবশিষ্টাংশ ৩, ৫, ৭ এবং ৮ দিন পযন্ত সহনীয় মাত্রার উপরে উর্ধ্বে থাকে।

কীটনাশকের অবশিষ্টাংশের পরিমাণ শীতেকালীন সবজিতে গ্রীষ্মকাল থেকে অধিক। কৃষি খামার থেকে সংগৃহিত গবেষণার সবজি রাখা হয় ল্যাবরেটরিতে যা বাজারের প্রকৃত অবস্থার থেকে ভিন্নতর, তাই বাজার থেকে কেনা একই সবজিতে কীটনাশকের পরিমাণ সহনীয় মাত্রার অনেক নীচে।

বেগুন, ঝিংগা, ধুন্দল, করলা ইত্যাদি সবজি একটু বড় হলেই মাচার নীচে ঝুলে যায়। কৃষকগণ কীটনাশক প্রয়োগ করেন পাতা এবং ফুলের ওপর যা সবজিতে সহজে পৌছনো পারেনা।

কৃষকগণ জমি থেকে উৎপাদিত শব্জি তুলে এনে এক জায়গায় জড়ো করেন, সে সবজি তিন থেকে চার হাত বদল হয়ে খুচরা বাজারে আসে। কীটনাশক প্রয়োগের পর ভুক্তার কাছে পৌছাতে সময় লাগে এবং পরিমাণ কমে যায় কারন সূর্যের তাপ, আলো ও সময়ের ওপর কীটনাশক স্থায়িত্ব নির্ভর করে।

পেকেট জাত খাদ্যে কীটনাশক

শতাধিক পেকেট জাত চাল এবং বাজারের চাল এবং আটায় সহনীয় মাত্রার অধিক ইমিডাক্লোরপ্রিড এর অবশিষ্টাংশ পাওয়া যায়। ঐ চাল ধুয়ে রান্না করলে ঐ কীটনাশক-এর পরিমাণ সনাক্ত করার নীচে চলে যায়। বিভিন্ন কোম্পানির পেকেট জাত হলুদ পরীক্ষা ও পরীক্ষা করা রসায়ন বিভাগে। পেকেটজাত গুড়া হলুদের কার্বোফিউরানের পরিমাণ সহনীয় মাত্রার অনেক উর্ধ্বে। আধ ঘন্টা রান্না করার তাপমাত্রায় তাফ দেয়ার পরও কীটনাশক হলুদে থেকে যায়।

মাংসে কীটনাশক

মুরগি ও গরুকে অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়ানো বন্ধ করলে সারা বিশ্বে প্রোটিনের সঙ্কট হতে পারে বলেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। আমেরিকা ফুড এনিমেলকে এন্টিবায়োটিক খাওয়ানো বন্ধ করার বিপক্ষে। পশু এবং মুরগির পরিপাক পদ্ধতি মানব দেহের থেকে ভিন্নতর হওয়ায় কারণে মাংসে অ্যান্টিবায়োটিকের অবশিষ্টাংশ পাওয়া যায় না। রসায়ন বিভাগের পরীক্ষায় সালফার ড্রাগস এবং ক্লোরামফেনিকল পাওয়া যায়নি। রসায়ন বিভাগ ও কোরিয়ার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ গবেষণায় ফুড এনিমেলের সলিড ওয়েস্টে (গোবরে) এন্টিবায়োটিক পাওয়া যায় এবং ঐ ওয়েস্টে মূলা চাষ করলে মূলায় ঐ কীটনাশকের অবশিষ্টাংশ পাওয়া যায়। মাংসে না পাওয়া গেলেও বিশ্ববাসি উদ্বিগ্ন কারন গরু অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্ট হয়ে যাচ্ছে। ঐ গরুর মাংসের মাধ্যমে মানবদেহ অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্ট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে যা সুচিৎসার অন্তরায়।

ব্রয়লার মুরগিকে এস্ট্রোজেন হরমোন খাওয়ানো হয়। মহিলাদের হরমোন ছেলে বাচ্চাদের ভিন্নতর বৃদ্ধির কারণ হতে পারে। ব্রয়লার মুরগির না খাওয়ানো হলে পুস্টিহীনতার সম্ভাবনা রয়েছে। উত্তরণের জন্য প্রতি দিনের খাদ্য তালিকায় ঐ ব্রয়লার মুরগির মাংস থাকা উচিত নয়। গরু ও মুরগি খামারের লোকজনকে প্রশিক্ষণ জরুরী ভিত্তিতে দেয়া প্রয়োজন।

খাদ্যে আফলা টক্সিন

ভুট্টা, বাদাম জাতির শস্য, চাল ইত্যাদি Aspergillus flavus এবং Aspergillus parasitics ছত্রাক দ্বারা আক্রান্ত হলে ন্যাচারাল টক্সিন; আফলা টক্সিন উৎপন্ন করে যা স্বাস্থের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। চাল আমাদের প্রধান খাদ্য, ছত্রাক আক্রান্ত নিম্নমানের চাল সাধারণত স্বল্প আয়ের জনগন খায়।

ঢাকা শহরসহ প্রত্যন্ত এলাকার বিশ রকমের চাল সংগ্রহ করে পরিক্ষা করা হয়। ফাংগাস আক্রান্ত চালে আফলা টক্সিন-এর পরিমাণ অতি অল্প এবং তিন রকমের চালে সনাক্ত করারও নীচে। তবে দীর্ঘদিন গুদামে সংরক্ষিত চাল পরীক্ষা করা উচিত।

জনমনে আতঙ্ক

বাংলাদেশের সব রকম সবজি ও ফলে রয়েছে বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ জনমনের অধিক ভীতি দূর করা প্রয়োজন। ফল পাকার সময় ইথিন নামক গ্যাস ফল উৎপন্ন করে যা ফলকে পাকতে সাহায্য করে। ইথিনকে ফলের হরমোন বলা হয়। ফলের ইথিন একটি ধীরগতি সম্পন্ন বায়োলজিক্যেল বিক্রিয়া। ফলের পাকতে দেরি হলে পচন ধরে এবং অতি মূল্যবান খাদ্য বিনষ্ট হয়। সাড়া পৃথিবীতে ফল পাকাতে ইথিন ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশের মানুষের মনে ইথিন ব্যবহারে স্বাস্থ্যহানি হয় একটি অমূলক ধারণা। পাকা ফলে ইথিন গ্যাসের-এর অবশিষ্টাংশ সম্ভব নয়!

ক্যালসিয়াম কার্বাইড কে তাপ দিলে অথবা পানিতে রাখলে এসিটিলিন গ্যাস উৎপন্ন হয় এবং ইথিনের ন্যায় ফল পাকা ত্বরান্বিত করে। এসিটিলিন মাপার সাধারণ কোন যন্ত্র নেই। এসিটিলিন ও ফলে জমা থাকতে পারে না। কার্বাইড ফলে থাকতে পারে না।

মুড়ি তৈরি করতে ইউরিয়া ব্যবহার করা হয় এবং তা সাস্থের ক্ষতিকর জনগণের ধারণা। ইউরিয়ার ৭০ডিগ্রি তাপমাত্রায় বাষ্পায়িত হয়। মুড়ি বালু দিয়ে ভাজা হয় তখন তাপমাত্রা ২০০ ডিগ্রীর উপরে। ভাজা মুড়িতে ইউরিয়া থাকার কোন সম্ভাবনা নেই।

আম গাছের মুকুলে কীটনাশক প্রয়োগ করলে ফলন বেশি হয়। পৃথিবীর সব দেশেই ফলের মুকুলের কীটনাশক প্রয়োগ করা হয় যা ২-৩ দিনের মধ্যেই ভেংগে যাবে। আমাদের দেশের জনগণের অকারন ভীতির উচিত নয়।

শাক-সবজি এবং ফল ১-২ ঘন্টা পানিতে ডুবিয়ে খাওয়ার পরামর্শ দেয়া হচ্ছে বিভিন্ন মাধ্যমে। ভিটামিন, মিনারেলের প্রধান উৎস শাক-সবজি এবং ফল। কীটনাশক পানিতে সম্পূর্ণ দ্রবনীয় নয়, দীর্ঘ সময় শব্জি বা ফল ডুবিয়ে রাখলে পানিতে দ্রবনীয় মিনারেল, ভিটামিন, এমিনোএসিড, ছোট আয়তনের পেপ্টাইড, গুকোজ, ফ্রুটোজ, কার্বোহাইড্রেট ইত্যাদি উপাদান পানিতে চলে যাবে। তবে ফল কয়েক বার ধুয়ে খাওয়া উচিত।

উপসংহার:

বালাইনাশক ব্যবহার ছাড়া অধিক খাদ্য উৎপাদন সম্ভব নয় এবং খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন করা দুরূহ। কীটনাশকের যথাযথ ব্যবহার প্রয়োজন। একই এন্টিবায়োটিক ফুড এনিমেলকে না খাইয়ে পরিবর্তন করে খাওয়া উচিত। জনগণের নিরাপদ খাদ্য এদেশের বিশাল জনগোষ্ঠীর জন্য নিশ্চিত করার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বটি কঠিন হলেও অসম্ভব নয়। সরকারের সাথে অন্যদের এগিয়ে আসতে হবে। জনগণের আস্থা ও বিশ্বাস অর্জনের জন্য বিজ্ঞানীদের সঠিক তথ্য প্রকাশ করা প্রয়োজন। তাদেরকে একই ভাষায় কথা বলতে হবে অর্থাৎ গবেষণার ফলাফল প্রতিযোগিতার মনোভাবে নয় সহযোগিতার মনোভাবে আলোচনা-পর্যালোচনার করে প্রকাশ করতে হবে যেন জনমনে ভীতি সঞ্চার না হয়।

এ উদ্যোগ বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষকেই গ্রহণ করতে পারে।

নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারের ভূমিকা

অধ্যাপক ড. মোঃ ইকবাল রউফ মামুন

ভূমিকা:

নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তি বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিকের একটি সাংবিধানিক অধিকার এবং এর নিশ্চয়তা বিধানের দায়িত্ব সরকারের। ক্রমশ উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাওয়া বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে বিস্ময়কর সাফল্য অর্জন করলেও খাদ্যের মান ও নিরাপদতা জনগনের কাছে প্রশ্নেরসম্মুখীন। দেশে উৎপাদিত খাদ্য বা খাদ্যপন্য কতটা নিরাপদ, সেটা নিয়ে জনমনে বিরাজ করছে নানারকমের ধারনা যার কিছুটা সত্যি, আবার কিছুটা বিভ্রান্তিমূলক। এর মূল কারণ হলো বিজ্ঞানভিত্তিক তথ্য-উপাত্তের অপ্রতুলতা এবং অসচেতনতা।

খাদ্যের পুষ্টিগুণ কিংবা নিরাপদতা, যেটাই যাচাই করা হোক না কেনো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতেই করতে হবে। কেননা 'পুষ্টিগুন' বিবেচনায় ভিটামিন, মিনারেল, প্রোটিন কিংবা শর্করা এবং 'নিরাপদতা' বিবেচনায় রাসায়নিক বা অণুজৈবীক দূষক কিংবা ভেজাল, এসবই বৈজ্ঞানিক বিষয়বস্তু। সুতরাং এসব দূষকের উপস্থিতির কারনে যদি কোন খাদ্য অনিরাপদ বা দূষিত হয়, কিংবা প্রয়োজনীয় প্রোটিন/মিনারেলের ঘাটতির কারনে খাদ্য নিম্নমানের হয়-সেটা নির্ধারণ করতে হলেও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাছাড়া দ্বিতীয় কোনো উপায় নেই। এ সত্য অনুধাবন করে 'নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩'-এর প্রথমেই বলা হয়েছে বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতির যথাযথ অনুশীলনের মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার কথা। এতে সহজেই অনুমান করা যায় খাদ্যে ভেজাল বা দূষণ নির্নয়ে রাসায়নিক বা অণুজৈবিক পরীক্ষাগারের গুরুত্ব কতখানি।

খাদ্যে ভেজাল ও দূষণের ধরন ও তাদের সহনীয় মাত্রা

খাদ্যে ভেজাল আর দূষণ এক কথা নয়। যখন মূল খাদ্যদ্রব্যের সাথে ইচ্ছাকৃতভাবে কিছু মেশানো হয় যা মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর অথবা মূল খাদ্যদ্রব্য হতে কিছু তুলে নেয়া হয় যা খাদ্যের গুনাগুন বা পুষ্টিমান হ্রাস করে তখন এটা ভেজাল খাদ্য বলে গন্য হবে। যেমন দুধে পানি, সয়াবিন তেলে পাম তেল, শস্যদানার ওজন বৃদ্ধি করার জন্য পাথরের টুকরা, অননুমোদিত রঞ্জক, চিংড়ীতে জেল, ইত্যাদি ভেজালের কথা জনমুখে শোনা যায়। অন্যদিকে খাদ্যে দূষন হলো অনিচ্ছাকৃত বা অজ্ঞাতসারে খাদ্য উৎপাদন কিংবা প্রক্রিয়াকরণের কোন এক বা একাধিক পর্যায়ে মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর রাসায়নিক বা অনুজৈবিক দূষক খাদ্যে অন্তর্ভুক্ত হওয়া। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কৃষিজাত পণ্যে চাষাবাদের সময় ব্যবহৃত বালাইনাশক, মৎস্য, হাঁস-মুরগি বা গৃহপালনে চিকিৎসার জন্য ব্যবহৃত এন্টিবায়োটিক/স্টেরয়েড, শিল্পজাত খাদ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি থেকে ক্ষতিকর রাসায়নিক, স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ না থাকার কারনে উৎপাদন বা মজুদ পর্যায়ে অনুজীবের উৎপত্তি, এবং কিছু কিছু অণুজীব থেকে উৎপন্ন টক্সিন, ইত্যাদির অবশিষ্টাংশের নির্দিষ্ট মাত্রার উপরে উপস্থিতি।

এখানে 'নির্দিষ্ট মাত্রা' বলতে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত' নিরাপদ খাদ্য (রাসায়নিক দূষক, টক্সিন ও ক্ষতিকর অবশিষ্টাংশ) প্রবিধানমালা ২০১৭' এবং'খাদ্য সংযোজন দ্রব্য ব্যবহার প্রবিধানমালা ২০১৭'-এ উল্লিখিত মাত্রার কথা বোঝানো হয়েছে। এই প্রবিধানমালাদ্বয়ে পরিষ্কারভাবে নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে বিভিন্ন খাদ্যপণ্যে বালাইনাশক, অ্যান্টিবায়োটিক, স্টেরয়েড, রঞ্জক, সুগন্ধিবর্ধক ও অন্যান্য খাদ্য সংযোজন দ্রব্যের উপস্থিতির সর্বোচ্চ মাত্রা। এই মাত্রার অতিরিক্ত পরিমানে যে কোনো রাসায়নিকের উপস্থিতি খাদ্যকে অনিরাপদ করবে এবং সেটা হবে নিরাপদ খাদ্য আইন অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ। তবে এই শাস্তি হতে হবে বিশুদ্ধ খাদ্য আদালত কর্তৃক প্রদত্ত, সঠিক ও গ্রহনযোগ্য বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের ফলাফলের ভিত্তিতে। সঠিক ও গ্রহণযোগ্য রাসায়নিক বা অণুজৈবিক বিশেষণের জন্য একান্তভাবে প্রয়োজন দক্ষ বিশেষক (Analyst) সমৃদ্ধএ্যাক্রেডিটেড (Accredited) খাদ্য পরীক্ষাগার।

বাংলাদেশে বিদ্যমান খাদ্য পরীক্ষাগারসমূহের সক্ষমতা

ঢাকা সহ প্রতিটি জেলা বা জেলা শহরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে হাজার হাজার ল্যাবরেটরি যার সিংহভাগই হচ্ছে প্যাথলজিক্যাল। খাদ্যের নমুনা পরীক্ষা করার মত পরীক্ষাগারের সংখ্যা অনেক কম। উপরন্তু সময়ে সময়ে বিদ্যমান সরকারি/স্বায়ত্বশাষিত প্রতিষ্ঠানগুলোর একই নমুনার বিশেষণের ফলাফল ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় এ্যাক্রেডিটেড খাদ্য পরীক্ষাগারের প্রয়োজনীয়তা হয়ে উঠেছে অবধারিত।

অধ্যাপক ড. মোঃ ইকবাল রউফ মামুন
সদস্য, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ

নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল ও দূষকের উপস্থিতিনিয়মিত পরীবিক্ষণের জন্য বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ বিদ্যমান সরকারি পরীক্ষাগারগুলোর সক্ষমতার উপর একটি সমীক্ষা চালায়। তাতে দেখা যায়, সারা দেশে মাত্র ৭টি পরীক্ষাগার আছে যেগুলো বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশনবোর্ড কর্তৃক এ্যাক্রেডিটেড এবং সেগুলো কতিপয় নির্দিষ্ট পরীক্ষা পদ্ধতির জন্য যা প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই অপ্রতুল। জেনে নেয়া যাক, এ্যাক্রেডিটেড ল্যাবরেটরি বলতে কি বুঝায়?

কোন পরীক্ষাগার বা ল্যাবরেটরির জন্য এ্যাক্রেডিটেশন হচ্ছে একটি সনদ বা সার্টিফিকেট যা একটি উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান বা বোর্ড প্রদান করে থাকে নির্দিষ্ট কিছু পরীক্ষা (ভৌত, রাসায়নিক, অনুজৈবিক, ফরেনসিক, ইত্যাদি) পদ্ধতির জন্য। এটি একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ঐ পরীক্ষাটির জন্য পরীক্ষাগারের যোগ্যতা এবং ফলাফলের গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিত করে। এই প্রক্রিয়াটি যথেষ্ট জটিল। সংক্ষেপে বলা যায়, কোনো একটি রাসায়নিক/অনুজৈবিক উপাদানের পরীক্ষার জন্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত কোনো একটি পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়। সেই পদ্ধতিটি উক্ত পরীক্ষাগারে বিদ্যমান এপারেটাস ও যন্ত্রপাতির আলোকে বিশেষণ করে ভ্যালিডেট বা যাচাই করতে হয় যাতে ফলাফল গ্রহনযোগ্য হয়। এই ভ্যালিডেশন বা যাচাইকরনের কিছু আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত পদক্ষেপ আছে যা অনুসরণ করে পদ্ধতিটিকে ভ্যালিডেট করতে হয়। ব্যবহৃত সকল যন্ত্রপাতি ও এপারেটাস ক্যালিব্রেট করতে হয় যাতে সঠিক পরিমাপ পাওয়া যায়, বিশেষককে ওই নির্দিষ্ট পরীক্ষা পদ্ধতির জন্য প্রফিশিয়েন্সী টেস্টে উত্তীর্ণ হতে হয় যা বিশ্লেষকের দক্ষতা নিরুপণ করে, পরীক্ষা পদ্ধতিতে এবং ব্যবহৃত রাসায়নিক উপকরনে যে কোনো প্রকার পরিবর্তন বা পরিমার্জন তাৎক্ষণিক নথিভুক্ত করতে হয় যাতে কোনো প্রকার বিচ্যুতি ঘটলে তাঁর সম্ভাব্য উৎস সনাক্ত করা যায়। এরূপ কিছু চাহিদা পূরণ করা সাপেক্ষেই এ্যাক্রেডিটেশনসনদ লাভকরা যেতে পারে। তাছাড়া উক্ত সনদ ততদিন বলবৎ থাকবে যতদিন এই সব কিছু অপরিবর্তিত এবং সময়োপযোগী থাকবে। অর্থাৎ আর সব কিছুর সাথে সাথে এটাও নিশ্চিত করতে হবে যে, শুধুমাত্র সেই সকল বিশ্লেষকই বিশ্লেষণ করতে পারবেন যারা প্রফিশিয়েন্সী টেস্টে উত্তীর্ণ ।

সুতরাং মনে রাখতে হবে, কোনো একটি পরীক্ষাগার যদি এ্যাক্রেডিটেশনসনদ লাভ করে থাকে, তবে সেটা নির্দিষ্ট কিছু পরীক্ষা পদ্ধতিকে এ্যাক্রেডিটেড করা হয়ে থাকে, পরীক্ষাগারকে নয়। কর্তৃপক্ষের চালিত সমীক্ষায় দেখা যায়, বাংলাদেশের বেশিরভাগ সরকারি পরীক্ষাগারে আধুনিক যন্ত্রপাতি এবং দক্ষ বিশেষকের প্রচন্ড অভাব। কোথাও যন্ত্রপাতি আছে, কিন্ লোকবলের অভাবে সেগুলো এখনো বাক্সবন্দী হয়েই পড়ে আছে। নিয়মিত খাদ্য বিশ্লেষণের লক্ষ্যে পর্যাপ্ত সংখ্যক পরীক্ষাগার নিশ্চিত করার জন্য এই সকল পরীক্ষাগারের উন্নয়ন এবং দক্ষ জনবল নিয়োগের বিকল্প নেই। তাছাড়া আরো দেখা গেছে, দেশ বা বিদেশ থেকে যখনি কিছু সরকারি কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ নিয়ে দক্ষ হয়ে উঠছেন, তখনি পদোন্নতি পেয়ে বদলি হয়ে যাচ্ছেন এমন এক জায়গায় যেখানে তাঁর এই দক্ষতা কাজে লাগানোর কোনো সুযোগই নেই।প্রয়োজন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তাদের বদলির ব্যাপারটি সচেতনতার সাথে বিবেচনা করা এবং তাদের উপযুক্ত সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করা। যত দ্রুত এই কাজ সম্পন্ন করা যাবে, তত দ্রুত নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তির সম্ভাবনা এগিয়ে আসবে।

ঝুঁকি নিরূপণে রাসায়নিক পরীক্ষাগারের ভূমিকা

নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনায় ঝুঁকি নিরূপণ একটি অত্যন্ত জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। এই কার্যক্রম ভোক্তার স্বাস্থ্য সুরক্ষায় মানসম্মত ও নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনে যেমন সাহায্য করে, তেমনি নিরাপদ খাদ্য সংক্রান্ত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিধি-বিধানের সাথেও সম্পর্কিত। একটি দেশে উৎপাদিত বা আমদানিকৃত খাদ্য কতটা নিরাপদ বা অনিরাপদ; এবং সেই অনিরাপদতার কারণে ভোক্তা সাধারণ কতটা স্বাস্থ্য ঝুঁকির সম্মুখীন তা নিরূপণ করাই হচ্ছে নিরাপদ খাদ্য- ঝুঁকি নিরূপণ (Food Safety-Risk Assessment)

নিরাপদ খাদ্য-ঝুঁকি নিরূপণ একটি নিয়মানুগ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি যেখানে জাতীয় খাদ্য গ্রহন সমীক্ষা (National Food Consumption Survey) থেকে একজন ভোক্তা দৈনিক বা সপ্তাহে কোন খাদ্য গড়ে কি পরিমান গ্রহণ করেন, তা নিরূপণ করা হয়। সেই সকল খাদ্যপণ্যের নমুনা দেশের বিভিন্ন জেলার বিভিন্ন এলাকার বাজার থেকে সংগ্রহ করে রাসায়নিক পরীক্ষাগারে বিশ্লেষণ করে দেখা হয় তাদের মধ্যে কোনো কোনো প্রয়োজনীয় ভিটামিন/মিনারেল এবং রাসায়নিক দূষক কি পরিমাণে আছে। এই পদ্ধতি বলা হয় টোটাল ডায়েট স্টাডি (Total Diet Study)। নিয়মিত গ্রহণ করা সব ধরনের খাদ্যপণ্যের রাসায়নিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত ফলাফল এবং খাদ্যগ্রহণের গড় পরিমানের আলোকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মাধ্যমে বুঝা যায় একজন ভোক্তা সত্যিকার অর্থে কি পরিমান ঝুঁকির সম্মুখীন। তবে রাসায়নিক পরীক্ষার জন্য আবশ্যই যোগ্যতাসম্পন্ন পরীক্ষাগার ও দক্ষ রাসায়নিক বিশ্লেষক লাগবে। বিশ্লেষণ সঠিকভাবে না করতে পারলে ঝুঁকিও সঠিকভাবে নিরূপণ করা সম্ভব নয়।

সুতরাং কতিপয় নমুনা পরীক্ষা করে জাতীয় পর্যায়ে একটি খাদ্যের ঝুঁকি নিরূপণ করা যায় না। তবে অবশ্যই সেখান থেকে একটি প্রাথমিক ধারণা পাওয়া যেতে পারে যার ওপর ভিত্তি করে পরবর্তী পদক্ষেপ নেয়ার পরিকল্পনা করা যাবে।

কর্তৃপক্ষের নিজস্ব রেফারেন্স ল্যাবরেটরি

উপরোক্ত আলোচনায় এটা পরিষ্কার যে, দক্ষ বিশ্লেষকসমৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগার ব্যতীত নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণ অসম্ভব। নিরাপদ খাদ্যআইন ২০১৩-এর ধারা ১৩ (জ)-এ বিদ্যমান খাদ্য পরীক্ষাগারগুলোর এ্যাক্রেডিটেশনের জন্য অনুসরণীয় নীতিমালা প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা সংস্থাকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান এবং বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে এবং সেই সাথে ধারা ১৩ (ঝ)-এ খাদ্যের ভেজাল ও মান নিরূপণে পরিচালিত পরীক্ষাগার পরিবীক্ষণকালে পরিলক্ষিত ত্রুটি-বিচ্যুতির বিষয়ে অনতিবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশিষ্ট কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদানের কথাও বলা হয়েছে। সে মোতাবেক বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ দেশে বিদ্যমান খাদ্য পরীক্ষাগারগুলোর সক্ষমতা যাচাই করার লক্ষ্যে দৈনিক পত্রিকায় ও কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইটে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে তথ্য আহবান করে। যে সকল পরীক্ষাগার পূর্ণ তথ্য-উপাত্ত প্রেরণ করেছেন, তাদের প্রেরিত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে ৫০টি পরীক্ষাগারের একটি ডাইরেক্টরি তৈরি করা সম্ভব হয় যার মধ্যে মাত্র ৭টি পরীক্ষাগার কয়েকটি পরীক্ষা পদ্ধতির জন্য এ্যাক্রেডিটেড হিসেবে পাওয়া যায় এবং বাকিগুলোর বেশিরভাগেরই সক্ষমতার যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে। এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ একটি নিরাপদ খাদ্য পরীক্ষাগার নেটওয়ার্ক (Food Safety Laboratory Network) তৈরি করে তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সহযোগিতা করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। নেটওয়ার্কে অন্তর্ভূক্ত পরীক্ষাগারগুলো বিশেষণের সক্ষমতা অর্জন সাপেক্ষে পর্যায়ক্রমে কর্তৃপক্ষের সহযোগী পরীক্ষাগার হিসেবে ডেজিগনেট হবে এবং কর্তৃপক্ষের জন্য প্রয়োজন অনুসারে নমুনা পরীক্ষা করবে। পর্যায়ক্রমে এই নেটওয়ার্কে বিশ্ববিদ্যালয়, আধা-সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের পরিক্ষাগারও অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। তবে মনে রাখতে হবে যে, এই সকল পরীক্ষাগার এক একটি স্বতন্ত্র সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষাগার যা তাদের নিজস্ব চাহিদার কথা সর্বাগ্রে বিবেচনা করবে এটাই স্বভাবিক। তাছাড়া বিশ্লেষণের ফলাফল নিয়ে কখনো না কখনো, কারো না কারো আপত্তি উঠতেই পারে, যা সুরাহা করার জন্য দ্বিতীয়/তৃতীয় পরীক্ষাগারের ফলাফলের প্রয়োজন হবে। অন্যদিকে, দেশজুড়ে নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শকদের নমুনা সংগ্রহের পরিমাণ বেড়ে গেলে সহযোগী পরীক্ষাগার থেকে যথা সময়ে বিশ্লেষণের রিপোর্ট পাওয়া দুষ্কর হয়ে যেতে পারে।

তাই আর সব দেশের মত বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের একটি নিজস্ব পরীক্ষাগার থাকতে হবে যা 'রেফারেন্স ল্যাবরাটরি' হিসেবে চিহ্নিত হবে। এই রেফারেন্স ল্যাবরেটরি হতে হবে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন এবং সকল পরীক্ষা পদ্ধতির জন্য এ্যাক্রেডিটেড। তবেই যখনই কোনো নমুনা বিশ্লেষণের ফলাফল নিয়ে প্রশ্ন উঠবে, সেটা যাচাই করা হবে নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের রেফারেন্স ল্যাবরেটরিতে। এজন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, দক্ষ জনবল, প্রশিক্ষণ, যা কিছু দরকার তাঁর সবকিছু করে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষকে একটি সেন্টার অব একসিলেন্স এবং জাতীয় পর্যায়ে একটি উপযুক্ত ও কার্যকর কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। ভালো লাগছে বলতে যে, এ ব্যাপারে নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ ইতোমধ্যেই প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

সকলের সহযোগীতায় আমরা তথা বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ দেশের জনগণের জন্য নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করবো ইনশাল্লাহ।

আসুন, নিরাপদ খাদ্যের ব্যাপারে সচেতন হই, সবাই মিলে সুস্থ থাকি।

Food Sovereignty: A review of the concept and potential for developing countries

Monzur Morshed Ahmed

It is still a hard truth that hundreds of thousands of people in countless locations around the world do not have access to safe and affordable food. A growing number of homeless and slumdwellers fear for tomorrow's meal, even though enough food for today. The people who have adequate incomesto pay their grocery bills, there are grounds for unease about the ingredients, safety and origin of food and the long-term sustainability of food production system.Hence, the security, safety, cost and nutrition of food and the future of food production itself are everyone's concern. What might be the solution?

Neoliberal globalization suggests that the best way to keep-up with a growing population is to prevent national governments from intervening in the market, focus on scientific high-tech approaches, increase production with the adoptionof GMOs and further liberalize agricultural and food trade. The transnational agrarian movement La Via Campesina now representing more than 148 organizations from 69 plus countries, has become one of the strongest voice of radical opposition to the neoliberal globalizationof agriculture, claiming that 'the time for food sovereignty has come', they argued that the current, and linked, food, economic and environmental crises are in fact the direct results of decades of destructive economic policies based on the globalization of a neoliberal , industrial, capital-intensive and corporate lead model of agriculture.The food sovereignty concept was started during the nineties; food security is older. During the post-war period, the paradigm of agricultural development based on food self-sufficiency in all countries was the most relevant one. Even today, in many countries, this idea predominates and has been confused with rural development.

Food sovereignty, broadly defined as the right of nations and peoples to control their own food system, including their own markets, production modes, food cultures and environments. Now, the question is, can food sovereignty addresses the multiple issues affecting food and agriculture especially, food production as well as food safety and security? Can food sovereignty ensure sufficient, healthy food for everyone and provide livelihoods for marginal farmers? What would change if the concept of food sovereignty were widely adopted? Certainly, ideas about food sovereignty forces us to rethink our relationship with food, agriculture and the environment. The concept demands that we treat food not supply as a goods, access to which and the production of which is determined by market, it demands that we recognize the social connections inherent in producing food, consuming food and sharing food.Perhaps the most revolutionary aspects of food sovereignty is that it forces us to rethink our relationship with one another. It reflects in a powerful way in the 5th International Conference on Food Sovereignty in Maputo 2008:

"Food sovereignty means stopping violence against women, women play a key role in food production and procurement, family food security and food culture, the social and political transformation embedded in the food sovereignty concept specially entails changed gender relations. Food sovereignty for communities and peoples cannot be achieved without ensuring equality, respect and freedom from violence for women."

Monzur Morshed Ahmed
Member, Bangladesh Food Safety Authority

The international food sovereignty movement has developed six defining principles.

1. Focuses on food for people: The right to food which is healthy and culturally appropriate is the basic legal demand underpinning food sovereignty. Guaranteeing it requires policies which support diversified food production in each region and country. Food is not simply another commodity to be traded or speculated on for profit.
2. Values food providers: Many smallholder farmers suffer violence, marginalization and racism from corporate landowners and governments. People are often pushed off their land by mining concerns or agribusiness. Agricultural workers can face severe exploitation and even bonded labour. Although women produce most of the food in the global south, their role and knowledge are often ignored, and their rights to resources and as workers are violated. Food sovereignty asserts food providers' right to live and work in dignity.
3. Localizes food systems: Food must be seen primarily as sustenance for the community and only secondarily as something to be traded. Under food sovereignty, local and regional provision takes precedence over supplying distant markets, and export-orientated agriculture is rejected. The 'free trade' policies which prevent developing countries from protecting their own agriculture, for example through subsidies and tariffs, are also inimical to food sovereignty.
4. Puts control locally: Food sovereignty places control over territory, land, grazing, water, seeds, livestock and fish populations on local food providers and respects their rights. They can use and share them in socially and environmentally sustainable ways which conserve diversity. Privatization of such resources, for example through intellectual property rights regimes or commercial contracts, is explicitly rejected.
5. Builds knowledge and skills: Technologies, such as genetic engineering, that undermine food providers' ability to develop and pass on knowledge and skills needed for localised food systems are rejected. Instead, food sovereignty calls for appropriate research systems to support the development of agricultural knowledge and skills.
6. Works with nature: Food sovereignty requires production and distribution systems that protect natural resources and reduce greenhouse gas emissions, avoiding energy-intensive industrial methods that damage the environment and the health of those that inhabit it.

Although the idea of food sovereignty was initially introduced by La ViaCampesina but the discourse of food sovereignty has thus entered the official international stage. In addition to the Food and Agriculture Organization of the United Nations support, United Nations Council on Human Rights advocate food sovereignty as the path to ensure peoples human right to food and food security. Several national governments have also integrated food sovereignty into their national laws. Between 1999 and 2009, food sovereignty was included in national legislation promulgated by the governments of Venezuela, Mali, Bolivia, Ecuador, Nepal and Senegal.

In the review we might clear that food security and food sovereignty approaches are not the same. Food security shares many points with agricultural development and the most important issue is to increase food production. Food sovereignty, on the other hand, shares many topics with rural development and the main goal for both is improving the quality of life for peasants, indigenous populations and, in general, rural inhabitants. Food sovereignty is a radical, provocative, transformative concept with multiple layers of meaning and application. As with the growing, harvesting and reseeding of grains, achieving food sovereignty is an ongoing, regenerative work

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের অগ্রযাত্রা এবং এ পর্যন্ত অর্জন

ড. মোঃ খালেদ হোসেন

ভূমিকা

পিউর ফুড অ্যাডিনেন্স, ১৯৫৯ অনুসারে বাংলাদেশে খাদ্যের নিরাপদতা নিশ্চিত করার কার্যক্রম এতোদিন থেকে পরিচালিত হয়ে আসছিল। কিন্তু, দীর্ঘ ৫৬ বছরেও এক্ষেত্রে আশানুরূপ অগ্রগতি অর্জিত না হওয়ায় মানুষের জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির যথাযথ অনুশীলনের মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্যপ্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিতকরণ এবং একটি দক্ষ ও কার্যকর কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করার জন্য সরকার নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ প্রণয়ন করে। গত ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখ থেকে এ আইন কার্যকর হয় এবং এ আইনের অধিন সরকার ২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখে 'বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ' নামে একটি কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করে। উক্ত আইনের উদ্দেশ্যে হলো - বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির যথাযথ অনুশীলনের মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্যপ্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিতকরণে খাদ্য উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ, বিপণন ও বিক্রয় সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সমন্বয়ের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ এবং তদ্লক্ষ্যে একটি দক্ষ ও কার্যকর কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এতদ্সংক্রান্ত বিদ্যমান আইন রহিতক্রমে তা পুনঃপ্রণয়ন করা। নিরাপদভাবে ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ সংরক্ষণের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, প্রস্তুতকরণ ও বিপণনে উৎকৃষ্ট পদ্ধতির (GAP, GAqP, GMP, GHP, HA, FSER, RCS, FSAS) অনুসরণ করাই নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এর অন্যতম উদ্দেশ্য।

খাদ্য উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ, বিপণন ও বিক্রয় সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ ও পরিবীক্ষণ এবং নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার কার্যাবলি সমন্বয় সাধন করার লক্ষ্যে একজন চেয়ারম্যান ও চারজন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত কর্তৃপক্ষ একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে ঢাকায় প্রধান কার্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম শুরু করেছে। কর্তৃপক্ষে বর্তমানে একজন সচিব ও পাঁচজন পরিচালকসহ ১১ জন কর্মকর্তা কাজ করছেন। কর্তৃপক্ষের ৩৬৫ জনবলবিশিষ্ট একটি সাংগঠনিক কাঠামোইতোমধ্যে অনুমোদিত হয়েছে। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের প্রস্তাবিত কাঠামোটি নিম্নোরূপ:

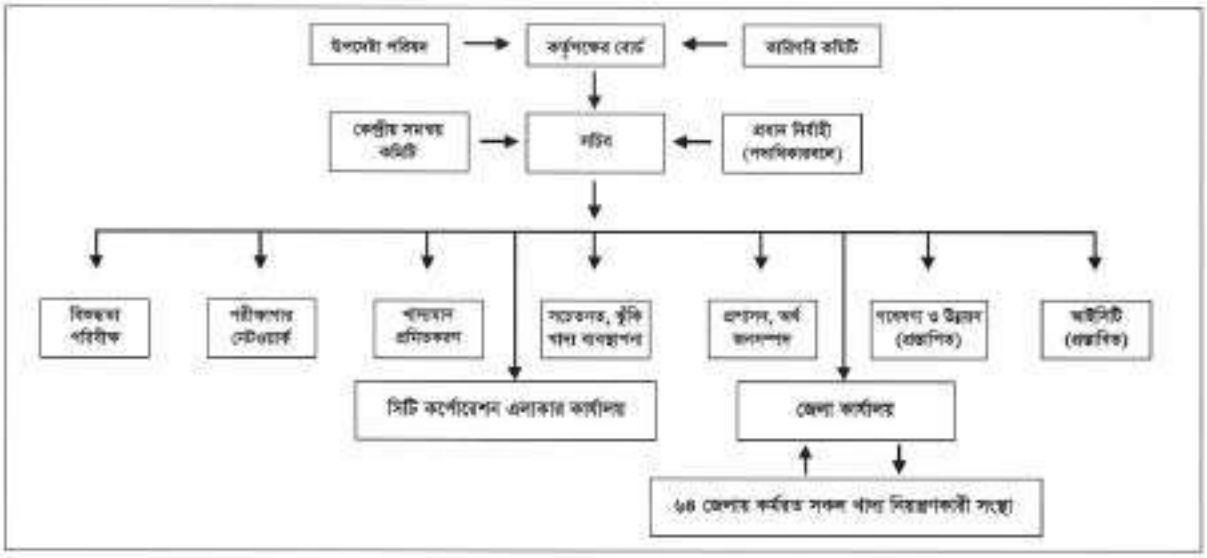

নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনায় সরকারের ২০টি মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/সংস্থা সরাসরিভাবে জড়িত। তদুপরি, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/সংস্থার অধিন ১২০টিরও বেশি আইন/বিধিমালা/প্রবিধানমালা অনুযায়ী নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা পরিচালিত হচ্ছে। নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনার একমাত্র নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা ও এ্যাপেক্স বডি হিসেবে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ পূর্ণাঙ্গ ও কার্যকরভাবে বাস্তবায়নকল্পে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় বিধিমালা ও প্রবিধানমালা প্রণয়নের কাজ করছে। তদুপরি, ৬৪ জেলায় ও ৬ মেট্রোপলিটন এলাকায় (রংপুর ব্যতিত) ৭১টি বিতন্ধ খাদ্য আদালত সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হয়েছে। ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন ও ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ১৯ জন স্যানিটারী ইন্সপেক্টর, অন্যান্য সিটি কর্পোরেশনে ১২ জন, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ৬৪ জন জেলা স্যানিটারী ইন্সপেক্টর ও ৪৯১ জন স্যানিটারী ইন্সপেক্টর, পৌরসভার ৮৩ জন এবং খাদ্য অধিদপ্তরের ৪০ জন কারিগরি পরিদর্শককে নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শকের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। নিরাপদ খাদ্য আইনটি মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ এর তফসিলভুক্ত হয়েছে।

ড. মোঃ খালেদ হোসেন
সচিব, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ

কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব

কর্তৃপক্ষের প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে নিরাপদ খাদ্যের প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণে খাদ্য-শৃঙ্খল সংশ্লিষ্ট সকল কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ ও পরিবীক্ষণ এবং নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার কার্যাবলির সমন্বয় সাধন করা। কর্তৃপক্ষেরওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে গৃহিতব্য বিভিন্ন পদক্ষেপের মধ্যে নিরাপদ খাদ্যের গুণগত মান সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টি অন্যতম। কর্তৃপক্ষের নেতৃত্বে ও সমন্বয়ে নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার কার্যক্রম সমন্বিতভাবে পরিচালনা ও সম্পাদন এবং নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য সকল স্টেকহোল্ডার ও দেশের সকল শ্রেণীর নাগরিককে সচেতন করে তোলা অতি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

কর্তৃপক্ষের কর্মকান্ড

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এ পর্যন্ত ২টি বিধিমালা ও ৪টি প্রবিধানমালার এসআরওজারী করা হয়েছে। প্রবিধানমালাগুলো খাদ্যমান প্রমিতকরণের মূল হাতিয়ার। সেগুলোকে অনুসরণ করা খাদ্য নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থাসমূহ এবং খাদ্য ব্যবসায়ী উভয়ের জন্য অপরিহার্য।

বিধিমালা ও প্রবিধানমালা প্রণয়ণের পাশাপাশি কর্তৃপক্ষ সকল খাদ্য নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থার সাথে আলোচনা করে উভয়ের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের পদক্ষেপ নিয়েছে; এর ফলে অতি দ্রুত নিরাপদ খাদ্য কার্যক্রমে সকল সংস্থার দায়-দায়িত্ব নির্ধারিত হবে এবং নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের সহযোগিতা পাওয়া যাবে। তদুপরি, খাদ্য ব্যবসায়ীগণের সাথেও কর্তৃপক্ষ আলোচনা শুরু করেছে।আইনের বিধান মোতাবেক কর্তৃপক্ষ এবং নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা প্রদানকল্পে সরকারি-বেসরকারি স্টেকহোল্ডারদের সদস্য করে ৩২ সদস্যবিশিষ্ট "জাতীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা পরিষদ" কাজ করছে এবংইতিমধ্যে ২টি সভায় মিলিত হয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ প্রদান করেছে। এছাড়াও, সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার প্রতিনিধিত্বে ৪০ সদস্য বিশিষ্ট "কেন্দ্রীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি" নিরাপদ খাদ্য সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের সমন্বয় করছে এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করছে। কেন্দ্রীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির অনুসরণে -বিভাগীয় পর্যায়ে বিভাগীয় কমিশনার; জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসক; এবং উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সভাপতিত্বে সারা দেশব্যাপি ১৫-২০ সদস্য বিশিষ্ট নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি গঠন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ সৃষ্টির পর হতে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ কার্যাদি সম্পন্ন করেছে, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

- খাদ্য স্থাপনা পরিদর্শন, ঝুঁকিভিত্তিক খাদ্য নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষাগারে প্রেরণ, মামলা দায়ের, মামলা পরিচালনায় সহায়তা ইত্যাদির জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, খাদ্য অধিদপ্তর, সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাসমূহ থেকে ৭২৫ জন স্যানিটারি ইন্সপেক্টরকে নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শকের দায়িত্ব প্রদান;
- খাদ্যস্থাপনা পরিদর্শনের দায়িত্বপ্রাপ্ত নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শকদের ঝুঁকিভিত্তিক ফুড সেফটি প্লান তৈরির ওপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে;
- খাদ্য স্থাপনাসমূহ নির্ধারিত ছকে পরিদর্শকের জন্য হোটেল রেষ্টুরেন্ট মালিক সমিতির সহায়তায় খাদ্য কর্মীদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অনুসরণ করার লক্ষ্যে প্রচারপত্র, এ্যপ্রোন, হ্যান্ড গ্লাবস, মাথার চুল ঢাকার ক্যাপ, ইত্যাদি বিতরণ করা হয়েছে এবং তাদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে;
- ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের একজন পাবলিক এনালিস্ট এবং জনস্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের ১ জন বায়োকেমিস্ট ও ১ জন কেমিস্টসহ ৩ জনকে "খাদ্য বিশ্লেষক" এর দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে;
- খাদ্য নমুনা পরীক্ষা নিশ্চিত করার জন্য সরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের নিয়ন্ত্রনাধীন খাদ্য পরীক্ষাগারগুলোকে ডেজিগনেট করে একটি নেটওয়ার্কের আওতায় আনার জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে এবং ইতোমধ্যে, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ১টি এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ১টি আধুনিক খাদ্য পরীক্ষাগারকে ডেজিগনেট করা হয়েছে;
- খাদ্য নমুনা পরীক্ষা নিশ্চিত করার জন্য দেশের সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান ও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের খাদ্য ল্যাবরেটরির সক্ষমতা, যন্ত্রপাতি এবং কর্মরত লোকবলের অভিজ্ঞতার তথ্যাদি সংগ্রহপূর্বক ৬৫টি খাদ্য পরীক্ষাগারে খাদ্যনমুনা পরীক্ষার জন্য বিদ্যমান সক্ষমতার তথ্যউপাত্ত সংগ্রহ করে ল্যাবসমূহের একটি ডাইরেক্টরি প্রণয়নপূর্বক সেগুলো থেকে সক্ষমতা বিবেচনায় ৫০টি ল্যাবরেটরির তথ্য সম্বলিত একটি ল্যাব ডাইরেক্টরি প্রণয়ন করা হয়েছে;
- জনসচেতনামূলক প্রচার কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বিভাগীয় পর্যায়ে 'নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ বাস্তবায়নে জনসচেতনতা' শীর্ষক ৮টি কর্মশালা ইতোমধ্যে ৮টি বিভাগে সম্পন্ন হয়েছে;

- পবিত্র রমজান, কোরবানির ঈদ এবং ফলের মৌসুমসহ বিভিন্ন বিশেষ বিশেষ সময়ে খাদ্যদ্রব্যে নিরাপদতার সম্ভাব্য ঝুঁকিসমূহ মোকাবেলায় করণীয় সম্পর্কে বিভ্রান্তি দূরীকরণে সচেতনতামূলক গণবিজ্ঞপ্তি দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে;
- খাদ্য নিরাপদতার ৫ চাবিকাঠির ওপর একটি এ্যানিমেশন চিত্র প্রণয়ন করা হয়েছে এবং বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলে প্রচার করা হচ্ছে;
- সরকারি ও বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলে টিভি স্ক্রলের মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক বার্তা ও স্লোগান প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে;
- ২৪২ জন নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শককে 'ঝুঁকিভিত্তিক খাদ্যস্থাপনা পরিদর্শন' বিষয়ে Institutionalization of Food Safety in Bangladesh for Safer Food- এর আয়োজনে তিনদিনব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- নিরাপদ খাদ্য বিষয়ে আগস্ট ২০১৭ মাসে দুই দিনব্যাপী একটি আর্ন্তজাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে;
- নিরাপদ খাদ্য সংশ্লিষ্ট দক্ষ জনবল তৈরির উদ্যোগ হিসেবে বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রি/ডিপ্লোমা/সার্টিফিকেট কোর্স/শর্ট কোর্স আয়োজনের ব্যবস্থা করার জন্য বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে আলোচনা চলছে;
- কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তাদেরকে দায়িত্ব প্রদান করে নিজস্ব মোবাইল কোর্ট পরিচালনা ও প্রশাসনিক কার্যক্রম/বাজার পরিদর্শন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে;
- কেন্দ্রীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক আন্তঃসংস্থাসমূহের মধ্যে সহযোগীতার ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিতকরণ, সুনির্দিষ্টকরণ ও দায়-দায়িত্ব নির্ধারণের বিষয়ে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের কার্যক্রম গ্রহণ করাহয়েছে এবং ইতোমধ্যে ৩টি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে;
- চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য সংশ্লিষ্ট জনসচেতনতা সংশ্লিষ্ট ৩টি টিভি স্পট/ফিলার তৈরি করা হয়েছে;
- নিরাপদ খাদ্যের ওপর একটি বুকলেট তৈরি করা হয়েছে;
- নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের নামে একটি ফেইসবুক, ইউটিউব, ওয়েব সাইট খোলা আছেএবং নিরাপদ খাদ্য প্রচারণার জন্য ফেইসবুক এ Comments, Massage ইত্যাদি গ্রহণ ও পোষ্ট করা হচ্ছে;
- কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইটকে সব সময় হালনাগাদ করা হচ্ছে;
- বিভিন্ন গ্রুপভিত্তিক গ্রাহক বিবেচনায় বিভিন্ন সময়ে ঘটনার গুরুত্ব অনুধাবনে মোবাইলে Text Message ক্যাম্পেইন করা হচ্ছে;
- ই-মেইল ক্যাম্পেইন এর কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে;
- টেলিভিশনে প্রচারের জন্য টিভিসি তৈরির কাজ চলছে;
- উপজেলা পর্যায়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিরাপদ খাদ্য সংশ্লিষ্ট বার্তা সময় সময় মাইকিং করে প্রচারকরা হয়েছে;
- ফুড সেফটি প্ল্যান প্রস্তুত করে সংশ্লিষ্ট স্থাপনায় ঝুলিয়ে রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে;
- বিভিন্ন সংস্থার আওতাধীন মোট ৯টি ল্যাবরেটরিকে ডেজিগনেট করা হয়েছে; এবং
- হোটেল-রেস্তোরা কর্মীদের স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াকরণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের কৌশলগত পরিকল্পনা (২০১৭-২০২১) প্রণীত হয়েছে। কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়নের ভিত্তি হিসেবে সরকারের রূপকল্প ২০২১, বাংলাদেশের সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, খাদ্য নীতিমালা ২০০৬ এবং নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ তে উল্লেখিত নির্দেশনা ও অনুশাসনসমূহ বিবেচনা করা হয়েছে। এ সকল অনুশাসনে বৃহৎ পরিসরে খাদ্য নিরাপত্তা এবং সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে খাদ্য-উৎপাদন-শৃঙ্খল এবং এর পরিমাপ নির্দেশক অন্তর্ভুক্ত আছে। একই সাথে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ও কৃষি বিবেচনায় আনা হয়েছে। বাঙালির খাদ্যভাস, সংস্কৃতি, অপ্রাতিষ্ঠানিক খাদ্য-ব্যবসার আধিক্য এবং খাদ্য নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থার ভূমিকা ও সামর্থ্য বিবেচনায় আনা হয়েছে।

স্বল্প মেয়াদি	মধ্য মেয়াদি	দীর্ঘ মেয়াদি
• নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শকদের প্রশিক্ষণ; • ১৬টি জেলায় জনসচেতনতামূলক র‍্যালি ও ওয়ার্কশপ; • সারাদেশে ইউনিয়ন তথা গ্রাম পর্যায়ে সচেতনতামূলক মাইকিং ও উপজেলা পর্যায়ে সচেতনতা সভা; • নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শকদের ডাটাবেইস তৈরি।	• Hygiene সংক্রান্ত প্রবিধানমালার ওপর COP/SOP প্রণয়ন; • খাদ্যে সংযোজনদ্রব্য প্রবিধান-মালার ওপর COP তৈরি; • খাদ্য উৎস ও বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত প্রবিধানমালা, COP তৈরি; • খাদ্য স্থাপনার ডাটাবেইস তৈরি;	• বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষকে ষ্টেট-অব-দ্যা-আর্ট এবং জাতীয় পর্যায়ে একটি উপযুক্ত ও কার্যকর কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ হিসেবে গড়ে তোলা; • বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের জন্য নিজস্ব ভবন নির্মাণ; • উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত কর্তৃপক্ষের অফিস স্থাপন; • পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনার ওপর স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি চালু করা; • বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের জন্য নিজস্ব রেফারেন্স ল্যাব স্থাপন।

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের প্রতিবন্ধকতাসমূহ

- খাদ্য ব্যবসায়ি ও জনসাধারণের মধ্যে নিরাপদ খাদ্য সম্পর্কে অনেক বিভ্রান্তিকর ভুল ধারণা বিদ্যমান;
- অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস ও সরবরাহ, বিপণন ব্যবস্থা;
- খাদ্য ব্যবস্থাপনায় অদক্ষতা;
- ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রদান;
- সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজ করার জন্যে সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও সংস্থাসমূহের অ-অনুকূল মনোভাব।

কর্তৃপক্ষের করণীয়

- প্রকৃত চাহিদার নিরিখে বর্তমান প্রস্তাবিত সাংগঠনিক কাঠামোটি পুনঃপর্যালোচনাপূর্বক সংশোধিত জনবল কাঠামো প্রণয়ন করা ও নির্দেশনা প্রয়োজন;
- নিরাপদ খাদ্য সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহের মধ্যে বিদ্যমান সমন্বয় কার্যক্রম আরো দক্ষ ও কার্যকরভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;
- বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের কেন্দ্রীয় অফিসের জন্য কোন সুবিধাজনক স্থানে নিজস্ব ভবন ও মাঠ পর্যায়ের অফিসের জন্য ভবনের প্রয়োজন ব্যবস্থা গ্রহণ;
- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন স্যানিটারি ইন্সপেক্টর ও বিশ্লেষকদেরকে নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শক ও নিরাপদ খাদ্য বিশ্লেষক হিসেবে নিয়োজিত করায় তাদেকে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষকর্তৃক প্রদানকৃত দায়িত্ব পালনে আরো মনোযোগী করা;
- দেশে বিদ্যমান ফুড সেফটি ল্যাবসমূহের আধুনিকায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং কর্তৃপক্ষের আওতাধীন একটি আধুনিক Reference ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা; এবং
- রাজস্ব বাজেটের আওতায় গৃহীত প্রকল্প "বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের দৃঢ় বুনিয়াদ স্থাপনে দক্ষতা উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের দ্রুত অনুমোদনের ব্যবস্থা গ্রহণ।

উপসংহার

বাংলাদেশে নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হলে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি/বেসরকারি দপ্তর/অধিদপ্তর/সংস্থা/প্রতিষ্ঠানকে ও নিজ নিজ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে হবে। তাছাড়া সকল ব্যবসায়িক সংগঠনকেও আন্তরিকতার সাথে কাজ করতে হবে এবং কর্তৃপক্ষের নির্দেশনাকে যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে। সর্বোপরি আপামর জনসাধারণকেও সচেতন হতে হবে এবং দেশে নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহিত পদক্ষেপসমূহে সকলকে সহযোগিতা প্রদান করতে হবে, তবেই জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

Developing a Strong Food Safety Culture

Prof. Shah Monir Hossain

The presence of contaminants in food and the constant threat of food adulteration have been long standing challenges in the country. Unsafe food poses a serious public health risk leading to an increased prevalence of food borne diseases. Adulteration or the intentional addition of illegal substances is mostly due to unethical trade but also to a lack of knowledge. Contamination along the food chain is mostly due to the failure to follow widely accepted good practices from production to consumption. Every year, millions of people suffer from food borne illness, ranging from acute morbidity to life threatening diseases. Aside from the acute effects resulting from the consumption of food contaminated by microbial pathogens, the consumption of foods contaminated with chemical substances and toxins have a long term impact due to non reparable damage of vital organs. Food contaminated/adulterated by chemicals, heavy metals or radioactive substances may act as carcinogenic agents that mutate the cellular genome to malignancy.

The major food safety concerns in Bangladesh include:

- Indiscriminate use of agro-chemicals including pesticides, fertilizers, veterinary drugs, food additives or preservatives, growth promoters and antibiotic residues due to lack of good practices. Generally there appears to be widespread non-compliance with hygienic/food safety practices along the food chain.
- Environmental contaminants, both chemical and microbiological that often arise from the inappropriate disposal of food waste, unhygienic practices in the slaughter of animals, a lack of sanitation and the failure to adequately separate processed food products from raw products in both the whole sale and retail markets.
- Inadequate quality assurance in food processing and food handling, including basic sanitation and codes of practice.
- Not practicing good hygienic practice (GHP) in household food preparation and the inability to adequately store food in the home.

Food Safety is a shared responsibility of all actors involved in the production, processing, marketing and distribution of food. A regulatory regime through standard setting, evidence based food analysis is required. An effective system of prevention and response to emerging food safety crisis should be in place to ensure safe food for the consumers.

The global agenda has focussed on food safety as an inalienable component of sustainable development through its contribution to food and nutritional security, facilitating market access and trade in food products.

Apart from the recognized common routes that compromise food safety, a large part of the public concern for food safety in Bangladesh stems from widespread malpractices applied in food handling including the addition of harmful chemical substances to food items. Addressing food safety is also complicated by the presence of a vast informal sector in food marketing and retail businesses, such as small-scale unregistered road-side restaurants and street food vending. Non compliance to good hygiene practice in street food businesses poses a significant threat to public health.

Prof. Shah Monir Hossain
Senior National Advisor
Food Safety Program, FAO-UN, Bangladesh

Ensuring safe and nutritious food for all is a constitutional obligation of the Government of Bangladesh as per Section 15(A) and Section 18(A) respectively of the Constitution of Bangladesh. Regulatory food control in Bangladesh was governed by the Bangladesh Pure Food Ordinance, 1959 and Pure Food Rules, 1967. However, in October 2013 the National Parliament passed the Food Safety Act 2013 and thus the legislation to create an effective regulatory system for food safety in the country. The Act came into force in February 2015 thereby providing an opportunity to take significant steps towards co-ordinating food safety activities from farm to table.

The Government of Bangladesh established Bangladesh Food Safety Authority (BFSA) to administer the Food Safety Act 2013. The authority is charged with the development of an integrated food safety and quality control system with clearly defined roles and responsibilities for the various ministries involved along the food chain to provide safe and good quality food for domestic consumers and international trade. The authority is responsible to regulate and monitor the activities related to the manufacture, import, export, processing, storage, distribution and sale of food. It is important to emphasise that the use of science-based evidence will be central to all decisions made by the BFSA.

The major challenge with this newly created agency is to foster good governance for the effective and efficient discharge of its roles and responsibilities as the national watchdog in the food safety control system. The effectiveness and efficiency of its activities will depend on how deep institutional restructuring is carried out to empower it with the needed authority and resources to support its emergence as the apex organization in the national food control system.

Since 2009, FAO-UN has provided technical support to the MoHFW with financial support from the EU (July 2009 to June 2012) and the Kingdom of the Netherlands (from July 2012 to December 2018) to improve the food safety situation in Bangladesh. A state-of-art laboratory namely National Food Safety Laboratory (NFSL) has been established at the Institute of Public Health (IPH) to analyze food for a wide range of chemical and microbiological contaminants. Technical support is being provided to improve the capacity of laboratory analysis by IPH analysts. Other activities of the program are addressing standards formulation, awareness raising, improving risk based inspection systems, establishing a food borne disease surveillance system and improving good practices in primary production and food value chains through science-based risk assessment.

Let us raise a voice against unsafe food and let us raise awareness on the need to follow good practices to keep our food safe for consumption.

নিরাপদ খাদ্যপ্রাপ্তি জনগনের অধিকার

এ, কে এম, নুরুল আফসার

জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য নিরাপদ খাদ্যপ্রাপ্তির অধিকার সুনিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ বিষয়। কেননা "নিরাপদতা" নিশ্চিত না হলে জনগনের খাদ্য নিরাপত্তাও নিশ্চিত হবে না। যদিও সরকার প্রাথমিকভাবে খাদ্য নিরাপত্তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে আসছিল কিন্তু সময়ের সাথে সাথে এ বিষয়টি পরিষ্কার হয়েছে যে, "পুষ্টি সমৃদ্ধ ও নিরাপদ খাদ্য" নিশ্চিত না হলে খাদ্য নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হবে না। পাশাপাশি নিরাপদ খাদ্য সংক্রান্ত বিষয়ে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্পর্শকাতরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে সরকার ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (SFYF) এবং কৃষি, খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি বিষয়ক বিনিয়োগ কর্ম পরিকল্পনায় (কাস্ট্রি ইনভেস্টমেন্ট প্যান) নিরাপদ খাদ্যকে গুরুত্ব দিয়েছে।

খাদ্যকে ভেজালমুক্ত ও নিরাপদ করার জন্য সময়সময় বিভিন্ন আইন জারি করা হয়েছে। তদানীন্তন পাকিস্তানে সামরিক আইন জারির পরপরই খাদ্যকে ভেজালমুক্ত করার জন্য বেঙ্গল অ্যাক্ট ০৬, ১৯১৯ এবং আসাম অ্যাক্ট ০১, ১৯৩২ বাতিল করে "পিওর ফুড অর্ডিনেন্স, ১৯৫৯" জারি করা হয়। এ আইনের আওতায় একাধিক মন্ত্রণালয়/সংস্থা বাস্তবায়নের কাজে নিয়োজিত ছিল এবং সমন্বয়হীনতার জন্য আইনটি জারি হওয়ার পর প্রায় অর্ধশত বছর পার হলেও অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছানো সম্ভব হয়নি। তাছাড়া বিভিন্ন নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও প্রয়োগের ফলে খাদ্য উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ মজুদ, সরবরাহ, বিপণন ও বিক্রয় এ দীর্ঘ "খাদ্য সিকল" (Food Supply Chain) অতিক্রম করে জনগণের নিকট খাদ্য (মাঠ হতে পাত) পৌছে থাকে। সুতরাং যেকোনো স্তরে খাদ্য অনিরাপদ হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। দেশে বিদ্যমান খাদ্য শৃঙ্খলের বিভিন্ন পর্যায়ে বিশেষ করে খাদ্য উৎপাদন থেকে প্রক্রিয়াকরণ পর্যন্ত খাদ্যকে জনসাধারণের জন্য নিরাপদ ও মানসম্মত হিসেবে তৈরির প্রতিটি ধাপে যথাযথ মান নিশ্চিত করা খুবই জরুরি। তাই বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির যথাযথ অনুশীলনের মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিতকরণে ১০ অক্টোবর ২০১৩-তে "নিরাপদ খাদ্য আইন,২০১৩" জারি করা হয় এবং সমস্ত খাদ্য নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়িত কার্যক্রম সমন্বয় ও পরিবীক্ষণের মাধ্যমে একটি দক্ষ ও কার্যকর কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে "বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ (BFSA)" ২রা ফেব্রুয়ারি ২০১৫-এ গঠন করা হয়। এ সংস্থার মূল দায়িত্ব আধুনিক "নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি" প্রচলন করার মাধ্যমে জনগণের স্বাস্থ্য নিশ্চিত করা।

খাদ্য নিরাপদতা কেন প্রয়োজন:

খাদ্য নিরাপদতা হচ্ছে খাদ্যকে বিভিন্ন ধরনের বিপত্তি থেকে রক্ষা করার সম্মিলিত পদক্ষেপ। খাদ্য বিপত্তিগুলো হলো-

১। ক্ষতিকর অণুজীব (Microbiological Contaminant):

২। রাসায়নিক, যেমন বালাইনাশক, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাজে ব্যবহৃত রাসায়নিক দ্রব্যসমূহের অবশিষ্টাংশ; এবং

৩। ভৌত উপাদান, যেমন- কাঁচ ভাঙা, ধাতব উপকরণ ইত্যাদি।

এই সমস্ত বিপত্তি খাদ্য সরবরাহ শিকলের যেকোনো পর্যায়ে ঘটতে পারে এবং খাদ্যকে অনিরাপদ ও ভোক্তার স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে পড়তে পারে। সুতরাং বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির যথাযথ অনুশীলনের মাধ্যমে এবং যুগোপযোগী খাদ্য প্রবিধানমালা জারি করে খাদ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিতকরণে BFSA-কে প্রতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার জন্য ইতোমধ্যে বেশ কিছু বিধি, প্রবিধান ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, যা খাদ্যকে নিরাপদ করতে সহায়তা করবে।

বিধি :

(ক) নিরাপদ খাদ্য (খাদ্যদ্রব্য জব্দকরণ ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ পদ্ধতি) বিধিমালা, ২০১৪।

(খ) বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ (কারিগরি কমিটি) বিধিমালা, ২০১৭।

এ, কে এম, নুরুল আফসার
ন্যাশনাল টিম লিডার, এফএও

প্রবিধান :

(ক) নিরাপদ খাদ্য (খাদ্যের নমুনা সংগ্রহ, পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ) প্রবিধানমালা ২০১৭

(খ) নিরাপদ খাদ্য (রাসায়নিক দূষক, টক্সিন ও ক্ষতিকর অবশিষ্টাংশ) প্রবিধানমালা ২০১৭

(গ) নিরাপদ খাদ্য (খাদ্য-সংযোজন দ্রব্য) প্রবিধানমালা,২০১৭

(ঘ) নিরাপদ খাদ্য (স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াকরণ) প্রবিধানমালা ২০১৬

(ঙ) বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ (কর্মচারী) চাকুরী প্রবিধানমালা ২০১৬

(চ) নিরাপদ খাদ্য (মোড়কাবদ্ধ খাদ্য লেবেলিং) প্রবিধানমালা ২০১৭

প্রশিক্ষণ :

গতানুগতিক পদ্ধতির পরিবর্তে "ঝুঁকিভিত্তিক পরিদর্শন" ও বিজ্ঞানভিত্তিক পরামর্শ প্রদান ও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে এর লক্ষ্য। এই পদ্ধতির প্রধান উপকারিতা হচ্ছে মূল বিপত্তি চিহ্নিতকরণ ও জনস্বাস্থ্যের অধিক নিরাপদতা বিধান করা। আধুনিক পরিদর্শণ কাজের মূল গুরুত্ব হচ্ছে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পরামর্শের মাধ্যমে ব্যবসাকে সহায়তা প্রদান এবং প্রয়োজনের ক্ষেত্রে এর যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করা। এতে খাদ্য ব্যবসার সাথে যারা জড়িত আছেন তাঁরা উপকৃত হবেন।

ইতোমধ্যে ৬১৫ জন বিভিন্ন দপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং খাদ্য শিল্প প্রতিষ্ঠান/রেস্টুরেন্ট মালিক/কর্মচারীগণকে নিরাপদ খাদ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে, যার মধ্যে ২৪২ জন নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শক অন্তরর্ভুক্ত। নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শকগণকে ঝুঁকিভিত্তিক পরিদর্শনসহ নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনার ওপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

জনসচেতনতা সৃষ্টি :

ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে রক্ষা করতে নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের বিকল্প নেই। আইন প্রয়োগের পাশাপাশি এক্ষেত্রে ব্যাপক জনসচেতনতাও গড়ে তুলতে হবে। উৎপাদনের মাঠ থেকে খাবার টেবিল পর্যন্ত সর্বক্ষেত্রে নিরাপদ খাবার নিশ্চিতকরণে আমাদের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হতে হবে। কৃষকদের সচেতন ও দক্ষ করে গড়ে তুলতে হবে। সার ও কীটনাশক ব্যবহার, খাদ্যদ্রব্যের প্রক্রিয়াজাত ও প্যাকেটজাতকরণ, সরবরাহ ব্যবস্থা, সংরক্ষণসহ খাদ্য শৃঙ্খলের প্রতিটি ক্ষেত্রকে নিরাপদ রাখতে আমাদের দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে।

নিরাপদ খাদ্য সংক্রান্ত বিষয়ে জনমনে নানা ধরনের ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি হয়েছে যার কোনো বিজ্ঞানভিত্তিক তথ্য প্রমাণ নেই। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, শাকসবজি ও ফলমূলে ফরমালিনের ব্যবহার হয় বলে জনমনে একটি ভিত্তি কাজ করেছে যার কিনা বিজ্ঞানি-ভত্তিক তথ্য/প্রমাণ নেই। কেননা ফরমালিন কেবল আমিষ জাতীয় খাদ্যদ্রব্যের ওপর কাজ করে। এ সমস্ত ভ্রান্ত ধারণা দূর করার লক্ষ্যে দৈনিক পত্রিকাগুলোতে গণবিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে কর্মশালার মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করার ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে এবং হচ্ছে।

খাদ্য নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থাগুলোর সাথে সমন্বয় :

অন্তসংস্থাগুলোর সাথে সমঝোতার ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করে ইতিমধ্যে তিনটি সংস্থার সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা হয়েছে এবং আরও প্রায় পাঁচটি সংস্থার সাথে সমঝোতা স্বাক্ষর করার বিষয়ে চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। এ সমস্ত সমঝোতার মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে সমন্বয় করা হবে। নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য ইতোমধ্যে বিধি, প্রবিধান, গাইডলাইন, সাংগঠনিক কাঠামো প্রণয়নসহ আনুষঙ্গিক কার্যক্রমের মাধ্যমে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের উদ্যোগসমূহ দৃশ্যমান হচ্ছে।

উপসংহার :

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ (BFSA) কে প্রতিষ্ঠানিকভাবে একটি দক্ষ ও যোগ্য কর্তৃপক্ষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য একটি পাঁচ বছসর মেয়াদি কৌশলগত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং তা বাস্তবায়নের জন্য জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা কারিগরি সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে BFSA-কে সেন্টার অব এক্সসিলেন্স হিসেবে গড়ে তোলার জন্য কাজ করছে। নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য ইতোমধ্যে বিধি, প্রবিধান, গাইডলাইন, সাংগঠনিক কাঠামো প্রণয়নসহ আনুষঙ্গিক কার্যক্রমের মাধ্যমে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের উদ্যোগসমূহ দৃশ্যমান হচ্ছে। আশা করা যায় নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে BFSA জনগণের জন্য খাদ্য নিরাপত্তা দিতে সক্ষম হবে এবং একটি আত্মনির্ভর প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারবে বলে আমরা দৃঢ়বিশ্বাস।

নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণ

শ্যামল দত্ত

ভূমিকা:

আধুনিক রাষ্ট্রের নাগরিকের মৌলিক অধিকারগুলোর মধ্যে প্রধান একটি হলো খাদ্যের অধিকার। নিরাপদ খাদ্যের নিশ্চয়তা এর মধ্যেই পড়ে। কিন্তু দেশে দেশে এ অধিকার বিভিন্নভাবে ক্ষুণ্ন হচ্ছে। আমাদের দেশেও এ অধিকার পূর্ণমাত্রায় সুরক্ষিত নেই। খাদ্য অনিরাপদ হয় দূষণ ও ভেজালের কারণে। মূল খাদ্যদ্রব্য থেকে যদি ইচ্ছাকৃতভাবে কিছু সরিয়ে নেয়া হয় কিংবা নতুন কিছু যোগ করা হয়, যা আমাদের মানবস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বা এর পুষ্টিমান কিংবা গুণাগুণ নষ্ট হয়ে যায়, তাকে আমরা ভেজাল খাদ্য বলি। আর যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে খাদ্য দূষিত হয়ে যায়, তখন আমরা তাকে বলি দূষণ। সেটা হতে পারে অণুজৈবিক কিংবা রাসায়নিক দূষণ। খাদ্য স্বভাবিক এবং ভেজাল ও অন্যান্য দূষণ থেকে নিরাপদ অবস্থায় ভোক্তার হাতে পৌঁছানো এখন একটি বৈশ্বিক সমস্যা। পিছিয়ে পড়া দেশগুলোর ক্ষেত্রে এই সমস্যা আরো বেশি প্রকট। নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে খাদ্যে ভেজাল ও দূষণের উৎস চিহ্নিত করা, এর ঝুঁকিগুলো সম্পর্কে জানা এবং ভেজাল-দূষণ রোধে আমাদের করণীয় নির্ধারণ– এসবই মূলত এখন আমাদের আলোচ্য বিষয়।

খাদ্যে দূষণ ও ভেজাল:

নানা কারণে খাদ্য দূষিত হতে পারে। খাদ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, পরিবহন, খাদ্যগ্রহণ প্রক্রিয়ার যে কোনো পর্যায়ে শিল্পায়িত খাদ্য গ্রহণের অনুপযোগী হয়ে যেতে পারে। খাদ্যদ্রব্যে উৎপাদন পর্যায়ে কীটনাশক বা বালাইনাশক, সংরক্ষণ পর্যায়ে পচনরোধক ও প্রক্রিয়াজাতকরণের পর্যায়ে পুষ্টিবর্ধক ও স্থায়িত্ববর্ধক হিসেবে বিভিন্ন রাসায়নিক ব্যবহার করা হয়। আমাদের দেশেও আমরা লক্ষ করছি, দিন দিন এসবের ব্যবহার বাড়ছে। যথাযথ পরিমাণে ব্যবহার করা হয় না বলে তা উৎপাদিত পণ্যকে দূষিত করে, যা গ্রহণ মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকির কারণ হতে পারে।

আর বর্তমানে খাদ্যে ভেজাল মেশানো একটি নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। চাল, আটা, লবণ, চিনি, ভোজ্য তেল, আলু, দুধ থেকে শুরু করে রুটি, কেক, মিষ্টি, বিস্কুট কিছুই ভেজাল থেকে বাদ যায় না। আমাদের প্রধান খাদ্যশস্য চাল। এই চালের সাথে মেশানো হয় কাঁকর। জানা গেছে, একশ্রেণির ব্যবসায়ী নিম্নমানের চালের সাথে ইউরিয়া সার মেশান। এতে খুব সহজেই নিম্নমানের চাল হয়ে যায় অত্যন্ত পরিষ্কার এবং দেখতে মনে হয় অনেক উন্নতমানের। তেলে মেশানো হয় কৃত্রিম রং ও ঝাঁজ, মসলায় ইটের গুঁড়ো, ঘিতে আলু। এ তালিকা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে। এমনকি বাদ যাচ্ছে না শিশুখাদ্যও।

কয়েক সপ্তাহ আগেই আমরা জানতে পারলাম একটি ভয়াবহ তথ্য। রাজধানীতে জারের পানিতে রয়েছে প্রাণঘাতী জীবাণু। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের (বিএআরসি) একদল গবেষক জানিয়েছেন, রাজধানীর বাসাবাড়ি, অফিস-আদালতে সরবরাহ করা ৯৭ ভাগ জারের পানিতে ক্ষতিকর মাত্রায় মানুষ ও প্রাণীর মলের জীবাণু 'কলিফর্ম' রয়েছে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, কলিফর্ম বিভিন্ন রোগ সৃষ্টিকারী প্যাথোজেন, যেমন– ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস ও প্রোটাজোয়ার সৃষ্টিতে উৎসাহ জোগায় বা সৃষ্টি করে। বিভিন্ন রোগ সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়া মানবদেহে নানাবিধ রোগ সৃষ্টি করে ক্রমাগত মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট করে দেয়। ফলস্বরূপ পরবর্তী সময়ে যেকোনো রোগ সৃষ্টিকারী অণুজীব দ্বারা এই দেহ খুব সহজেই আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা বেড়ে যায়। নগরীর অফিস আদালত থেকে হোটেল রেস্তোরাঁ সবখানেই জারের পানি সরবরাহ করা হচ্ছে। এ চাহিদা পূরণে গলি ঘুপচিতে গড়ে উঠেছে পানি জারে ভরে সরবরাহ করার কারখানা। তারা নিয়মানুগ পরিশোধনের তোয়াক্কা না করেই জমজমাট ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন। কেবল জারের পানিতে প্রাণঘাতী জীবাণুর উপস্থিতিই নয়, বাজারে থাকা বিভিন্ন কোম্পানির বোতলজাত পানিতেও বিএসটিআই নির্ধারিত মান না পাওয়ার তথ্য ওঠে এসেছে। এগুলো তো সরবরাহ করছে বড় বড় প্রতিষ্ঠান। এই চিত্র যে জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হুমকিস্বরূপ তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

খাদ্যমান নিয়ন্ত্রণ:

আধুনিক জীবনে শিল্পজাত খাদ্য একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। উৎপাদিত খাদ্যসামগ্রীর যথাযথ মান নিশ্চিত করা খাদ্যশিল্প সংশ্লিষ্ট সবার দায়িত্ব। খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রতিষ্ঠানসমূহ এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য আধুনিক মান নির্ধারণ ব্যবস্থাপনা করতে আইনগতভাবে বাধ্য। কিন্তু তারা সেটা করছে কিনা তা কীভাবে নিশ্চিত করা হবে? সরকারের নীতি, আইন-কানুন, তার প্রাতিষ্ঠানিক কর্মতৎপরতা– এসবের মাধ্যমেই এটা নিশ্চিত হবে। খাদ্য উৎপাদন ক্ষেত্র থেকে শুরু করে ভোক্তার দ্বার পর্যন্ত খাদ্যের গুণগত মান নিশ্চিত রাখা সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও দপ্তরের দায়িত্ব।

শ্যামল দত্ত
সম্পাদক, ভোরের কাগজ

নোংরা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাবার তৈরি ও বাজারজাতকরণও স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি করে। নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক আলোচনায় আরেকটি বিষয় অনেক সময়ই দৃষ্টির আড়ালে থেকে যায়, তা হলো বাজারের পরিবেশ। আমাদের দেশে অধিকাংশ কাঁচাবাজার অপরিচ্ছন্ন ও অস্বাস্থ্যকর। এই পরিবেশ খাদ্যপণ্যের মানের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে, অনেক সময় খাদ্যকে দূষিত করে। এভাবে খাদ্য দূষণের ঝুঁকি এড়াতে কাঁচাবাজারগুলোকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও দূষণমুক্ত রাখার দিকে সচেষ্ট হওয়া দরকার।

নীতি ও বিধিবিধান:

বাংলাদেশে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে নীতি ও বিধিবিধান কিন্তু কম নেই। নিরাপদ খাদ্যের বিষয়টি সরকারের সংশ্লিষ্ট সকল নীতিতে যথাযোগ্য গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এ নীতিগুলো হচ্ছে: বাংলাদেশ পরিবেশ নীতি-১৯৯৮; বাংলাদেশ খাদ্য ও পুষ্টি নীতি-১৯৯৭; এবং জাতীয় পুষ্টি নীতি-১৯৯৭; বাংলাদেশ খাদ্য নীতি-১৯৯৮; ব্যাপক খাদ্য নিরাপত্তা নীতি-২০০১ এবং নতুন জাতীয় খাদ্য নীতি-২০০৬; জাতীয় কৃষি নীতি-১৯৯৯, বাংলাদেশ স্বাস্থ্য নীতি-২০০১; এবং রপ্তানি নীতি ইত্যাদি।

নিরাপদ খাদ্য সংক্রান্ত বিধিবিধানগুলোর মধ্যে উল্লেখ করা যায়– বাংলাদেশে নিরাপদ খাদ্য সংক্রান্ত আইন ও বিধি বিশুদ্ধ খাদ্য অধ্যাদেশ-১৯৫৯ এবং বিশুদ্ধ খাদ্য বিধিমালা-১৯৫৭; পশু জবাই (বিধিনিষেধ) এবং মাংস নিয়ন্ত্রণ (সংশোধনী) অধ্যাদেশ-১৯৮৩; বিএসটিআই অধ্যাদেশ-১৯৮৫ (সংশোধনী আইন, ২০০৩); ধ্বংসকারী পোকামাকড় বিধি (প্লান্ট কোয়ারেনটাইন)-১৯৬৬ (১৯৮৪ পর্যন্ত সংশোধিত); কৃষিপণ্য বাজার আইন-১৯৬৪ (সংশোধিত ১৯৮৫); মৎস্য সুরক্ষা ও সংরক্ষণ আইন-১৯৫০ (সর্বশেষ সংশোধনী ১৯৮৫); সামুদ্রিক মৎস্য অধ্যাদেশ-১৯৮৩ এবং বিধি-১৯৮৩; মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য (পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ) বিধি-১৯৯৭; জরুরি পণ্য আইন-১৯৫৭, ১৯৫৮ ও ১৯৬৪; খাদ্য বা বিশেষ আদালত আইন-১৯৫৬; খাদ্যশস্য সরবরাহ (ক্ষতিকর কার্যাবলি নিরোধ) অধ্যাদেশ-১৯৫৬; পোকামাকড় ধ্বংসকারী ঔষধ অধ্যাদেশ-১৯৭১ এবং এ সংক্রান্ত বিধি-১৯৮৫ ইত্যাদি। ২০১৩ সালে পাসকৃত 'নিরাপদ খাদ্য আইন'টি বিস্তারিত কিছু বলার অবকাশ রয়েছে।

নিরাপদ খাদ্য আইন ও নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ :

২০১৩ সালের ১০ অক্টোবর জাতীয় সংসদ নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করতে নিরাপদ খাদ্য আইন অনুমোদন করে। আর আওতায় নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ গঠন ও পরিচালিত হওয়ার কথা। দীর্ঘসূত্রতা পেরিয়ে ২০১৫ সালের ২ ফেব্রুয়ারি নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ গঠিত হয়। তবে যতদূর জানা যায়, এখন পর্যন্ত জনবল দেয়া হয়নি। সরকারের বিভিন্ন দপ্তর থেকে 'ধারদেনা' করে জোড়াতালি দিয়ে চালানো হচ্ছে কর্তৃপক্ষ। সাংগঠনিক কাঠামোই এখনো চূড়ান্ত হয়নি। সাংগঠনিক কাঠামো ছাড়াই স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের স্যানিটারি ইন্সপেক্টররা কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে কাজ করছেন। তা ছাড়া জানা গেছে দেশের ৬৪টি জেলায় বিশুদ্ধ খাদ্য আদালত নির্ধারণ করা হয়েছে। আমরা জানি না এগুলো কবে কার্যকর হবে। নীতি ও আইন-কানুনের উপস্থিতিই যে যথেষ্ট নয়, তা এদেশের অন্য সকল ক্ষেত্রের মতো এ ক্ষেত্রেও প্রমাণিত। প্রয়োজন আইনের যথাযথ প্রয়োগ ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো কার্যকর রাখা। বলতেই হয়, নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ দুই বছরেও কাঙ্ক্ষিতভাবে কার্যকর না হওয়া দুঃখজনক। আমরা চাই দ্রুততম সময়ের মধ্যে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষিত জনবল জোগান দিয়ে প্রতিষ্ঠানটি কার্যকর করা হোক।

আমাদের করণীয়:

উৎপাদন ক্ষেত্র থেকে ভোক্তার টেবিল পর্যন্ত এই দীর্ঘ চেইনে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে হলে আমরা দেখছি অন্তত তিনটি ধাপে প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। প্রথমত নিয়ন্ত্রক সংস্থা। যারা মান নির্দিষ্ট করে দেবেন। যেমন সার, কীটনাশক, ফল পাকানোর রাসায়নিক ইত্যাদির মাত্রা নির্দিষ্ট করে দেয়া। এই মান সংরক্ষণ করা হচ্ছে কিনা তা মনিটর করা, এ সংক্রান্ত আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করা এই নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষগুলোর দায়িত্ব। কাজেই সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকে সক্রিয় রাখতে হবে। দ্বিতীয় ধাপে রয়েছে উৎপাদক ও বাজারজাতের সঙ্গে জড়িতরা। তাদেরকে দূষণ-ভেজাল ও জনস্বাস্থ্যে এর প্রভাব সম্পর্কে জানাতে হবে, ওয়াকিবহাল করতে হবে এ সংক্রান্ত রক্ষণীয় মান এবং পালনীয় বিধিবিধানগুলো সম্পর্কে। এই জানানোর কাজটা করতে হবে কর্তৃপক্ষকে। শেষ ধাপে রয়েছেন ভোক্তারা। তাদের সচেতনতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ভোক্তা যদি সচেতন থাকেন, তাহলে দূষণযুক্ত ও ভেজাল খাদ্য গ্রহণ থেকে কিছুটা হলেও রেহাই পাওয়া যাবে। আমরা অনেক সময় লক্ষ্য করি, কিছু ভুল তথ্য গুজব ইত্যাদি ছড়িয়েও ভোক্তাদের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি করা হয়। ভোক্তাদের কাছে সঠিক তথ্য সরবরাহ একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। ভোক্তা সচেতনতা আপনা আপনি তৈরি হবে না। এদের সচেতন করার জন্য উদ্যোগ নিতে হবে। সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে এই সচেতনতা কার্যক্রম চলতে পারে।

উপসংহার:

খাদ্যে দূষণ-ভেজালের বিস্তৃতি, প্রকৃতি, পরিণাম এসব নিয়ে বিশেষজ্ঞ মহলের অনুসন্ধান অব্যাহত। এর অনেককিছুই আমরা সাধারণের অজানা। যেটুকু জানা যাচ্ছে তাতেই সবাই উদ্বিগ্ন শুধু নয়, শঙ্কিতও। জানতেও পারছি না প্রাণ রক্ষার্থে আমরা যা কিছু গ্রহণ করছি তা প্রাণঘাতী কিনা। নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করা এখন একটি বৈশ্বিক সমস্যা। পৃথিবীর সব দেশই নিরাপদ ব্যাপারে সচেতন এবং মান সংরক্ষণে আধুনিক ব্যবস্থাদি গ্রহণ করছে। আমাদেরও পিছিয়ে থাকার সুযোগ নেই। এর জন্য দরকার সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকে সচল করা। এ সংক্রান্ত কাজে প্রশিক্ষিত জনবল ও আধুনিক প্রযুক্তির সমাবেশ ঘটানো ও আইনের কঠোর প্রয়োগ। সর্বোপরি জনসচেতনতা বৃদ্ধি। ভেজাল খাদ্যের ভয়াবহতা ও ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া জনগণের সামনে তুলে ধরার জন্য ব্যাপক প্রচারণা ও জনসচেতনতা বাড়াতে হবে। ভেজাল ও বিপজ্জনক খাদ্য বিক্রেতা ও প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের মালিকদের বিরুদ্ধে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো উচ্চ শাস্তির বিধান রেখে আইন প্রণয়ন ও তা কার্যকরের দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে।

জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন ও নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনে মৎস্যখাতের গুরুত্ব ও ভবিষ্যতের জন্য প্রাধিকারসমূহ

সৈয়দ মাহমুদুল হক

বাংলাদেশ ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা উত্তরকালে বিশেষ করে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে খাদ্য উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য উন্নতি অর্জনে সক্ষম হয়েছে। আমাদের খাদ্য উৎপাদন এখন দেশের ক্রমবর্ধমান জনগণের খাদ্য চাহিদা দেশজ উৎপাদন দ্বারাই মেটাতে অনেকটাই সক্ষম। বিশেষ করে কৃষিক্ষেত্রে অব্যাহত উন্নয়ন এ অর্জনে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশ মৎস্য সম্পদ উৎপাদনের ব্যাপারেও ঈর্ষণীয় অগ্রগতি অর্জন করেছে। এ খাত কেবল দেশের জনগণের ৬০ শতাংশ আমিষের প্রয়োজনই মেটাচ্ছে না, অধিকন্তু দেশের খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন, সার্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, জাতীয় আয়, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ও রপ্তানি আয় বৃদ্ধিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। মৎস্যখাতের এ বহুমুখী অবদান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে বলে আশা করা যায়। তবে অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশের মৎস্যখাতের সার্বিক উৎপাদন, মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণনের সাথে আমাদের জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের বেশ কয়েকটি প্রাধিকারই অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। জাতীয় পর্যায়ে নিরাপদ মৎস্য উৎপাদন ও বিপণনে সক্ষম না হলে বাংলাদেশ খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে সক্ষম হবে না এবং দেশের জনগণের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় এক বিরাট চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হবে। তাছাড়া নিরাপদ মৎস্য উৎপাদনে সক্ষম না হলে, মৎস্য ও মৎস্যজাত দ্রব্যাদি রপ্তানি করে অধিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্ভব হবে না। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ বর্তমানে শুধু চিংড়ি রপ্তানী করেই প্রতি বছর প্রায় ৫০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমমূল্যের বৈদেশিক মুদ্রা আয় করছে যা জাতীয় প্রবৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। ভবিষ্যতে মৎস্য ও চিংড়ি খাত থেকে উৎপাদন বৃদ্ধি করে রপ্তানি আয় আরও বাড়ানো সম্ভব যদি বাংলাদেশের উৎপাদিত পণ্যের উৎপাদনের উৎস স্থল হতে সরবরাহ শিকলের বিভিন্ন স্তরে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন নিশ্চিত করা যায়।

তবে এটা অবশ্যই বলার অপেক্ষা রাখে না যে, পৃথিবীর যেকোনো দেশের পক্ষেই খাদ্যের গুণগতমান বজায় রেখে দূষণমুক্ত নিরাপদ খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা সহজসাধ্য নয়। বিশ্বের সব দেশেই এ সংক্রান্ত উদ্যোগসমূহকে নানাবিধ জটিলতার সম্মুখীন হতে হয়। বাংলাদেশও এর কোন ব্যতিক্রম নয় এবং বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তা, বিশেষ করে মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের খাদ্য নিরাপত্তা ও নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন নিশ্চিত করার পথে নানাবিধ সমস্যা ও প্রতিকূলতা মোকাবিলা করতে হয়। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য উৎপাদনের প্রতিটি ক্ষেত্রসহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণনে উন্নত স্বাস্থ্যসম্মত উৎপাদন পদ্ধতির প্রয়োগ করা অত্যাবশ্যক। উৎপাদিত খাদ্যদ্রব্যে উৎপাদন ও বিপণন পর্যায়ে ক্ষতিকর উপাদান ব্যবহার না করা এবং সর্বোপরি পরিবহন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণনের সময় খাদ্যের গুণগত মান ক্ষতিগ্রস্ত ও দূষিত করে, এরকম কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ বাঞ্ছনীয় নয়। পৃথিবীর যে সব দেশ নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন নিশ্চিতকরণে প্রভূত উন্নতি করেছে ওই সকল দেশে খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ে যে সকল আইন-কানুন ও নিয়ম-নীতি মেনে চলতে হয় এবং উৎপাদিত খাদ্যের মান (STANDARD) কি হওয়া উচিত তার সুনির্দিষ্ট মাত্রা, বিবরণ, প্রাসঙ্গিক আইন ও যে সকল প্রযোজ্য নীতিমালা সন্নিবেশিত করা হয়েছে এবং প্রায়োগিক অর্থে তা কঠোরভাবে পালন করার ব্যবস্থাও গ্রহণ করেছে, বাংলাদেশেরও যে সকল আইন-কানুন পরীক্ষা নিরীক্ষা করে কতটা অনুসরণ করা যায় তা যাচাই করা জরুরি। নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনে যে সকল দেশ সফলতা অর্জন করেছে, সেই সকল দেশের সরকার কর্তৃক নিযুক্ত সুনির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করছে এবং এ লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি খাতের করণীয় বিষয়ে সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা প্রদান করছে এবং প্রতিপালিত বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবেই বিবেচনা করছে এবং সে আলোকেই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করছে।

আমরা যদি নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনের দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশের মৎস্যখাতের দিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ করি, তাহলে দেখা যাবে যে, অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশের মৎস্যখাতে উৎপাদিত মাছের বিভিন্ন প্রজাতি ও নিরাপদভাবে মৎস্য উৎপাদনের বিবেচ্য বিষয়গুলো- যেমন মাছের রোগবালাই ও ব্যাকটেরিয়াজনিত সমস্যা, রাসায়নিক অপদ্রব্যের ব্যবহার ও প্রক্রিয়াজাতকরণের সময় অস্বাস্থ্যকর ও ক্ষতিকর কার্যাবলির জন্য জনস্বাস্থ্যের ও রপ্তানির জন্য হুমকির প্রধান কারণ। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মৎস্য উৎপাদনে অস্বাস্থ্যকর নিম্নমানের মৎস্য খাদ্যের ব্যবহার ও মাছ উৎপাদনের জলাধারগুলোতে ক্ষতিকর শিল্পবর্জ্যের নির্গমনও নিরাপদ মৎস্য উৎপাদনের অন্তরায় হিসেবে দেখা গেছে।

প্রকৃত অবস্থায় এসব সমস্যা থেকে বাংলাদেশের মৎস্যখাতকে মুক্ত রাখতে হলে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে সুনির্দিষ্ট উদ্যোগ নেয়ার কোনো বিকল্প নেই। এজন্য দরকার এ খাতের সাথে জড়িত সকল গোষ্ঠীর সমন্বিত প্রচেষ্টার এবং এ প্রচেষ্টার পরিধি বিস্তৃত হতে হবে মাছ উৎপাদন ও বিপণনের প্রতিটি স্তরে। মৎস্য উৎপাদনকারী, মৎস্য উৎপাদনে ব্যবহৃত উপাদানাবলি, মৎস্য বিপণন ও প্রক্রিয়াজাতকরণসহ সকল পর্যায়েই নিরাপদ মৎস্যপণ্য উৎপাদনের বিষয়গুলো সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগের উদ্যোগের প্রয়োজন রয়েছে। দেরিতে হলেও বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ (BFSA) গঠন দেশে খাদ্য নিরাপত্তা এবং নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনের উদ্দেশ্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে মৎস্য খাতের সকল সংশ্লিষ্টরা মনে করেন ।

সৈয়দ মাহমুদুল হক
চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ শ্রিম্প এ্যান্ড ফিশ ফাউন্ডেশন

BFSA-এর উদ্যোগগুলোকে সর্বাঙ্গীণভাবে সাহায্য করতে এ খাতের সাথে জড়িত সকল জনগোষ্ঠী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বাংলাদেশ শ্রিম্প ও ফিশ ফাউন্ডেশন (BSFF) এব্যাপারে মৎস্য অধিদপ্তরের সহযোগিতায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে এবং ভবিষ্যতে আরও অধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে আগ্রহী। সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি পর্যায়ে BSFF এ কাজে নিজেদের সম্পৃক্ত করছে এজন্য ইতোমধ্যেই BSFF ও BFSA যৌথভাবে একটি সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে, যা নিরাপদ মৎস্য ও মৎস্যপণ্য উৎপাদনের জাতীয় উদ্যোগকে জোরদার করবে বলে আশা করা যায়।

বর্তমানে মৎস্য অধিদপ্তরের সাথে যৌথভাবে মৎস্যখাতে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনে চলমান প্রক্রিয়াকে আরও জোরালো করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। BSFF ও আমেরিকার ম্যারিল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে JIFSAN (Joint Institute for Food Safety and Applied Nutrition)-এর সাথে সম্পাদিত সমঝোতা চুক্তির আওতায় উন্নত চাষ ব্যবস্থার (Good Aquaculture Practice - GAqP) ওপরে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য Global Aquaculture Alliance (GAA)-এর সাথে পরামর্শ করে একটি প্রশিক্ষণ মডিউল প্রণয়ন করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, JIFSAN হচ্ছে University of Maryland এবং US Food and Drug Administration (USFDA)-এর একটি যৌথ প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানটি নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনের বিভিন্ন উন্নত কলাকৌশলের ওপর স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। JIFSAN-এর সহায়তায় তৈরি প্রশিক্ষণ মডিউলে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নিরাপদ খাদ্য কীভাবে উৎপাদন করতে হয় এবং এজন্য পরিবেশসম্মত ও সামাজিক দায়বদ্ধতা অনুসরণ করে উন্নত চাষ ব্যবস্থা কীভাবে দেশে প্রবর্তন করা যায় তার ওপরেই জোর দেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে এই মডিউল ব্যবহার করে ২০১৪ থেকে ২০১৭ সালের মধ্যে প্রায় ১৭০০০ জন মৎস্য ও চিংড়ি চাষিকে, বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তাদের উন্নত চাষ ব্যবস্থার (GAqP)-ওপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে এবং মৎস্য-অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ১০৬ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষক হিসাবে প্রশিক্ষণ (Training of Trainers-ToT) দেয়া হয়েছে। JIFSAN ও USFDA-এর যৌথ উদ্যোগে BSFF এর প্রচেষ্টায় ২২ জন কর্মকর্তাকে আন্তর্জাতিকমানের HACCP-এর প্রশিক্ষক হিসেবে প্রশিক্ষণ (Training of Trainers -ToT) দেয়া হয়েছে। BSFF-এর উদ্যোগে বাংলাদেশের বেশ কটি বিশ্ববিদ্যালয়ে সংশ্লিষ্ট পাঠ্যসূচিতে উন্নত চাষ ব্যবস্থাপনা (GAqP)-শীর্ষক কোর্সও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এখানে উল্লেখ্য যে, BSFF কর্তৃক প্রণীত (GAqP) প্রশিক্ষণ মডিউলের মৌলিক নীতিমালাগুলো হলো: খাদ্যের নিরাপদ উৎপাদন, পরিবেশসম্মত টেকসই উন্নয়ন এবং সামাজিক দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণ এবং এই একই নীতিমালার ওপর ভিত্তি করে এবং দেশের বিদ্যমান সংশ্লিষ্ট আইনের বিধান অনুসরণ করে চিংড়ি উৎপাদনের বিভিন্ন সরবরাহ শিকলের জন্য দশটি সুনির্দিষ্ট আচরণবিধি (Code of Conduct) মৎস্য অধিদপ্তরের সহযোগিতায় BSFF প্রণয়ন করেছে।

বিশ্ব খাদ্য সংস্থা (FAO)-এর সহযোগিতায় Food Safety Guidelines for Aquaculture Production and Supply Chain in Bangladesh-শীর্ষক একটি পুস্তক এবং Swiss Contact Katalyst-এর সহযোগিতায় Internal Control Guideline for Fish Aquaculture Value Chain in Bangladesh -শীর্ষক আরেকটি পুস্তক BSFF সম্প্রতি প্রণয়ন করেছে। এই দু'টি পুস্তক/ গাইডলাইনস্ যথাযথভাবে অনুসরণ করে মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য উৎপাদন করা হলে দেশের মৎস্যখাতে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, BSFF ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়াইয়ের MOANA TECHNOLOGY-এর মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির আওতায় মৎস্য অধিদপ্তরের সার্বিক তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশে নির্দিষ্ট রোগবালাইমুক্ত (Specific Pathogen Free-SPF) চিংড়ি পোনা উৎপাদন ও বিপণনের জন্য ব্যক্তিগতখাতে হ্যাচারিদেরও সাহায্য করার মাধ্যমে চিংড়িখাতে নিরাপদ চিংড়ি উৎপাদনের ব্যাপারে নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে রোগবালাইমুক্ত বাগদা চিংড়ি উৎপাদন কার্যক্রম শুরু হয়েছে, যা মানসম্পন্ন নিরাপদ চিংড়ি উৎপাদনে সহায়ক ভূমিকা রাখছে ।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সরকার, মৎস্য অধিদপ্তর, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও BSFF আমাদের উৎপাদিত রপ্তানিকৃত চিংড়িখাতে আমদানিকারী দেশসমূহ বিশেষ করে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে SANITARY এবং PHYTOSANITARY সংক্রান্ত নিয়মাবলির সাথে দেশের মৎস্যচাষের উৎপাদন ব্যবস্থা যাতে সাজুয্যপূর্ণ হয় সেজন্য বেশ কয়েকটি যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ উদ্যোগগুলোর সুফল ইতোমধ্যে এ খাত পেতে শুরু করছে। বাংলাদেশে বর্তমানে মৎস্য অধিদপ্তরের অধীনে আন্তর্জাতিক মানের তিনটি আঞ্চলিক টেস্টিং ল্যাবরেটরি স্থাপন করেছে। এ সকল পরীক্ষাগারে পরীক্ষিত চিংড়ির গুণগতমান আমদানিকারি দেশেসমূহে এবং দেশীয় ভোক্তাদের চাহিদা অনুসারে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে এবং মৎস্য অধিদপ্তরের এসব পরীক্ষাগারগুলোতে কাজ করার জন্য দক্ষ জনবলও গড়ে তোলা হয়েছে। BSFF এই দক্ষ জনবল গড়ার কাজে JIFSAN, University of Maryland, USA-এবং আইসল্যান্ডের United Nations University Fisheries Training Program (UNU-FTP)-এর সাথে যৌথভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এটা অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে মাননিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণের ফলে ইউরোপীয় ইউনিয়নের নিরীক্ষা দল সাম্প্রতিককালে নিরীক্ষার পর ইউরোপীয় ইউনিয়নের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশে থেকে রপ্তানিকৃত পণ্যের ক্ষেত্রে ইউরোপীয় প্রবেশ বন্দরে বাধ্যতামূলক পরীক্ষা পদ্ধতি (Analytical Testing) রহিত করেছে।

মৎস্যখাতে খাদ্য নিরাপত্তার জন্য ইতোমধ্যে BSFF এবং মৎস্য অধিদপ্তর যৌথভাবে অনেক গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ নিয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে E-Traceability। BSFF সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে মৎস্যখাতে দূষণমুক্ত পোনা উৎপাদনসহ উৎপাদনের সকল স্তর থেকে শুরু করে বিপণনের প্রতিটি পর্যায় পর্যন্ত E-Traceability প্রবর্তন করার জন্য মৎস্য অধিদপ্তরের সহযোগিতায় কাজ করে যাচ্ছে । E-Traceability সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হলে পণ্য উৎপাদনের প্রতিটি স্তরে কেবল যে শুধু উক্ত পণ্যের অবস্থা ও অবস্থান শনাক্তকরণই সম্ভব হবে তা নয়, বরং ইতোমধ্যে প্রণীত আচরণবিধি (Code of Conduct) অনুযায়ী উৎপাদনের প্রতিটি স্তরে স্বাস্থ্যসম্মত, পরিবেশবান্ধব ও সামাজিক দায়বদ্ধতা প্রতিপালিত হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত হওয়া সম্ভব হবে। ফলশ্রুতিতে বিদেশি ক্রেতা/ আমদানিকারকদের চাহিদা অনুসারে মানসম্মত উৎপাদিত পণ্যের প্রডাক্ট এবং প্রসেস সনদায়ন (Product & Process Certification) করা সহজতর হবে । সুষ্ঠুভাবে উল্লেখিত ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ ও প্রবর্তন করা হলে আন্তর্জাতিক বাজারেও বাংলাদেশের রপ্তানিযোগ্য পণ্যের ব্র্যান্ডিং (Branding) করা সম্ভব হবে এবং ভবিষ্যতে বাংলাদেশের মৎস্য ও মৎস্যপণ্য রপ্তানিতে ইতিবাচক প্রভাবসহ আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের পণ্যের চাহিদাও উত্তোরোত্তর বৃদ্ধি পাবে।

তবে এ উদ্যোগগুলো আরও বেগবান ও অর্থবহ করার প্রয়োজন রয়েছে। মৎস্য খাতে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন সুনিশ্চিত করার জন্য ইতোমধ্যে মৎস্য অধিদপ্তরের সাথে BSFF, ওয়ার্ল্ডফিশ, এটিসিপি/ক্যাটালিস্ট, সলিডারিডেড, বিপিসি যৌথভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে এবং বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে অবদান রেখেছে। তবে আমরা মনে করি জনসচেনতা বৃদ্ধির এ ধারাকে আরো জোরদার করতে হবে এবং এজন্য সমন্বিত জাতীয় উদ্যোগের প্রয়োজন রয়েছে। কেবলমাত্র অর্থবহ অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে এ ব্যাপারে আমরা ভবিষ্যতে সফল হতে পারব। এজন্য বেশ কিছু সুনির্দিষ্ট উদ্যোগ অবশ্যই আমাদের নিতে হবে । নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনের জন্য আমাদের আইনগত ও মাননিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত বিধিমালাগুলোকে সুনির্দিষ্ট সংশোধন, পরিমার্জন ও জোরদার করতে হবে। আইনের প্রয়োগেও সকলকে প্রয়াসী হতে হবে। মৎস্যখাতে অবশ্যই উন্নত ও স্বাস্থ্যসম্মত উৎপাদন পদ্ধতি প্রবর্তন এবং মৎস্য উৎপাদনে ক্ষতিকর অপ্রদ্রব্যের ব্যবহার রোধ করতে হবে। এ ব্যাপারে একদিকে জনসচেতনতা বৃদ্ধি অবশ্যই করতে হবে, অন্যদিকে আইনের প্রয়োগ ও তার ব্যত্যয়কেও কঠোরভাবে প্রতিরোধ ও দমন করতে হবে। মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণের সময়ও এর সাথে জড়িতদের অত্যন্ত সচেতন থাকতে হবে যাতে উৎপাদিত মাছের গুণগতমান ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। আমরা এ ব্যাপারে আশাবাদী যে, সাম্প্রতিক মাস ও বছরগুলোতে এজন্য গৃহীত সরকারি উদ্যোগগুলো সফল হলে এ খাতের প্রভূত উন্নতি হবে। ব্যক্তিগত খাত থেকেও এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করার জন্য আমরা আহ্বান জানাচ্ছি। এ বছরের জাতীয় নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন দিবসে আমাদের এ সম্বন্ধীয় জাতীয় উদ্যোগ নতুন দিকনির্দেশনা ও গতির সঞ্চার করবে বলে আশা করা যায়।

মৎস্যখাতের খাদ্য নিরাপত্তার উন্নয়ন ও নিশ্চিতকরণের জন্য জাতীয় কার্যক্রমকে আরও শক্তিশালী করার জন্য বেশ কয়েকটি সুনির্দিষ্ট উদ্যোগ নেয়ার প্রয়োজন রয়েছে। আমরা মনে করি এজন্য বাংলাদেশের 'FISH & FISH PRODUCTS INSPECTION AND QUALITY CONTROL RULES 1997' এবং এর ২০০৮-ও সংশোধিত আইনটিকে প্রয়োজনে আরও ব্যাপক সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যভিত্তিক কাজ করতে হবে এবং প্রয়োজনে আরও সংশোধন, সংযোজন , পরিমার্জন করে উন্নত করতে হবে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং মৎস্য অধিদপ্তরকে সংশ্লিষ্ট আইনের প্রাসঙ্গিকতা ও উন্নয়নের সব সুযোগ গ্রহণের জন্য একযোগে কাজ করতে হবে এবং এজন্য প্রয়োজনে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি ও ব্যক্তিগত উদ্যোগক্তাদের সম্পৃক্ত করতে হবে। বাংলাদেশকে অবশ্যই মৎস্যখাতে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য PREVENTIVE ও CONTROL APPROACH-র মাধ্যমে অন্যান্য খাদ্যোৎপাদনখাতের মতোই বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

উত্তম মৎস্য চাষ পদ্ধতি (BMP) এবং মাননিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত অন্যান্য পদক্ষেপগুলো সুচারুরূপে গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে। নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্তৃপক্ষগুলোর ক্ষমতায়ন এবং তাদের কাজের ব্যাপারে জনসাধারণকে নিয়মিত অবহিত করা ও এ সকল কাজের সাথে সম্পৃক্ত করা খুবই প্রয়োজনীয় বলে আমরা মনে করি। দেশের মাননিয়ন্ত্রণ পরীক্ষাগারগুলোর (Testing Lab) পরীক্ষা করার ক্ষমতা বৃদ্ধি ও প্রয়োজনে তার সংখ্যা বাড়ানোর ব্যবস্থা করা এবং এগুলোকে পরিচালনায় কর্মক্ষম দক্ষ জনসম্পদও আমাদের গড়ে তুলতে হবে। রোগবালাই বাহিত সমস্যাগুলো যা খাদ্য নিরাপত্তাকে বিপদগ্রস্ত করে তা সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করে মোকাবেলার জন্য যৌথভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এছাড়াও আমাদের দেশে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনের জন্য ক্ষতিকারক উপাদান ও দ্রব্যসমূহের আমদানি ও পাচার কঠোর হাতে বন্ধ করতে হবে। আমরা মনে করি খাদ্য নিরাপত্তার স্বপক্ষে বিশেষ করে মৎস্যখাতে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে সব পর্যায়ে ব্যাপক জনসচেতনতা গড়ে তুলতে হবে এবং এজন্য সব মাধ্যম, বিশেষ করে প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মাধ্যম, ভোক্তা, উৎপাদনকারী ও বিপণনকারীসহ সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থাকে একযোগে কাজের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে। প্রয়োজনে আমাদের শিক্ষক, ছাত্র, চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী, সমাজকর্মী ও অন্যদেরও এ ব্যাপারে বিশেষভাবে উদ্যোগ নেয়ার সুযোগ রয়েছে। আমাদের স্থানীয় প্রশাসন, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং উন্নয়ন সহযোগীদেরও আমরা এ ব্যাপারে বিশেষভাবে উদ্যোগ নেয়ার জন্য সুপারিশ করছি। বর্তমান প্রেক্ষাপটে এ খাতের উন্নয়নেরও যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। এ সুযোগ নেয়ার এখনই হচ্ছে আমাদের জন্য প্রকৃষ্ট সময়। আর এ সুযোগকে কাজে লাগাতে প্রয়োজন এ খাতের সাথে জড়িত সকলের যৌথ উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা।

টেকসই উন্নয়নের জন্য খাদ্য নিরাপত্তা

ড. শেখ মোহাম্মদ আব্দুর রউফ

বৈশ্বিক পরিবর্তনের প্রত্যয় নিয়ে ২০১৫ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের ৬৯তম সাধারণ অধিবেশনে ১৯৩টি সদস্য রাষ্ট্রের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তক্রমে টেকসই উন্নয়নের অভিলক্ষ্যসমূহ [Sustaiable Development Goals (SDGs)] গৃহীত হয়। ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত, পরিবেশ দূষণমুক্ত, সন্ত্রাসমুক্ত, সামাজিক ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে উন্নত বিশ্ব গড়ার প্রত্যয় নিয়ে মোট ১৭টি প্রধান অভিলক্ষ্য (Goals) নির্ধারণ করা হয়। প্রধান লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নের নিমিত্তে ১৬৯টি ছোট ছোট লক্ষ্যবস্তু (Targets) নির্ধারণ করা হয়। জাতিসংঘের প্রত্যেকটি উন্নত বা উন্নয়নশীল রাষ্ট্রই উল্লেখিত টেকসই উন্নয়ন অভিলক্ষ্যসমূহ (SDGs) ২০৩০ সালের মধ্যে বাস্তবায়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার নির্ধারিত সময়ের মধ্যে SDGs অর্জনের নিমিত্তে চলমান ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (২০১৬-২০২০) অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ভিন্ন ভিন্ন অভিলক্ষ্যসমূহে (SDGs) সর্বমোট ৪৭টি সমন্বিত উন্নয়ন লক্ষ্যবস্তু নির্ধারণ করেছে। বাংলাদেশ বিগত দশকে দারিদ্র্য বিমোচনে উল্লেখযোগ্য সফলতা অর্জন করেছে। নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই জাতীয় দারিদ্র্যসীমার (National Poverty Line) নিচে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর সংখ্যা আশানুরূপ পর্যায়ে নামিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে (তথ্য: বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন রিপোর্ট ২০১৬)। এতদসত্ত্বেও প্রায় সাড়ে বাইশ শতাংশ জনগোষ্ঠী এখনো দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে। ১৬ কোটি জনগোষ্ঠীর প্রায় এক-চতুর্থাংশ যারা এখনো দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মানোন্নয়নই এখন বড় চ্যালেঞ্জ। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় SDGs অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর অনুপাত আরও ৭.৪% কমিয়ে নিয়ে আসার দৃঢ় প্রত্যয় গ্রহণ করেছে। ২০৩০ সালের মধ্যে SDGs প্রতিশ্রুত উন্নয়ন অর্জনের প্রধান নিয়ামকসমূহ হচ্ছে সৎ এবং যোগ্য নেতৃত্ব, সঠিক পরিকল্পনা, অর্থের সংস্থান এবং সুস্থ-সবল কর্মঠ জাতি তাদের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে সক্ষম। একথা বাংলাদেশ তথা বিশ্বের সকল উন্নয়নশীল এবং উন্নত জাতিগোষ্ঠীর জন্যই সমানভাবে প্রযোজ্য। আর এ জন্যই বিশ্বব্যাপী টেকসই উন্নয়নের অভীষ্ট লক্ষ্যসমূহের (SDGs) প্রধান কয়েকটি অভিলক্ষ্য (Goals-1,2,3 and 6) সরাসরি সুস্থ-সবল জাতিগঠনের নিমিত্তেই গৃহীত হয়েছে। এছাড়া সকল অভিলক্ষ্যই (SDGs) মানব উন্নয়নের জন্য অত্যাবশ্যক। সুতরাং এ কথা অনস্বীকার্য যে, সুস্থ জাতি গঠন উন্নয়নের পূর্বশর্ত। আর সুস্থ জাতি গঠনের নিমিত্তে নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণের বিকল্প নেই। কেবল নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্যের সরবরাহ নিশ্চিত করার মাধ্যমেই সুষ্ঠ-সবল কর্মঠ জাতি গঠনের আশা করা যেতে পারে। অপুষ্টিকর (Unwholesome) দূষণযুক্ত (Contaminated) অস্বাস্থ্যকর (Unhealthy) খাদ্য ও পানীয় গ্রহণের মাধ্যমে সুস্থ-সবল, কর্মঠ জাতি নয়, বরং অসুস্থ, অক্ষম জাতি গঠন হবে। যাদের দ্বারা যে কোনো ধরনের উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন বা ব্যবস্থাপনা শুধু কঠিনই নয় বরং অসম্ভব। সাম্যক বিষয় বিবেচনায় নিয়েই জাতিরসংঘের খাদ্য ও কৃষি বিষয়ক অঙ্গসংগঠন [Food and Agriculture Organization (FAO)] ২০১৭ সালে ০৭ জুলাই সংস্থাটির এক সাধারণ সভায় প্রতিবছর ০৭জুন "বিশ্ব নিরাপদ খাদ্য দিবস" (World Food Safety Day) পালনের জন্য জাতিসংঘের প্রস্তাবনা প্রেরণ করে এই আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়েছে যে, জাতিসংঘের সাধারণ সভায় উক্ত দিবসকে "বিশ্ব নিরাপদ খাদ্য দিবস" (World Food Safety Day) হিসেবে ঘোষণার প্রস্তাব গৃহীত হবে। Food and Agriculture Organization (FAO)-এর কৃষি ও ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ বিভাগের পরিচালক Mr. Ren Wang এই আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, বিশ্বব্যাপী "বিশ্ব নিরাপদ খাদ্য দিবস" (World Food Safety Day) পালনের মাধ্যমে খাদ্য ও পানিবাহিত রোগ সম্পর্কে সরকার, জনগণ এবং খাদ্য প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সচেতনতা বৃদ্ধি করা যাবে। উক্ত দিবস পালনের মাধ্যমে ভোক্তাদেরকেও নিরাপদ খাদ্য গ্রহণ ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিষয়ে সচেতন করে তোলার পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব বলে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক বিশেষজ্ঞ এবং নেতৃবৃন্দ আশাবাদ ব্যক্ত করেন। জনগণের নিরাপদ খাদ্য ও পানীয় নিশ্চিত করার লক্ষ্য নিয়ে ইতোমধ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার জাতিসংঘসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য জাতীয় সংসদ ২০১৩ সালের ১০ অক্টোবর নিরাপদ খাদ্য আইন-২০১৩ পাস করেছে এবং ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ থেকে উক্ত আইনটি কার্যকর হয়েছে। উক্ত আইনের ধারাসমূহের ২৩ থেকে ৪২ পর্যন্ত এবং ধারা ৪৩ ও ৪৪এ যথাক্রমে নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিধিনিষেধ এবং খাদ্য প্রস্তুত ও বিপণনকারী ব্যবসায়ী/ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানসমূহের বিশেষ দায়-দায়িত্বের উল্লেখ আছে। উক্ত বিধি-বিধান পালনে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ব্যর্থ হলে নিরাপদ খাদ্যবিরোধী অপরাধী হিসেবে শাস্তি পেতে হবে।

উল্লেখিত নিরাপদ খাদ্য আইন-২০১৩-এর যথাযথ প্রয়োগ তথা জনগণের নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণের নিমিত্তে সরকার ২০১৫ সালের ০২ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ [Bangladesh Food Safety Authority (BFSA)] গঠন করে। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের [Bangladesh Food Safety Authority (BFSA)] বর্তমান চেয়ারম্যান জনাব মোঃ মাহফুজুল হকের সভাপতিত্বে ২০১৭ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর সংস্থাটির এক সভায় ২০১৮ সালের ২ ফেব্রুয়ারি সারা দেশে "নিরাপদ খাদ্য দিবস"(Food Safety Day) পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

ড. শেখ মোহাম্মদ আব্দুর রউফ
অধ্যাপক, ফলিত পুষ্টি ও খাদ্য প্রযুক্তি বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

বর্তমানকাল পর্যন্ত সরকার এবং সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপসমূহ পর্যবেক্ষণ করে এতটা আশাবাদ ব্যক্ত করাযায় যে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার দেশের জনগণের জন্য নিরাপদ খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করার ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এতদসত্ত্বেও দূষিত খাদ্য ও পানীয় (Contaminated Foods and Drinks) গ্রহণের ক্ষতিকর দিকসমূহ এবং নিরাপদ খাদ্য ও পানীয় গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জনসাধারণের সর্বজনীন সচেতনতা বৃদ্ধি ব্যতিরেকে জনস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা সম্ভবনায় এবং সঙ্গত কারণে ২০৩০ সালের মধ্যে SDGs অর্জন দুরূহ হতে পারে। প্রাসঙ্গিক কারণেই দূষণযুক্ত খাবার ও পানীয় (Contaminated Foods and Drinks) গ্রহণের স্বল্প ও দীর্ঘকালীন প্রভাব (Short and Long term effects) তথা নিরাপদ খাদ্য ও পানীয় (Safe Foods and Drinks) গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোকপাত করা প্রয়োজন। সুস্বাস্থ্য তথা জীবন রক্ষার জন্য পরিমিত সুষম ও নিরাপদ খাদ্য গ্রহণ অত্যাবশ্যক। খাবারের পুষ্টিমানের (Nutritive values) চেয়েও খাদ্য নিরাপত্তা (Food Safety) অধিক গুরুত্বপূর্ণ। কোনো খাবারের পুষ্টিমান কম হলে শরীরে পুষ্টি সরবরাহ কম হতে পারে এবং ফলশ্রুতিতে অপুষ্টিজনিত রোগ (Malnutrition) দেখা দিতে পারে, যা দৃশ্যমান হতে দীর্ঘসময় প্রয়োজন। পক্ষান্তরে দূষণযুক্ত খাবার (Contaminated Foods) গ্রহণের স্বল্প সময়ের মধ্যে স্বাস্থ্য তথা জীবন মারাত্মক ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে। নিরাপদ খাদ্য (Safe Foods) বলতে আমরা ঐ সমস্ত খাবারকে বুঝি যা সকল প্রকার দূষণ (Contaminats/Hazards) যেমন ক্ষতিকর অণুজীব (Bacteria, Virus, Parasite) বা এদের উৎপাদিত টক্সিন (Toxins), বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক দ্রব্যাদি, ভৌত বস্তুসমূহ (Physical contaminants) ইত্যাদি মুক্ত। ফলে নিরাপদ খাদ্য স্বাস্থ্যের জন্য কোনো ধরনের ক্ষতিকর উপাদান বহন করে না। পক্ষান্তরে একটি সুস্বাদু পুষ্টিকর খাবারে উল্লেখিত দূষণ (Contaminats/Hazards) সমূহের যেকোনো একটি বা একাধিক উপাদানের উপস্থিতি উক্ত খাবারকে অনিরাপদ (Unsafe foods) খাদ্যে রূপান্তরিত করতে পারে। দূষণযুক্ত (Contaminated), অনিরাপদ (Unsafe) খাদ্য গ্রহণের ফলে খাদ্য ও পানিবাহিত রোগের দ্বারা মারাত্মক স্বাস্থ্য ঝুঁকি তৈরি হতে পারে। অনিরাপদ (Unsafe), ব্যাক্টেরিয়া, ভাইরাস বা এদের উৎপাদিত টকসিনযুক্ত দূষিত (Contaminated Foods) খাবার খাওয়ার ফলে দুই শতাধিক বিভিন্ন ধরণের রোগে আক্রান্ত হতে পারে। দূষিত খাবার (Contaminated Foods) গ্রহণের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় (Short-term effects) খাদ্যে বিষক্রিয়া (Food Poisoning), ডায়রিয়া, আমাশয়, আন্ত্রিক জ্বর (Enteric fever) ইত্যাদি দেখা দিতে পারে। পাশাপাশি দীর্ঘমেয়াদি প্রতিক্রিয়া (Long-term effects) যেমন- লিভার অকার্যকর, কিডনি অকার্যকর, ক্রোনিক আরথ্রাইটিস এবং স্নায়ুরোগে (Meningitis) আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হতে পারে। WHO তাদের ২০১৫ সালের এক রিপোর্টে খাদ্যবাহিত রোগকে বিশ্বস্বাস্থ্যের প্রতি মারাত্মক হুমকি হিসেবে উল্লেখ করেছে। দূষিত খাদ্য (Contaminated Foods) গ্রহণের ফলে নবজাতক, শিশু, গর্ভবতী মা, বয়োবৃদ্ধ তথা অসুস্থ ব্যক্তির জীবন মারাত্মক হুমকির মুখে পড়তে পারে। তাই নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে হলে খাদ্য দূষণের কারণসমূহ আগে ভালোভাবে বুঝতে হবে এবং তদানুযায়ী প্রতিরোধের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রায় ত্রিশের অধিক অনাকাঙ্ক্ষিত উপাদান খাদ্যে মিশ্রিত থাকলে উক্ত খাদ্য অনিরাপদ (Unsafe) হতে পারে। খাদ্য অথবা ইহার কাঁচামালের উপাদান সমূহের মধ্যে যদি কোনো ক্ষতিকর অণুজীব (Micro-organisms) অথবা অণুজীব কর্তৃক উৎপাদিত টক্সিন (Toxins) উপস্থিত থাকে, খাবারের সাথে ইচ্ছা বা অনিচ্ছাকৃতভাবে কোনো ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্য (যেমন- বালাইনাশক, সার ইত্যাদি) উপস্থিত থাকে,ন খাদ্যের সাথে উচ্চমাত্রায় অনুমোদিত খাদ্য সংরক্ষক (Food Preservatives) জাতীয় রাসায়নিক পদার্থ অথবা রঞ্জক (Food Colours) বা সংযোজক (Food Addetives) ইত্যাদি উপস্থিত থাকে তবে খাবার অনিরাপদ (Unsafe) হবে। পরিবেশ দূষণের ফলে জমাকৃত (Accumulated) ভারী বস্তুসমূহ (Heavy Metals) যেমন- (Arsenic, Lead, Cadmium etc) ইত্যাদি অথবা অন্য কোনো ক্ষতিকর উপাদান উপস্থিত থাকলে খাবার অনিরাপদ (Unsafe) হয়ে যায়। উল্লেখিত বিভিন্ন ধরণের খাদ্য দূষকের (Contaminants) মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকির কারণ হলো জৈব বিপত্তি (Biological Hazards) এবং রাসায়নিক বিপত্তি (Chemical Hazards)। যদি যথোপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বন করে খাদ্যে এদের উপস্থিতি প্রতিরোধ বা নিয়ন্ত্রণ করা যায়, তবে খাদ্য নিরাপদ রাখা যায় এবং খাদ্য দূষণজনিত রোগ সহজেই প্রতিরোধ করা যায়। এজন্য খাদ্য উৎপাদন, পরিবহন, সংরক্ষণ এবং গ্রহণ (Consumption) পর্যায়ে সর্বজনীন সচেতনতার মাধ্যমে খাদ্যদূষণ (Food Contamination) রোধ করা সম্ভব। যেমন - খাদ্য উৎপাদন (Food Production) এবং সংগ্রহ (Harvesting) পর্যায়ে দূষণমুক্ত রাখতে কৃষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যাতে-

- সঠিক সময়ে প্রয়োজন মতো সার (Fertilizer) ও কীটনাশক (Pesticides) ব্যবহার করা। অননুমোদিত বা অপ্রয়োজনীয় অসময়ে সার বা বালাইনাশক ব্যবহার না করা।
- সঠিক সময়ে এবং উপযুক্ত (Hygienic) পদ্ধতিতে খাদ্যশষ্য, ফলমুল, শাকসবজি সংগ্রহ করা।
- সঠিক আর্দ্রতা, সঠিক তাপমাত্রা এবং সর্বোপরি উপযুক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করে খাদ্য সংরক্ষণ করা।
- খাদ্য পরিবহন সঠিক পদ্ধতিতে এবং দ্রুততম সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করা।
- খাদ্য প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান (Food Industries), হোটেল, রেস্তোঁরা, খাবার দোকান ইত্যাদিতে যথোপযুক্ত পরিচ্ছন্নতা (Hygienic Practice) নিশ্চিত করতে হবে।

- বিভিন্ন আন্তর্জাতিক (HACCP) পদ্ধতি এবং দেশীয় (BSTI) মান নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানের প্রত্যয়ন এবং পর্যবেক্ষণ বাধ্যতামূলক করা।
- নিরাপদ (Safe) কাঁচামাল (Rawmaterials) ব্যবহার করা।
- প্রশিক্ষিত দক্ষ ফুড টেকনোলজিস্ট/পুষ্টিবিদ/ফুড ইঞ্জিনিয়ারের তত্ত্বাবধায়নে খাদ্য প্রস্তুত, মাননিয়ন্ত্রণ, সংরক্ষণ এবং বিপণন নিশ্চিত করতে হবে।
- প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে কেবল অনুমোদিত, মানসম্পন্ন, পরিমিত খাদ্য সংযোজন (Food additives), খাদ্য রঞ্জক (Food Colours), খাদ্য পরিপূরক (Food supplements) ব্যবহার করা যেতে পারে।
- কেবল ফুড গ্রেডের অনুমোদিত প্যাকেজিং সামগ্রী ব্যবহার করে খাদ্যদ্রব্য প্যাকেটজাতকরণ নিশ্চিত করতে হবে।
- খাদ্যদ্রব্যের প্যাকেটের গায়ে অবশ্যই উৎপাদনের তারিখ, মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ, পুষ্টিমান (Nutritive Values), উপাদানসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্যাবলি দর্শনীয় স্থানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। তদুপরি ভোক্তা (Consumer) এবং পারিবারিক পর্যায়ে WHO প্রবর্তিত পাঁচটি প্রধান নিয়মনীতি (Five keys) অনুসরণ নিশ্চিত করতে হবে। যেমন-
- পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা (Cleanliness) অবলম্বন করা, খাদ্যসামগ্রী ধৌতকরণ, প্রস্তুত এবং পরিবেশনের উপকরণসমূহ উত্তমরূপে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা।
- রান্নাকৃত খাবার (Cooked foods) এবং কাঁচা খাবার (Raw foods) পৃথকভাবে রাখা।
- উপযুক্ত তাপমাত্রায় এবং পর্যাপ্ত সময় নিয়ে পরিপূর্ণরূপে খাবার রান্না করা।
- খাদ্য সংরক্ষণ ও সরবরাহে উপযুক্ত তাপমাত্রা ব্যবহার করা।
- নিরাপদ খাবার পানি ও খাদ্য উপকরণ ব্যবহার করা।

সর্বোপরি ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। যেমন-

- খাবার গ্রহণের পূর্বে অবশ্যই সাবান দিয়ে হাত ধৌত করা।
- উন্মুক্ত স্থানে/ রাস্তার ধারে (Street Foods) নোংরা পরিবেশে প্রস্তুতকৃত খাবার/ পানীয় গ্রহণ না করা।
- নিরাপদ ও দূষণমুক্ত খাদ্যসামগ্রী মাছ, মাংস, ফলমূল ও শাকসবজি ক্রয় করা।
- জাংক ফুড (Junk Foods), অতিরিক্ত মসলাযুক্ত খাবার (Speice Foods) গ্রহণ না করা।
- দৈনন্দিন কর্ম এবং শৌচকর্ম (Toilet) সম্পাদনের পর হাত-পা পরিপূর্ণরূপে সাবান দিয়ে ধৌত করা ইত্যাদি।

ব্যাপক জনগোষ্ঠীর উল্লেখিত বিষয়ে সচেতনতা গড়ে তোলা সময়সাপেক্ষ এবং দক্ষ জনবল ও সমন্বিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন। অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক বিষয় এই যে, বর্তমান সরকার অতি সম্প্রতি প্রত্যেক হাসপাতালে একজন করে পুষ্টিবিদ (Nutritionist) নিয়োগের বিধান জারি করেছে। পাশাপাশি প্রত্যেক উপজেলায় ফুড এনালিস্ট/নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা (Food Analysts/Food Safety Officer) নিয়োগ করে সর্বত্র খাদ্যসামগ্রীর নিরাপত্তা ও মান পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা। আরও অধিক সংখ্যক পুষ্টিবিদ নিয়োগের মাধ্যমে সর্বত্র পুষ্টি পথ্য (Therapeutic diet) ও খাদ্য ব্যবস্থাপনা (Dietary mangement) প্রদানের সুব্যবস্থা করা। জনসাধারণের পুষ্টিজ্ঞান ও নিরাপদ খাদ্য বিষয়ে জ্ঞান (Nutritional Knowledge and Food Safety Knowledge) বৃদ্ধির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট যোগ্য এবং দক্ষ ব্যক্তি যেমন- পুষ্টিবিদ (Nutritionist), খাদ্য বিজ্ঞানী/প্রযুক্তিবিদ (Food Scientist/ Technologists/Engineer) ও জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ (Public Health Professionals) নিয়ে সমাজের বিভিন্ন স্তরে (Community Nutrition and Food Safety Education)-এর ব্যবস্থা করা। নিরাপদ খাদ্য শিক্ষাবার্তার (Food Safety Education Messages) মাধ্যমে স্কুল-কলেজ, মাদ্রাসাসহ সমাজের সকল স্তরের মানুষের নিরাপদ খাদ্য বিষয়ে সচেতন করা।

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা (WHO, FAO) এবং বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ (BFSA) সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের (যেমন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সমস্ত বিভাগ/ ইন্সটিটিউটে খাদ্য, পুষ্টি, অণুজীব, রসায়ন ও প্রাণরসায়ন বিষয়ক পাঠদান ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হয়) সমন্বয়ে পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে জনসাধারণের নিরাপদ খাদ্য গ্রহণ সুনিশ্চিতের মাধ্যমে সুস্থ-সবল কর্মক্ষম জাতি গঠন নিশ্চিত করতে হবে। কেবল একটি সুস্থ-সবল কর্মঠ জাতিই পারে ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়নের অভিলক্ষ SDGs অর্জন করতে পারে।

নিরাপদ খাদ্যঃ প্রয়োজন সবার দায়িত্বশীল অংশগ্রহন

ডাঃ শাহ মাহফুজুর রহমান

স্বাস্থ্যসহ সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য পুষ্টির গুরত্ব অনস্বীকার্য। যথাযথ পুষ্টির পূর্বশর্তসমূহের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে নিরাপদ ও মানসম্পন্ন খাদ্য। নিরাপদ খাদ্য গ্রহণের বিষয়টি প্রতিটি মানুষের অধিকার। কিন্তু, ভেজাল, কৃষি উৎপাদনে রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের অপ্রয়োজনীয়, অপরিমিত ও অসময়োচিত ব্যবহার, দ্রুত ও অপরিকল্পিত নগরায়ন, বিতর্কিত খাদ্য প্রযুক্তি, মানুষের খাদ্য গ্রহণের পরিবর্তিত অভ্যাস, আর্ন্তজাতিক খাদ্য ব্যবসা ইত্যাদি বিশ্বব্যাপী বিশেষ করে বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশগুলোতে খাদ্যবাহিত রোগের ঝুঁকি বৃদ্ধি করেছে। অনিরাপদ তথা দূষণযুক্ত এবং ভেজাল খাদ্য জনস্বাস্থ্য, পুষ্টি, খাদ্য ব্যবসা-বানিজ্য, পর্যটন, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং মেধা বিকাশের অন্তরায়। সুতরাং, টেকসই উন্নয়নে নিরাপদ খাদ্যের ভূমিকা যে কত ব্যাপক এবং গভীর তা সহজেই অনুমেয়।

কোন খাদ্য ভোক্তা যে উদ্দেশ্যে খাচ্ছেন সে উদ্দেশ্যে যদি পূরণ হয় এবং ভোক্তার যদি কোন ক্ষতি বা অসুখ বিসুখ না হয় হয় সে খাদ্যকেই নিরাপদ খাদ্য বলা হয়। আরও বলা যায়, খাদ্যকে ভৌত, রাসায়নিক ও জীবানুঘটিত দূষণমুক্ত এবং নিরাপদ, মান সম্পন্ন ও মানুষের গ্রহনোপযোগী রাখার জন্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ, বিতরণ, পরিবেশন এবং আহারের জন্য প্রস্তুত করা পর্যন্ত যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন তাকে খাদ্য নিরাপদতা (Food Safety) বলে।

খাদ্য সাধারনতঃ রোগ জীবাণু যেমন ব্যাকটেরিয়া,ভাইরাস,প্যারাসাইট ও ফাঙ্গাস; রাসায়নিক পদার্থ যেমন খাদ্যে বা উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত কীটনাকের অবশেষাংশ, জীবজন্তুর জন্য ব্যবহৃত ঔষধের অবশেষাংশ, নন ফুডগ্রেড এ্যাডিটিভস (রং ও অন্যান্য), প্রাকৃতিকভাবে ঘটিত বিষাক্ত পদার্থ, শিল্প কারখানার অপরিশোধিত বর্জ এবং ভৌত পদার্থ যেমন বালি, কাকর, মাটি, লোহা, পারমানবিক তেজস্ক্রিয়তা ইত্যাদি দ্বারা দূষিত হতে পারে।

এছাড়া, যে সকল বিষয় খাদ্যের নিরাপদতায় প্রভাব ফেলতে পারে সেগুলো হচ্ছে - খাদ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিতরণ, পস্তুত ও গ্রহণ; আর্থ-সামাজিক ও কৃষ্টিগত অবস্থা; খাদ্য প্রযুক্তি; কৃষি পদ্ধতি- কীটনাশক, রাসায়নিক সার ব্যবহারের মাত্রা ও বিধি; খাদ্য আমদানী-রফতানী ও পশু খাদ্য; খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ; খাদ্য সরবরাহ সেবা পদ্ধতি; তৈরি খাবার, ফুটপাতে বিক্রি করা খাবার; ভ্রমণ ও পর্যটন এবং পরিবেশগত বিষয়।

খাদ্যে ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, প্যারাসাইট, ভৌত পদার্থ বা রাসায়নিক দুষণ দুই শতাধিকেরও বেশি রোগ বালাই সৃষ্টি করে। এসব রোগের মধ্যে ডায়ারিয়া থেকে শুরু করে প্রাণঘাতি ক্যান্সার পর্যন্ত হতে পারে। সারা পৃথিবীতে বৎসরে প্রায় প্রতি দশজনে একজন দূষণযুক্ত খাবার খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তন্মধ্যে, প্রায় চার লক্ষাধিক মারা যান এবং ৩৩০ লক্ষ স্বাস্থ্য-বছর জীবন থেকে নষ্ট হয়ে যায়। খাদ্যবাহিত রোগ দীর্ঘমেয়াদী বিকলংগতার কারন হয়ে দাড়ায়। উল্লেখ্য, দূষণযুক্ত খাবারের কারনে সবচেয়ে বেশী হয় ডায়ারিয়া জনিত রোগ। বিশ্বে বছরে সাড়ে পাঁচ কোটি ব্যক্তি ডায়রিয়ার কারনে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তন্মধ্যে, দুই লক্ষ ত্রিশ হাজার মারা যায়। খাদ্যবাহিত রোগের বোঝার শতকরা ৪০ ভাগই অনুর্ধ পাঁচ বৎসরের শিশুরা বহন করে। তন্মধ্যে, প্রতি বছর সোয়ালক্ষ শিশু মারা যায়, যা সহজেই প্রতিরোধযোগ্য। এছাড়া, ভেজাল ও দূষণযুক্ত খাবার শিশুর মানসিক ও শারিরিক বিকাশে বাধা এবং শিক্ষা প্রতিবন্ধিতার সৃষ্টি করে। এখানেই শেষ নয়, অনিরাপদ খাবার- রোগ ও অপুষ্টির দুষ্টচক্র তৈরি করে এবং তাতে শিশু, বৃদ্ধ ও গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী মা এবং অন্য রোগে অসুস্থরা বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয়। দুষিত ও ভেজাল খাবার স্বাস্থ্য ও পুষ্টির ক্ষতি ছাড়াও প্রত্যক্ষভাবে চিকিৎসা ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ব্যয় ও হাসপাতাল সেবার উপর চাপ ফেলে এবং পরোক্ষভাবে কর্মঘন্টার ব্যাপক ক্ষতি করে। ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাশে অনুপস্থিতি হয়। পর্যটন এবং খাদ্যের স্থানীয় ও রফতানী ব্যবসায় ক্ষতি হয়, ফলে জাতীয় পর্যায়ে অর্থনীতিতে প্রভাব ফেলে। অর্থনৈতিক ক্ষতি ছাড়াও দেশের সুনাম ও সুখ্যাতি নষ্ট হয়।

উৎপাদন থেকে শুরু করে খাবার থালা পর্যন্ত আসতে খাবারকে দীর্ঘপথ পাড়ি দিতে হয়। এই পথকে ফুড চেইন বা খাদ্য শৃঙ্খল বলে। সময়ের বা ভৌগলিক প্রেক্ষাপটে এ পথ যত দীর্ঘ হয়, খাদ্য দূষনের ঝুঁকি তত বৃদ্ধি পায়। খাদ্য শৃঙ্খল অর্থাৎ উৎপাদন থেকে শুরু করে ভোক্তার থালা পর্যন্ত আসতে যে কোন স্থানে বা পয়েন্টে সংশ্লিষ্ট যেকোন কারও দ্বারা খাদ্য দূষণ বা ভেজাল হতে পারে। সুতারাং, খাদ্য শৃঙ্খলে সংশ্লিষ্ট সকলের দায়িত্বশীল আচরনই কেবল খাদ্যের মান ও নিরাপদতা নিশ্চিত করতে পারে।

ডাঃ শাহ মাহফুজুর রহমান
এমবিবিএস, ডিপ্লোমা ইন ম্যানেজমেন্ট,
এমএসসি, এমপিএইচ, এফআরএসপিএইচ, সিএইচসি

খাদ্যশৃঙ্খলে সংশ্লিষ্টরা হচ্ছেন

সরকার অর্থাৎ নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান বা কর্তৃপক্ষ, খাদ্য উৎপাদনকারী বা সরবরাহকারী বা পরিবেশনকারী এবং ভোক্তা। খাদ্য শৃঙ্খলে সংশ্লিষ্টদের দায়িত্বশীল অংশগ্রহনের বিষয়টি এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলঃ

সরকার অর্থাৎ নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান বা কর্তৃপক্ষ

নিয়ন্ত্রকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যা করা একান্ত প্রয়োজন তা হচ্ছে- নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যথাযথ খাদ্য নিয়ন্ত্রন কাঠামো ও অবকাঠামো তৈরি, নীতি আইন- বিধি প্রনয়ন এবং তার প্রয়োগ। ঝুঁকিভিত্তিক খাদ্য পরিদর্শন, পুরো খাদ্য শৃঙ্খলে ঝুঁকি নিরুপণ এবং তদানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহন, জরুরী খাদ্য নিরাপদতা ও রোগের প্রাদুর্ভাবে সাড়া দেয়া এবং ব্যবস্থা গ্রহন। খাদ্যবাহিত রোগের নজরদারী। আমদানি-রফতানী খাদ্যের মাননিয়ন্ত্রণ। নিরাপদ খাদ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান, এজেন্সী, বিভাগ, এর কার্যক্রম সমন্বয় করা এবং সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহন। আন্তঃ প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগ বিশেষ করে তথ্যের আদান প্রদান এবং ল্যাবরেটরী সেবার ক্ষেত্রে আন্তঃ ল্যাবরেটরী রেফারেল সার্ভিস, বিশেষজ্ঞ সেবা ও বিশেষজ্ঞ বিনিময় ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। নিরাপদ খাদ্যের সকল ক্ষেত্রে জনবল তৈরি-শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ প্রদান। দেশে- বিদেশে আর্ন্তজাতিক সংস্থার সাথে যোগাযোগ রক্ষা বিশেষকরে খাদ্যবাহিত যে সকল রোগ আন্তঃদেশীয় গুরুত্ববহ। প্রয়োজনে তাঁদের সহযোগিতা বিশেষ করে কারিগরি সহযোগীতা গ্রহণ। এছাড়া, খাদ্য উৎপাদনকারী বা খাদ্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সমূহের নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি দক্ষতা উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান ইত্যাদি। সর্বোপরি, জনসচেতনতা তৈরির জন্য সকল প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশে প্রায় পনরটি মন্ত্রণালয় এবং তাদের প্রায় বিশটি সংস্থা নিরাপদ ও মানসম্পন্ন খাদ্য নিয়ন্ত্রন কার্যক্রমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নিয়োজিত। এসব সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমসমূহকে সমন্বয় করার জন্য দীর্ঘদিনের প্রত্যাশিত, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩ এর প্রেক্ষিতে শীর্ষ সংস্থা 'বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ' গঠিত হয়েছে।

খাদ্য উৎপাদনকারী, প্রক্রিয়াজাতকারী, খাদ্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠান

ভোক্তার জন্য তাদের চাহিদা মোতাবেক এবং আইনগত বিধি-বিধান পরিপালন করে নিরাপদ ও মানসম্পন্ন খাদ্য নিশ্চিত করার প্রাথমিক দায়িত্ব হচ্ছে খাদ্য উৎপাদনকারী বা খাদ্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের। কৃষি উৎপাদনে কীটনাশক ও রাসায়নিক সারের পরিমিত, সঠিক ও সময়োচিত ব্যবহার। মৎস্য , হাঁস-মুরগি ও পশুপালনে নিরাপদ ও মান সম্মত খাবার ব্যবহার, বিধি মোতাবেক ওষুধের প্রয়োগ উল্লেখযোগ্য।

এ সকল দায়িত্বের মধ্যে উত্তম কৃষি চর্চা (Good Agricultural Practices), উত্তম খাদ্য উৎপাদন চর্চা (Good Manufacturing Practices), উত্তম পরিচ্ছন্নতা চর্চা (Good Hygienic Practices), প্রযোজ্যক্ষেত্রে Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP) বাস্তবায়ন এবং সর্বোপরি সামগ্রিক মান নিশ্চয়তা বিষয়টি পরিপালন করা। আর এ মান নিশ্চয়তার বিষয়টি খাদ্য উৎপাদনকারী (তিনি প্রাথমিক, মাধ্যমিক বা শেষ পর্যায়ে), প্রক্রিয়াজাতকরনকারী, মোড়কজাতকারী, খাদ্য সরবরাহকারী, মজুদকারী, পাইকারী বা খুচরা বিক্রেতা, পরিবেশনকারী সবার বেলায় যে কোন পর্যায়ে প্রযোজ্য এবং অত্যাবশকীয়। খাদ্য উৎপাদন পরবর্তী মোড়কীকরনের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পরিবহন, গুদাম, পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতার প্রতিষ্ঠান এবং এমনকি ভোক্তার বাড়ীতেও খাদ্যের গুনগত মান এবং নিরাপদতার বিষয়টি মোড়কীকরনের উপর অনেকখানি নির্ভরশীল। এছাড়াও খাবারের মেয়াদ এবং লেবেল খাদ্যের গুরুত্বপূর্ন তথ্য বহন করে।

ভোক্তা

খাদ্যের নিরাপদতা কেবল খাদ্যের উপর সম্পূর্ন নির্ভর করে না, যিনি খাদ্যটি ভোগ করছেন তাঁর ওপরও বহুলাংশে নির্ভরশীল। খাদ্য শৃঙ্খলের সর্বশেষ প্রান্তে থাকেন ভোক্তারা। খাদ্যবাহিত রোগের প্রায় এক তৃতীয়াংশ ঘটে থাকে ভোক্তার অজ্ঞতা, অসাবধানতা বা অসচেতনতার কারণে। সুতারাং, খাদ্য নিরাপদ রাখা বা খাবার ক্ষেত্রে খাদ্য উৎপাদনকারী ও সরকারের পাশাপাশি, ভোক্তার ভূমিকাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন। ভোক্তাকে খাদ্যপন্য কেনার ক্ষেত্রে সজাগ থাকা, বাজার থেকে বাড়িতে নেয়ার সময় কিংবা বাড়িতে খাদ্য যাতে দূষণ না হয়, নিরাপদ থাকে তা নিশ্চিত করা। সুতরাং কোথাও কোন কিছু না জানার কারনে বা অবহেলার কারনে, খাদ্যটি পরিতৃপ্তি ও আনন্দের সাথে খাওয়া যাতে নষ্ট না হয়। সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। এক্ষেত্রে, যে পাঁচটি বিষয় অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলা দরকার তা হচ্ছে- পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা, কাচা ও রান্না করা খাবার আলাদা রাখা, সঠিকভাবে রান্না করা, নিরাপদ তাপ মাত্রায় খাবার সংরক্ষণ করা এবং নিরাপদ পানি ও খাদ্য উপকরন ব্যবহার করা।

সর্বশেষে বলা যায়, খাদ্যের নিরাপদতা ও গুণগত মান নির্ভর করছে কৃষি উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাত করন, পরিবহন, সংরক্ষণ, বিতরন, পরিবেশন ও খাদ্য গ্রহণের মত খাদ্যের জটিল শৃংখলে সংশ্লিষ্ট প্রতিজনের দায়িত্বশীল অংশগ্রহণ। এমন দায়িত্বশীল অংশগ্রহনেই নিশ্চিত হবে নিরাপদ ও মান সম্মত খাদ্য, আরও উন্নত হবে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, ঘটবে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক আরও উন্নয়ন, অর্জিত হবে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা, বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে মধ্যম আয়ে, মধ্যম আয়ের দেশ থেকে পরিনত হবে উন্নত দেশে।

খাদ্য এবং নিরাপদ খাদ্য তৈরির পটভূমি

অধ্যাপক ড. এম. আকতারুজ্জামান

খাদ্য ব্যবস্থা:

আকাশে রয়েছে অগণিত নীহারিকাপুঞ্জ এবং তাতে রয়েছে অগণিত সূর্য। সূর্যের আলো এবং আলোর তেজ পৃথিবীর উদ্ভিদকুলের পাতায় পাতায় আপতিত হয়। উদ্ভিদের পাতা এই সূর্যের আলোকে শোষণ করে। উদ্ভিদের পাতায় রয়েছে সবুজ কণিকা ক্লোরোফিল। সবুজ কণিকা বাতাসের কার্বন ডাই অক্সাইডকেও শোষণ করে। অন্যদিকে মাটি থেকে উদ্ভিদ তার শেকড়ের মাধ্যমে পানি ও খনিজ লবণ সবুজ কণিকায় নিয়ে আসে। সবুজ কণিকাতেই সৌরশক্তি+পানি+কার্বন ডাই অক্সাইড একত্রিত হয়ে গ্লুকোজ খাদ্যকণা তৈরি করে। এই গ্লুকোজ থেকেই আমিষ, স্নেহ এবং শর্করাসহ সব ধরনের খাদ্যকণা তৈরি হয়। এই খাদ্য ছড়িয়ে পড়ে সবধরনের জীবকুলের বৃদ্ধি ও বিকাশে। এভাবে প্রকৃতি ও সূর্যের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে মানুষের দেহমনের গঠন সরাসরি সম্পর্কিত। সমুদ্রেও ভাসমান সবুজ কণিকাসম্পন্ন অণুজীব বিদ্যমান রয়েছে যারা সৌরশক্তি ব্যবহার করে একইভাবে খাদ্য কণিকা তৈরি করে সমস্ত জলজ জীবকুলের বিকাশ ও বৃদ্ধিতে সক্রিয় রয়েছে। জীবদেহের জন্মবৃদ্ধি ক্ষয় এবং লয় রয়েছে। জীবদেহের বিনাশ ঘটলে তা আবার বিশেষিত হয়ে নানা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তার মৌল উপাদানগুলোতে বিভক্ত হয়ে প্রকৃতি ও মাটিতে মিশে যায়। প্রকৃতি এগুলো ব্যবহার করে জীবনচক্র চালু রাখে। মানুষ একদিনেই খাদ্য খাওয়া শিখেনি। মানুষ আগে আজকের মতো করে খাদ্য খাওয়া জানতো না। বিষাক্ত খাদ্য খেয়ে বহু বছর বহু মানুষ অকালে মৃত্যুবরণ করেছে। যে খাদ্য বিষাক্ত সেটি মানুষ এড়িয়ে গেছে। বহু সংগ্রাম এবং প্রচেষ্টার (Trial and Error Method) মাধ্যমে মানুষ খাদ্য খাওয়া শিখেছে। একপর্যায়ে আগুনের আবিষ্কারে মানুষ আরো নিখুঁতভাবে খাদ্য খাওয়া শিখেছে। আজকে আমাদের খাবার টেবিলে যে খাদ্যসামগ্রী দেখি তা অগণিত মানুষের আত্মাহুতির মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

যা খেলে আমাদের শরীরে কোনো না কোনো কাজ হয় তাকে খাদ্য বলে। খাদ্য আমাদের শরীরের প্রধানত তিনটি কাজ করে। ক) খাদ্য আমাদের শরীরের তাপ এবং শক্তি দেয়। যেমন ভাত, রুটি, আলু, কলা, কচু, গুড়, চিনি, মধু, তেল, ঘি, মাখন, চর্বি ইত্যাদি। খ) খাদ্য আমাদের শরীরের গঠন, বৃদ্ধি ও ক্ষয় পূরণ করে। যেমন মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, ডাল, সিমের বিচি, চীনাবাদাম, সয়াবিনের বিচি ইত্যাদি। গ) খাদ্য আমাদের শরীরের রোগ প্রতিরোধ করে এবং রোগ দূর করে। যেমন শাকসবজি, ফল-মুল ইত্যাদি।

মানুষ খেত-খামার, বনাঞ্চল, সাগর-নদী ইত্যাদি থেকেই ফসল, ফলমূল, সবজি ফলায়, মাছ ধরে বা পশু-পক্ষীর গোশত আহরণ করে এগুলোকে নানা পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ায় খাদ্যদ্রব্য খাওয়ার উপযোগী করার জন্য প্রস্তুত করে। এই প্রস্তুত দ্রব্য নানা জায়গায় বিলিবন্টন হয়, খাদ্য গুদামে বা মার্কেটে সংরক্ষণ করা হয় এবং অদল-বদল বা ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে মানুষ তার নাগাল পায়। অবশেষে এগুলো রান্নাবান্না বা নানা প্রক্রিয়ায় খাওয়ার টেবিলে উপস্থিত হয়। মানুষ তারপর খাদ্য ভক্ষণ করে পারিবারিক বা সামাজিকভাবে মিলেমিশে। এই যে ফসল তোলা বা খাদ্য আহরণ থেকে শুরু করে নানা ধাপগুলো পাড়ি দিয়ে দস্তরখানা বা খাবার টেবিল পর্যন্ত খাদ্য চলাচল করে ভক্ষণের জন্য এই ধাপগুলোকে বলে খাদ্যের চেইন। মানুষ এক জীবনে প্রায় ৬০০০০-৬৫০০০ বার খাদ্য গ্রহণ করে।

খাদ্য পচন ও দূষণের কারণ

বাঁচার জন্য আমরা খাদ্য খেয়ে থাকি। পৃথিবীতে নানা জাতের, নানা গুণের খাদ্যসামগ্রী রয়েছে। ফসল তোলার পর অনেক খাদ্যশস্য রোদে শুকিয়ে প্রক্রিয়াজাত করে অনেক মাস ঘরে রাখা যায়। যেমন ধান, গম, ভুট্টা, ডাল, শিমের বিচি, চিনা বাদাম, পিয়াজ, রসুন, আলু ইত্যাদি। এগুলোকে অপচনশীল (Non Perishable) খাদ্য বলে। কোনো কোনো খাদ্য খুব সহজেই পচে যায়। যেমন দুধ, ডিম, মাছ, গোশত ইত্যাদি এবং এগুলোকে পচনশীল (Perishable) খাদ্য বলে। এই দুইয়ের মাঝামাঝিও অনেক খাদ্য আছে, যেমন অনেক ধরনের ফলমূল সবজি ইত্যাদি এবং এগুলো কয়েক সপ্তাহ ভাল থাকে। এদের অর্ধপচনশীল (Semi Perishable) খাদ্য বলে। এই বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে খাদ্য নানাভাবে প্রক্রিয়াজাত করে দীর্ঘকাল খাদ্য সংরক্ষণ এবং বাজারজাত করা হয়।

অধ্যাপক ড. এম. আকতারুজ্জামান
পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

খাদ্য পচন, দূষণ বা বিষাক্ত হওয়ার কতিপয় কারণঃ

১. খাদ্যের মধ্যে যদি ধুলাবালি, কাঁচ, পাথর, ধাতব দ্রব্য, মাটি ও অন্যান্য পদার্থ থাকে, যা খাদ্যকে গ্রহণের অযোগ্য করে ফেলে বা পচিয়ে ফেলে।

খাদ্যের মধ্যে সাধারণত অনেক পানি থাকে আবার বাতাসে জলীয় বাষ্প থাকে এগুলোর প্রভাবে খাদ্য নিজেই পচে যায়। তাজা সতেজ খাদ্যে এক ধরনের জৈব অনুঘটক (Bio-catalyst) পদার্থ থাকে, যাকে এনজাইম বলা হয়। এই এনজাইম তাজা এবং শুকনা খাদ্যে ঘুমন্ত অবস্থায় থাকে। কিন্তু পানি, জলীয় বাষ্প এবং উষ্ণতার দীর্ঘ প্রভাবে এনজাইম সক্রিয় হয়ে খাদ্যকে ভেঙে ধীরে ধীরে পচিয়ে ফেলে। এনজাইমের সক্রিয়তায় ফল পেকে যায়। শাকসবজি, ফলমূল ইত্যাদি নরম হয়ে যায় ফলে অন্যান্য অণুজীব সহজে আক্রমণ করে এবং খাদ্যকে পচিয়ে ফেলে।

২. নানা কিট-পোকা, ইঁদুর, কুকুর, বেড়াল ইত্যাদিও খোলা খাবার খেয়ে ফেলে এবং এগুলো অনেক রোগ-জীবাণু বহন করে খাদ্যে ছড়িয়ে দেয়। ফলে খাদ্য পচে যায় এবং বিষাক্ত হয়ে যায়।

৩. বাতাসের অক্সিজেন এবং পানির প্রভাবে তেল জাতীয় খাদ্য জারিত হয়ে পচে যায় এবং দুর্গন্ধের সৃষ্টি করে।

৪. প্রকৃতিতে অদৃশ্য অনেক ক্ষুদ্রজীব বা অণুজীব থাকে। খালি চোখে এদের অনেক সময় দেখা যায় না। এরা খাদ্য পেলে খাদ্য খেয়ে খুব তাড়াতাড়ি বংশ বিস্তার বা বৃদ্ধি ঘটায়। অনেক অণুজীব অতি ক্ষুদ্র বীজ বা স্পোর তৈরি করে। সাধারণত বায়ুর প্রবাহে এরা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পৌঁছে যায়। অণুজীবগুলোর অধিকাংশই ভাল। তবে কতিপয় অণুজীব খুবই বিষাক্ত এবং আমাদের শরীরে খাদ্যের মাধ্যমে প্রবেশ করে ডায়রিয়া-কলেরাসহ নানা রোগে আক্রান্ত করে ফেলে এবং অনেক সময় মানুষ মারাও যায়। এ জাতীয় অণুজীবকে প্যাথোজেন বলে। অনেক অণুজীব খাদ্যে বৃদ্ধি পেয়ে খাদ্যকে পচিয়ে ফেলে এদেরকে পচনকারী (Spoilage) অণুজীব বলে। কোনো কোনো প্যাথোজেন (রোগসৃষ্টিকারী অণুজীব) খাদ্যে বিষাক্ত পদার্থ (টক্সিন) নির্গত করে এবং খাদ্যকে বিষাক্ত করে ফেলে। একে বলা হয় ফুড ইনটিক্সকেশন (খাদ্যে বিষক্রিয়া)। এরূপ খাদ্য খেয়ে মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ে এই বিষক্রিয়ার ফলে। কিছু কিছু অণুজীব খাদ্যের মধ্য দিয়ে আমাদের দেহে প্রবেশ করে এবং ডায়রিয়া, টাইফয়েডসহ ইত্যাদি রোগ সৃষ্টি করে এবং একে খাদ্যবাহিত রোগ বলে (Food Born Disease)। উদাহরণস্বরূপ সালমোনেলা নামক একটি অণুজীব ডিমের বিষ্ঠা থেকে ডিমের খোসায় চলে আসে এবং ডিমকে দুষিত করে। একধরনের উপকারী অণুজীব দুধের মধ্যে থাকে যা দুধকে দইয়ে রূপান্তরিত করে ফেলে। কিন্তু খোলা অবস্থায় এই দইয়ে ইস্ট বা ছত্রাক বাতাসের মধ্য দিয়ে এসে দইকে পচিয়ে ফেলে। মাছের গায়ে এবং পেটের ভেতর অনেক অণুজীব বসবাস করে। মাছের মৃত্যুর পর এই অণুজীবগুলো মাছকে আক্রমণ করে এবং মাছকে পচিয়ে ফেলে। অনেক সময় কম তাপমাত্রায় (০-৫ ডিগ্রি সে. বা তার নিচের তাপমাত্রায়) মাছ, দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যে সাইক্রোট্রপিক (ঠান্ডায় বৃদ্ধি পায় এমন) ব্যাকটেরিয়া বৃদ্ধি পেয়ে খাদ্যগুলোকে দূষিত করে পচিয়ে ফেলে। যেকোন প্রাণীর দেহে এবং অন্ত্রে অণুজীবেরা বসবাস করে এবং অপরিচ্ছন্নভাবে মাংস তৈরিকালে এই অণুজীবেরা মাংসে মিশে মাংসকে পচিয়ে ফেলে। শূকরের মাংসের ভিতরে ফিতাকৃমির ওভা বা সিষ্ট থাকে। যেনতেনভাবে রান্না করলে এই সিস্ট বেঁচে থাকে এবং কেউ এরকম মাংস খেলে এই সিষ্ট পেটের মধ্যে অঙ্কুরিত হয়ে মানুষের পেটে বৃদ্ধি পেয়ে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে অনেক লম্বা হয় এবং মানুষের মৃত্যু ঘটায়। এগুলো তাই অনেক তাপমাত্রায় পর্যাপ্ত সময় ধরে তাপ দিয়ে (সিস্টকে নিষ্ক্রিয় বা ধ্বংস করে) রান্না করে শূকরের মাংস খেতে হয়। চিনাবাদাম এবং অন্যান্য বাদাম মাঠ থেকে আনার পর রোদ্রে প্রক্রিয়াজাত না করলে এবং বাদামে ক্ষত থাকলে আদ্রতার প্রভাবে একধরনের ছত্রাক বৃদ্ধি পেয়ে বাদামে আলফাটকসিন নামক একধরনের বিষাক্ত দ্রব্য সৃষ্টি করে। এ ধরনের বাদাম খেয়ে যে কেউ অসুস্থ হয়ে যায়।

৫. চাল, ডাল, সয়াবিনসহ নানা কাঁচা খাদ্যে নানা প্রকার পুষ্টিবিরোধী (Anti Nutrient factor) উপাদান থাকে। অনেক সময় এগুলো তাপ দিয়ে প্রক্রিয়াজাত করে এদেরকে দূর করা যায়। নতুবা এরা শরীরকে অসুস্থ করে ফেলে। অনেক সময় রান্না করে বা তাপ দিয়েও এদেরকে দূর করা যায় না। যেমন, সয়াবিন বীজ। সয়াবিন বীজে ট্রিপসিন ইনহিবিটর থাকে এবং এটা খেলে মানুষ অসুস্থ্য হবে।

৬. অনেক সময় খাদ্য প্রক্রিয়াজাত করার সময় আমরা নানা ধরনের সিনথেটিক রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করি। বর্ণকরণ দ্রব্য (Colouring agent), স্বাদ-গন্ধকরণ দ্রব্য (Flovoring agent), ঘনকরণ দ্রব্য (Thiekening agent), মিষ্টিকরণ দ্রব্য (Sweetening agent) ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। কোকাকোলাসহ নানা ধরনের সফট ড্রিঙ্কসে এদের ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে। এগুলো মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহারে বা প্রতিদিন এগুলো খেলে দেহে নানা ধরনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। কারণ, অনেক সময় নিষিদ্ধ বা বিতর্কিত কেমিকেলসও খাদ্যে ব্যবহার করে পরিস্থিতিকে জটিল করা হয়।

৭. খাদ্য এলার্জেন: আমাদের সমাজে সবাই নয় তবে কতিপয় মানুষ রয়েছেন যারা নানা কারণে কিছু কিছু খাদ্য খেলে তাদের দেহে এলার্জিক রিয়েকশন (প্রতিক্রিয়া) শুরু হয়ে যায়। কখনও কখনও তা মারাত্মক আকার ধারণ করে। আমাদের দেশে কেউ কেউ চিংড়ি মাছ, ডিম, ইলিশ ইত্যাদি খেতে পারে না বা উত্তর আমেরিকাতে কেউ কেউ চিনা বাদাম বা এ ধরনের নাট খেলে এলার্জিক রিয়েকশন শুরু হয়ে যায় এমনকি কেউ কেউ অনেক সময় মারাও যেতে পারে। এর কারণ হলো খাদ্যের মধ্যে কিছু কেমিকেলস্ (রাসায়নিক দ্রব্য) যেমন এলার্জেন, বায়োটক্সিন, হিস্টামিন ইত্যাদি প্রাকৃতিক কারণেই বিদ্যমান থাকে। কিছু কিছু উদ্ভিদ প্রাণী এবং অণুজীবে এগুলো তৈরি হয়। মানুষের খাদ্যে এগুলোর উপস্থিত থাকলে কিছু কিছু মানুষের শরীরে এই এলার্জিক প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। মোটামুটিভাবে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ১৪ প্রকার ফুড এলার্জেন শনাক্ত করেছে। এগুলো হলো: ১. ডিম, ২. দুধ, ৩. কতিপয় মাছ, ৪. চিংড়ি ও কাঁকড়া জাতীয় জলজ খাদ্য, ৫. ঝিনুক ও শামুক জাতীয় জলজ খাদ্য, ৬. চিনাবাদাম, ৭. বৃক্ষজাত নানা প্রকার বাদাম যেমন, এলমন্ড, ওয়ালনাট, কাঠবাদাম, কাজুবাদাম, পিকান পিষ্টাসিওজ নাট, ম্যাকাডোনিয়া নাট, কুইন্সল্যান্ড নাট ইত্যাদি। ৮. গম ও যবের (রাই, বার্লি, ওট ইত্যাদি) আমিষ, যার নাম গ্লুটেন, ৯. তিলের বীজ, ১০. সরিষার বীজ, ১১. সয়াবিনের বীজ, ১২. কতিপয় শাক-পাতা, যেমন পালং জাতীয় শাক ও লতা। অনেক সময় এগুলো ব্যাঞ্জনাদিতে সুগন্ধ তৈরি করে। ১৩. লুপিন (বিচিত্র রঙের ফলবিশিষ্ট গাছ যা গো খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ১৪. খাদ্য সংরক্ষণে ব্যবহৃত সালফার-ডাই অক্সাইড এবং সালফেট যা ১০ পি.পি.এম, (১০ মিঃ গ্রাঃ প্রতি কেজিতে)-এর বেশি হলে এলার্জিক প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। খাদ্যের প্যাকেটের গায়ে অবশ্যই খাদ্য উপাদানগুলোর উলেখ থাকতে হবে যেগুলো দিয়ে খাদ্য তৈরি করা হয়। তা হলে যারা ফুড এলার্জিতে ভোগেন তারা এসব লেবেলিং দেখে এই প্রকার খাদ্য বর্জন করে নিরাপদ থাকতে পারেন। যদি প্যাকেটের গায়ে এটা লেখা না হয়, তবে ভুক্তভোগীরা মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়ে যাবে এসব খেয়ে।

৮. যেকোনো ইন্ডাস্ট্রিতে নানা ধরনের রাসায়নিক বর্জ্য পদার্থ তৈরি হয়। এগুলো বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে (Waste Treatment) পরিবেশবান্ধব করে পরিবেশের মাঠ, ঘাট, নদী-নালাতে ফেলা হয়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া ব্যবহার না করেই এই বিষাক্ত বর্জ্য পরিবেশে ফেলা হয়। ফলে মাঠ-ঘাট, নদী-নালা ইত্যাদির ফসল ও জলজ প্রাণীগুলো বিষাক্ত হয়ে যায়। অবশেষে এগুলো মানুষের পেটেও চলে আসে এবং মানুষ অসুস্থ হয়ে যায়।

খাদ্য তৈরি ও সংরক্ষণ:

সাধারণত খাদ্যে যে সমস্ত ধুলা, বালি, ধাতব পদার্থ, কাঁচ, পাথর-ময়লা, আবর্জনা ইত্যাদি থাকে তা পরিষ্কার করা হয়। যেকোনো ধরনের পচা, ক্ষতওয়ালা খাদ্যকে বেছে ফেলে দিতে হয়। এরপর খাদ্যকে নানাভাবে প্রক্রিয়াজাত করে সংরক্ষণ করা হয়। খাদ্য সংরক্ষণ পদ্ধতিটি কয়েকটি নীতির ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এগুলো হলো: ১) অণুজীবের বৃদ্ধিকে রোধকরণ। ২) অণুজীবকে অকেজো বা ধ্বংসকরণ। ৩) নিরাপদ খাদ্যে অণুজীবের বা দূষণ পুনর্আগমন রোধকরণ।

সাধারণত আমরা খাদ্য আগুনের তাপে রান্না করি। ফুড ইন্ডাস্ট্রিতে নানা প্রকার পদ্ধতি ব্যবহার করে যেমন, পাস্তুরাইজেশন, বাঞ্চিং, স্টেরিলাইজেশন, রেডিয়েশন ওহমিক হিটিং ব্যবহার করি। তাপে খাদ্যে অবস্থিত ক্ষতিকর দ্রব্য এবং ক্ষতিকর জীবাণুকে ধ্বংস করা হয়। এসব খাদ্যকে আমরা রেফ্রিজারেটরে (০-৫° সেলসিয়াস তাপমাত্রায়) এবং ফ্রোজেন স্টোরেজ (-১৮° সে.) তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করি। অনেক খাদ্য আমরা প্যাকেজিং করি। খাদ্য কোন অণুজীব থাকলে তা বৃদ্ধি পেতে পেতে খাদ্যকে বিষাক্ত করে ফেলে যদি খাদ্যকে ৫° সে. থেকে ৬০° সে. তাপমাত্রার মধ্যে রাখা হয়। এই তাপমাত্রা জীবাণু বৃদ্ধির এক অনুকূল পরিবেশ। যদি ৫° সে. থেকে -১৮° সে. এর মধ্যে রাখা হয় তবে অণুজীবের বৃদ্ধি কম হবে। যদি খাদ্যকে -১৮° সে. তাপমাত্রার নীচে রাখা হয় তবে কোন অণুজীবেরই বৃদ্ধি হবে না, তারা অকেজো হয়ে যায় এবং সব ধরনের প্যারাসাইট ও প্রোটোজোয়া একেবারেই ধ্বংস হয়ে যায়। অন্যদিকে সাধারণত ৬০°-এর উপরের তাপমাত্রায় অণুজীবের বৃদ্ধি হয় না। ৭৫° সে. তাপমাত্রায় বা এর উপরে সাধারণত রান্না করা হয়। অণুজীবেরা অনেকে বিষাক্ত স্পোর বা শক্ত আবরণ যুক্ত বীজ তৈরি করে রান্নার তাপমাত্রায় এগুলো ধ্বংস হয় না (যেমন ক্লসট্রিডিয়াম বটুলিনাম)। এগুলো ফুড ইন্ডাস্ট্রিতে ১২১° সে. তাপমাত্রায় ২০ মিনিট ধরে চাপে রান্না করলে এগুলো স্পোরসহ ধ্বংস হয়। একে বলে স্টেরিলাইজেশন। স্পোরগুলো সাধারণত ঘরে রান্নার তাপমাত্রায় ধ্বংস হয় না, তবে এরা সংখ্যায় কম থাকে বিধায় আমাদের ক্ষতি করতে পারে না। তবে রান্নার পর খাদ্য ২ ঘণ্টার মধ্যে খেয়ে ফেলতে হবে। কারণ অনুকূল তাপমাত্রায় বিশেষ করে গৃহের তাপমাত্রায় দীর্ঘক্ষণ থাকলে অণুজীবেরা বিপুলভাবে বৃদ্ধি পায় এবং প্রচুর পরিমাণে স্পোর তৈরি করবে। এজন্য রান্নার চার ঘণ্টার মধ্যে খাদ্য রেফ্রিজারেশন বা ফ্রিজিং তাপমাত্রায় রেখে দিলে অণুজীব বা স্পোরের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে না। খাদ্যগুলো রেফ্রিজারেশন বা ফ্রিজিং তাপমাত্রা থেকে বের করে খাওয়ার আগে অবশ্যই ফের রান্নার মত করে তাপ দিয়ে খেতে হবে, এতে খাদ্য নিরাপদ থাকে।

খাদ্যের অম্লতা (এসিডিটি), পানি, পুষ্টি উপাদানের কণা ইত্যাদিসহ পরিবেশের তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, লবণাক্ততা, অক্সিজেন ও অন্যান্য গ্যাসের কারণে জীবাণুর বৃদ্ধি ও বিকাশে প্রভাব বিস্তার করে। এগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে আমরা নিরাপদ খাদ্য তৈরি করতে পারি। যেমন ক্যানিং করা বা বাতাস ঢুকতে পারে না এমন প্যাকেটজাত খাদ্যে ক্লসট্রিডিয়াম বটুলিনাম বৃদ্ধি পায়। এ ধরণের খাদ্যে এসিড বা অম্ল যোগ করতে হবে বা কেমিকেল প্রিজারভেটিভ যোগ করতে হবে যাতে করে উক্ত বটুলিনাম বৃদ্ধি না পায়। এভাবে খাদ্যকে প্রক্রিয়াজাত ও জীবাণুমুক্তকরণ ও সংরক্ষণে নানা ধরনের টেকনিক ও টেকনোলজি গড়ে উঠেছে। যেমন, শুষ্ককরণ, হিমায়ন, পাঁজন বা ফার্মেনটেশন, প্যাকেজিং, মডিফায়েড গ্যাস প্যাকেজিং ইত্যাদি।

খাদ্য বিজ্ঞান, নিরাপদ খাদ্য ও HACCP

খাদ্য বিজ্ঞানের ধারণা নিয়ে সহজভাবে প্রতিরোধমূলক নিরাপদ খাদ্য তৈরির পদ্ধতিই হলো HACCP। পরিবেশের মাটি, বায়ু, কক্ষ, খাদ্যতৈরির বাসন-পাত্র, ছুরি এবং প্রাণী ইত্যাদি থেকে অণুজীব ও দূষিত পদার্থ এসে খাদ্যকে দূষিত করে। সুতরাং ১) পরিবেশ, ২) পাত্র এবং ৩) মানুষকে পরিচ্ছন্ন হয়ে ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্য তৈরি এবং প্যাকেটজাত করাই এই আধুনিক পদ্ধতি। এগচ বা HACCP এর মূল বিষয় এগুলো এবং এর মাধ্যমে আধুনিকভাবে খাদ্য প্রস্তুত, প্যাকেটজাত, বিতরণ-বন্টন, স্টোরিং, মার্কেটিং ইত্যাদি করা হয়। GMP (Good Manufacturing practice) এবং HACCP (Hazarad Analysis Critical Control Point) এই দুই পদ্ধতি হলো প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা। খাদ্য প্রস্তুত, প্যাকেটজাত, বিলিবন্টন এবং মার্কেটিং কোন রকমে খাদ্য দূষিত হয় না এই আধুনিক ব্যবস্থায়। খাদ্য প্রস্তুত, প্যাকেটজাত, খাদ্য বিতরণ-বন্টন, স্টোরিং, মার্কেটিং ইত্যাদি প্রত্যেক ধাপে সাবধানতার সঙ্গে খাদ্যের প্যাকেট বা ক্যান নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। প্যাকেট যাতে কেটে, ফেটে বা ভেঙে না যায় এবং কোন ক্ষত সৃষ্টি না হয় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে এবং নির্দিষ্ট সেলফ লাইফের মধ্যে খাদ্য বেচা-বিক্রি করতে হবে। ফুড চেইনের প্রত্যেক ধাপেই এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহার করেই মানসম্পন্ন নিরাপদ খাদ্য মানুষকে দেওয়া সম্ভব।

HACCP-এর সাতটি নীতি সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে হবে। HACCP-এর জন্য কিছু Prerequisite Program (পূর্ব আবশ্যক প্রোগ্রাম) রয়েছে, যেমন GMP, Good Agriculture Practice (GAP), Good Aquaculture Practice (GAqP), Good Hygienic Practice (GHP), Standard Operating Procedure (SOP), Ges Sanitary Standard Operating Practice (SSOP) ইত্যাদি।

HACCP ও অন্যান্য আবশ্যক প্রোগ্রামগুলো বাংলাদেশসহ বিশ্বে নতুন পদ্ধতি হিসেবে উপস্থিত হয়েছে। তাই এগুলো জানার জন্য ট্রেনিং, ওয়ার্কশপ এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে নতুন কোর্স হিসাবে পাঠদানের ব্যবস্থা করা জরুরি। এর সঙ্গে আনুষঙ্গিক আধুনিক টেস্টিং ল্যাবরেটরিও গড়ে তোলা জরুরি। যেখানে জরুরি ভিত্তিতে ইনস্পেকশনের যন্ত্রপাতি বা ইকুইপমেন্টস এবং খাদ্যের অন্যান্য গুণাগুণ দেখার জন্য উন্নতমানের আধুনিক ইনস্ট্রুমেন্টসসহ মাইক্রোবায়োলজির ল্যাবরেটরিও গড়ে তোলা জরুরি।

উপসংহার:

সরকার ও জনগণ এ ব্যাপারে যাতে সহযোগিতা করতে পারে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। বর্তমানে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ২০১৩ সালে যুগান্তকারী নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ তৈরি হয়েছে। এ আইন বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণ নিরাপদ খাদ্য গ্রহণ করে নীরোগ দেহে বুদ্ধিমান, জ্ঞানী ও সমৃদ্ধশালী এক মহৎ জাতিতে পরিণত হবে।

জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় নিরাপদ মৎস্য খাদ্য নিশ্চিতকরণ

ড. মোঃ ইনামুল হক

খাদ্য মানুষের অন্যতম মৌলিক অধিকার। মানুষ জীবনধারণের জন্য খাদ্য গ্রহণ করে থাকে। খাদ্য বিজ্ঞানের সংজ্ঞায় শুধু ভক্ষণযোগ্যতা থাকলেই সেটা খাদ্য হিসেবে বিবেচিত হতে পারে না, বরং ভক্ষণযোগ্য খাদ্য তরল বা কঠিন যাই হোক না কেন যদি তা খেলে দৈহিক বৃদ্ধি, রোগ প্রতিরোধ ও কার্যক্ষমতা বজায় থাকে তাকেই খাদ্য বলা হয়। আর নিরাপদ খাদ্য হচ্ছে এমন সেসব খাদ্য যা মানবদেহের জন্য কোনোক্রমেই ক্ষতিকারক নয় বরং ভোক্তা নিশ্চিতভাবে গ্রহণ করতে পারেন। আমাদের দেশে যেখানে প্রাণিজ আমিষের প্রায় ৬০ ভাগ আসে মাছ থেকে, সেখানে নিরাপদ খাবার হিসেবে মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের প্রাপ্যতা অবশ্যই বিবেচনায় আনতে হবে। এ প্রেক্ষিতে মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য শুধু পুষ্টিসমৃদ্ধ হলেই চলবে না, তা সার্বিকভাবে গুণগতমানসম্পন্ন, ভেজালবিহীন ও নিরাপদ হবে এটাই ক্রেতা-বিক্রেতা ও ভোক্তা নির্বিশেষে সবার কাম্য।

জনস্বাস্থ্যের জন্য মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ার কারণ

মাছ বা চিংড়ি উৎপাদনের পুকুর বা ঘের প্রস্তুত থেকে শুরু করে ভোক্তার টেবিলে পৌছা পর্যন্ত অনেকগুলো ধাপ অতিক্রম করতে হয়। এ ধাপগুলোর যেকোনো ধাপে মাছ বা চিংড়ি দূষণযুক্ত হলে তা জনস্বাস্থ্যের জন্যও মারাত্মক ঝুঁকির কারণ হতে পারে। ঝুঁকিপূর্ণ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ নিম্নে দেয়া হলো:

অপরিকল্পিত উপায়ে যত্রতত্র খামারের স্থান নির্বাচন

মাছ বা চিংড়ি চাষের ক্ষেত্রে খামারের স্থান নির্বাচন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুকুর/ঘের তৈরির আগে মাটির গুণগতমান পরীক্ষা করা হয় না। যেখানে গবাদিপশু বা হাঁস-মুরগির খামার আছে, শিল্প ও কলকারখানার বা পয়ঃবর্জ্য নিষ্কাশন হয় বা নিয়মিত কীটনাশক ও রাসায়নিক সার ব্যবহৃত হয়, এমন কৃষি জমিতে মাছ বা চিংড়ির খামার তৈরি সমীচীন নয়।

প্রাণির বর্জ্য সার হিসেবে ব্যবহার

কোনো কোনো চাষী হাঁস-মুরগির বিষ্ঠা, গোবর, মানুষের বর্জ্য কম্পোস্ট না করেই জৈব সার হিসেবে ব্যবহার করে। অথচ এগুলোতে মানুষের জন্য ক্ষতিকারক *Salmonella*, *Shigella*, *E. coli* সহ বিভিন্ন ধরনের অণুজীব বা ব্যাকটেরিয়া থাকে। হাঁস-মুরগির চিকিৎসার জন্য বা অনেক সময় খাবারের সাথে কোন কোন খামারী নাইট্রোফুরান জাতীয় অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করে থাকে। এসব হাঁস-মুরগির বিষ্ঠা পানিতে সার হিসেবে ব্যবহার করলে নাইট্রোফুরান ও এর মেটাবোলাইটস পানিতে মিশে। পরে পানি হতে শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ায় চিংড়ি বা মাছের দেহে প্রবেশ করে শরীরে জমা হতে থাকে। ঐ চিংড়ি বা মাছ তখন খাবার হিসেবে আর নিরাপদ থাকে না।

নিম্নমানের পোনা/পিএল/রেণু মজুদ

মাছ বা চিংড়ির পোনা/পিএল মজুদ করার পূর্বে তার উৎস বিবেচনায় না আনা হলে বা লবণ/পটাশ দিয়ে পরিশোধন করে না ছাড়া হলে অনেক সময় পোনার কারণে নিরাপদ মৎস্য উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে বা উৎপাদিত মৎস্য খাওয়ার জন্য নিরাপদ নাও হতে পারে।

মৎস্য উৎপাদনে ব্যবহৃত মৎস্যখাদ্যে হরমোন ও অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার

দীর্ঘ সময়ব্যাপী স্টেরয়েড জাতীয় খাদ্য ব্যবহারে বা অতিরিক্ত মাত্রায় স্টেরয়েড সমৃদ্ধ খাদ্য খাওয়ালে মারাত্মক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে, যেমন- গোনাড বৃদ্ধি, হাড়ের বিকলঙ্গতা, ঘা সৃষ্টি এবং লিভার, কিডনি ও পোষ্টিক নালীতে রোগ সৃষ্টি হতে পারে। আহরণযোগ্য মাছ চাষে হরমোন ব্যবহার নিষিদ্ধ। মৎস্য পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিষাক্ত অ্যান্টিবায়োটিকস যেমন নাইট্রোফুরান, ক্লোরামফেনিকল ইত্যাদি ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। এ জাতীয় অ্যান্টিবায়োটিক মানুষের শরীরে রক্তশূন্যতাসহ নানান জটিলতা সৃষ্টি করে।

মানসম্মত খাদ্য উপকরণ ব্যবহার না করা ও খাদ্য সংরক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা বজায় না রাখা

অনেক চাষি উৎপাদন খরচ কমানোর জন্য মাছ ও চিংড়ির খাদ্য হিসেবে পচা, নষ্ট বা নিম্নগুণগতমানের গম, ভুট্টা, আটা, গমের ভুসি, চালের খুদ, চালের কুঁড়া, খৈল, গোল আলু, মিষ্টি আলু, মাছের গুঁড়া, ছোট চিংড়ি ইত্যাদি ব্যবহার করে থাকে। এতে পানি

ড. মোঃ ইনামুল হক
প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ

দূষিত হয় এবং খামারের মাছ ও চিংড়ি ক্ষতিকর জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয় যা মানুষের জন্য মারাত্মক ঝুঁকির কারণ হতে পারে। তাছাড়া অধিকাংশ খামারি মাছের খাদ্য সংরক্ষণের ব্যাপারে সচেতন নন। খাদ্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা বজায় রাখা বাঞ্ছনীয়। খাদ্যে আর্দ্রতার পরিমাণ ১০ ও আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৬৫%-এর বেশি থাকলে ছত্রাক বা পোকামাকড় বেশি জন্মাতে পারে এবং তাদের শরীরের এনজাইম খাদ্যের গুণগতমান নষ্ট করে দেয়। অনুকূল তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা পেলে বিভিন্ন প্রজাতির ছত্রাক তৈরি খাদ্য ও খাদ্য উপাদান পচিয়ে ফেলে এক ধরনের বিষ উৎপাদন করে যা কারসিনোজেনিক সাইকোটক্সিক বা নিউরোটক্সিক (carcinogenic cytotoxic or nerotoxic)।

মাছ চাষে ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্যাদির যথেচ্ছা ব্যবহার

আধুনিক মাছ চাষে পুকুরের মাটি ও পানির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, মৎস্য খাদ্য, রোগ দমন এবং অনেক ক্ষেত্রে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন রাসায়নিক উপাদান, ওষুধ ও হরমোন ব্যবহার করা হয়। তাছাড়া, মাছের ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ নিরাময়ের জন্যও অনেক ক্ষেত্রে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করা হয়। আমাদের দেশের অধিকাংশ খামারি এসব রাসায়নিক দ্রব্যের ক্ষতিকর প্রভাব বা নিয়মমাফিক ব্যবহারবিধি সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল নন। রাসায়নিক দ্রব্যাদির এরূপ ব্যবহার নিরাপদ খাদ্য হিসেবে মাছের গ্রহণযোগ্যতা কোনো কোনো ক্ষেত্রে কমিয়ে দেয়। তাছাড়া, মাছ বাজারজাতকরণ ও মৎস্যজাত পণ্য উৎপাদনে ক্ষতিকর উপাদানের ব্যবহার জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকিস্বরূপ।

কীটনাশকের অবাধ ব্যবহার

কৃষি জমিতে রোগবালাই দমন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য বর্তমানে দেশে প্রায় ১০০টি রাসায়নিক গ্রুপের প্রায় ৫০০ কীটনাশক বা বালাইনাশক ব্যবহার করা হচ্ছে। কৃষি জমিতে ব্যবহৃত কীটনাশকের আনুমানিক ২৫% পানিতে ধুয়ে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জলাশয়ে এসে পড়ে। কৃষিতে যথেচ্ছা কীটনাশকের ব্যবহার জলাশয়ের পরিবেশ অনেকাংশে বিনষ্ট করছে। ব্যাপক পরিমাণে কীটনাশক ব্যবহারের ফলে জলজ জীববৈচিত্র্যে হুমকি সৃষ্টিসহ পরিবেশের ওপর নানারূপ ক্ষতিকর প্রভাব ফেলেছে। ফলশ্রুতিতে জলজ পরিবেশ হচ্ছে মারাত্মকভাবে দূষিত আর ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে মাছসহ অন্যান্য জলজ প্রাণির জীববৈচিত্র্য, পরিবেশের ভারসাম্য আর প্রাকৃতিক খাদ্যচক্র। কীটনাশক অনেক ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিকভাবে মাছ ও অন্যান্য জলজ-জীবের মৃত্যু ঘটায়। কিছু কিছু কীটনাশকের অবশেষ মাছ ও চিংড়ির শরীরে পুঞ্জীভূত হয়, যা মানব শরীরে ক্যান্সার সৃষ্টি করতে পারে।

যথাযথ আহরণোত্তর পরিচর্যার অভাব

মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের গুণগতমান ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আহরণোত্তর পরিচর্যা বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে আহরণোত্তর পরিচর্যা করলে মৎস্য ও চিংড়ি খাদ্য হিসেবে অনিরাপদ হয়। মাছ বা চিংড়ি উৎপাদনের পর আহরণোত্তর অর্থাৎ ধরা থেকে শুরু করে ভোক্তার টেবিলে না পৌঁছানো পর্যন্ত পরিচর্যা সঠিক পদ্ধতিতে না হলে ভোক্তার জন্য তা নিরাপদ থাকে না।

মৎস্যচাষ ও মৎস্যপণ্য উৎপাদনে নিষিদ্ধ ঘোষিত উল্লেখযোগ্য ওষুধ ও রাসায়নিক দ্রব্যের তালিকা

১। স্টিলবিনস এবং তার সহযোগী লবণ ও অ্যাস্টার (চিংড়ি হ্যাচারির জন্য উক্ত দ্রব্যাদি পরীক্ষা করতে হবে)

২। স্টেরয়েড

৩। ইসি (European Commission) নির্দেশিত ২৩৭৭/৯০, ২৬ জুন ১৯৯০-এর সংযুক্তি ৪-এ উল্লেখিত ড্রাগসমূহ যেমন: ক্লোরামফেনিকল, ক্লোরোফর্ম, ক্লোরোপ্রমাজিন, কোলচিসিন, ডেপসন, ডাইমেট্রিডাজল, মেট্রোনিডাজল, নাইট্রোফিউরান এবং রোনোপ্রাজন

USFDA অনুমোদিত মৎস্যচাষে ব্যবহারযোগ্য ওষুধের তালিকা এবং ব্যবহার মাত্রা

দ্রবণ/যৌগের নাম	ব্যবহার
ক্রোনিক গোনাডোট্রপিন	স্পনিং কার্যক্রম উন্নয়নের জন্য ব্রুড-এর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাইবে। (২১ সিএফআর-৫২২-১০৮১)।
ফরমালিন দ্রবণ	প্রোটোযোয়া এবং মনোজেনেটিক ট্রেমাটোড এবং ফাংগি (fungi) নিয়ন্ত্রণে ব্যবহার করা যাইবে (২১ সিএফআর-৫২৯-১০৩০)। খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হইবে এমন কোনো মৎস্য বা তাহার মাংসল অংশে ব্যবহার করা যাইবে না।
ট্রাইকেইন-মিথেন সালফোনেট	ক্যাটফিস, ট্রাউট, স্যালমন, পাইক, পার্চ এর ক্ষেত্রে খুবই স্বল্প পরিমাণে হ্যাচারিতে ব্যবহার করা যাইবে। ব্যবহারের ২১ দিনের মধ্যে কোনো মৎস্য ধরা যাইবে না (২১ সিএফআর-৫২৯-২৫০৩)।
অক্সিটেট্রাসাইক্লিন	চিংড়ি ও মাছের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাইবে। ব্যবহারের কমপক্ষে ৩০ দিন পর মৎস্য ধরা যাইবে (২১ সিএফআর-৫৫৮-৪৫০)।
সালফাডাইমিথোক্সিন বা অরমেট্রপিন যৌগ	চিংড়ি ও মাছ জাতীয় মৎস্যে ব্যবহার করা যাইবে। ব্যবহারের কমপক্ষে ৪২ দিন পর মৎস্য ধরা যাইবে। মৎস্যের মাংসল অংশে এর গ্রহণযোগ্য মাত্রা ০.১ পিপিএম (২১ সিএফআর-৫৫৬-৬৪০)।

রোগ প্রতিরোধে হ্যাচারিতে ব্যবহৃত রাসায়নিক দ্রব্যাদি ও ওষুধের নাম	
ব্লিচিংপাউডার (৬০-৬৫% ক্লোরিন)	ইডিটিএ (Ethylene Di-amino Tetra acetic Acid)
সোডিয়াম হাইপো-ক্লোরাইড (তরল)	এ্যাকোয়াকালচার প্রোবায়োটিক্স
ফরমালিন (ল্যাব গ্রেড)	জুথামসাইড/প্রোটোজোয়াসাইড
ফরমালিন (কমার্শিয়াল গ্রেড)	মিথিলিন ব্লু
সোডিয়াম থায়োসালফেট	ভিটামিন প্রিমিক্স/মাল্টিভিটামিন/ভিটামিন-সি
সোডিয়াম বাই-কার্বনে	এমএস-২২, চেতনানাশক
অক্সি-টেট্রাসাইক্লিন	কুইনালডিন, চেতনানাশক
টেফলন	ক্লোভ অয়েল, চেতনানাশক
প্রিফুরান	খাবার লবণ, ছত্রাকনাশক ও জীবাণুনাশক

মৎস্য প্রজননে ব্যবহৃত হরমোন/প্রণোদক:

- প্রাকৃতিক প্রণোদক: পি.জি., এল.আর.এইচ (L.H.R) এবং এফ.এস.এইচ (F.S.H)
- সিনথেটিক প্রণোদক: ওভাপ্রিম, এইচ.সি.জি (H.C.G) ওভাক্লিন
- H.C.G গ্লাইকোপ্রোটিন
- পি.জি. - মাছের মাথার খুলির মধ্যে থাকে।

স্বাস্থ্যের জন্য নিরাপদ মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য নিশ্চিতকরণের উপায়সমূহ

১. উত্তম মৎস্যচাষ অনুশীলনের (Good/Best Aquaculture Practice) যথাযথ বাস্তবায়ন

উত্তম মৎস্য চাষ অনুশীলনের উদ্দেশ্য হলো:

- ভোক্তার জন্য নিরাপদ ও মানসম্মত মাছ ও চিংড়ি উৎপাদন করা
- মানবদেহে রোগ সৃষ্টি করতে পারে এমন রোগজীবাণু দ্বারা মাছ বা চিংড়ি যেন সংক্রমিত না হয় তার ব্যবস্থা করা
- ক্ষতিকর অ্যান্টিবায়োটিক বা রাসায়নিক দ্রব্যাদি বা কোন কীটনাশক দ্বারা মাছ বা চিংড়ি যেন দূষিত না হয় তার ব্যবস্থা করা
- চাষের শুরু থেকে আহরণ ও আহরণোত্তর পরিচর্যা পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে চাষীর এমন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করা যেন উৎপাদিত মাছ বা চিংড়ি জনস্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে

২. হ্যাসাপ (HACCP) ব্যবস্থাপনার যথাযথ বাস্তবায়ন

হ্যাসাপ হলো পণ্যের গুণগতমান নিশ্চিতকরণের একটি আধুনিক পদ্ধতি। এটি বিজ্ঞানভিত্তিক, যুক্তিসংগত, সুসংগত, নিখুত এবং প্রোঅ্যাকটিভ পদ্ধতি। নিরাপদ মৎস্য ও সুস্থ জীবন নিশ্চিত করতে উত্তম মৎস্য চাষ অনুশীলন ও হ্যাসাপের বিকল্প নেই। উত্তম মৎস্য চাষ অনুশীলন ও হ্যাসাপ সঠিকভাবে অনুসরণ করলে,

- মাছ ও চিংড়ি রোগ সৃষ্টিকারী বা মানুষের জন্য ক্ষতিকর কোন জীবাণু দ্বারা সংক্রমিত হবে না।
- ক্ষতিকারক অ্যান্টিবায়োটিক বা রাসায়নিক দ্রব্যাদি ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত হবে।
- নিষিদ্ধ নয় এমন অ্যান্টিবায়োটিক বা রাসায়নিক দ্রব্যাদি ব্যবহার সঠিক মাত্রায় ব্যবহৃত হবে এবং বিষক্রিয়ার মেয়াদকাল যথাযথভাবে অনুসরণ করা হবে।

৩. মাছ চাষে দায়িত্বশীল আচরণবিধি (Code of Conduct for Responsible Fish Culture) মেনে চলা

৪. মৎস্য শিল্পে (হ্যাচারি, খামার ও চাষে) এবং বাজার ব্যবস্থায় রাসায়নিক দ্রব্য ও ওষুধের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ

- মৎস্য হ্যাচারি ও খামার রেজিস্ট্রেশন করা
- হ্যাচারি ও খামার সার্টিফিকেশন করা
- নিয়মিতভাবে হ্যাচারি, খামার ও বাজার পরিদর্শন করা
- নিয়মিতভাবে মৎস্য খাদ্যের নমুনা পরীক্ষ করা
- মাছ ও মাছজাত পণ্যের ট্রেসেবিলিটি দেখা
- ফিড মিল, ফিড আমদানি ও ফিড বিক্রেতাদের জন্য রেজিস্ট্রেশন ও লাইসেন্সিং পদ্ধতি চালু করা
- খাদ্যে অবৈধ রাসায়নিক দ্রব্য ও ওষুধের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা

জনস্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য নিরাপদ মৎস্য সংক্রান্ত আইন, বিধিমালা এবং পলিসি গাইডলাইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন

মাছসহ বিভিন্ন খাদ্যে ক্ষতিকর দ্রব্য শনাক্তকরণে আমাদের দেশে সবচেয়ে বড় দুর্বলতা ছিল উপযুক্ত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো না থাকা। রপ্তানি বাণিজ্যে চিংড়ির মান নিশ্চিতকরণে আমরা অনেকদিন পর্যন্ত বাইরের দেশের ল্যাবরেটরির মুখাপেক্ষী ছিলাম। কিন্তু গত কয়েক বছরে মৎস্য অধিদপ্তর, সায়েন্স ল্যাবরেটরিতে আধুনিক যন্ত্রপাতি যেমন: GC-MS/MS, LC-MS/MS মেশিন সংযোজনের পর এক্ষেত্রে ব্যাপক অগ্রগতি হয়েছে। বাগেরহাটস্থ চিংড়ি গবেষণা কেন্দ্র ও নদী কেন্দ্র, চাঁদপুরে GC-MS ও LC-MS মেশিন স্থাপিত হওয়ায় এক্ষেত্রে মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের দক্ষতাও বৃদ্ধি পেয়েছে। মৎস্য অধিদপ্তরের BEST প্রকল্পের আওতায় সাভারে জাতীয় মৎস্য চাষ ও পণ্যের রেফারেন্স ল্যাবরেটরি (Aquaculture & Aquatic Food Safety Center) স্থাপিত হয়েছে। রপ্তানি পণ্য মাছ ও চিংড়ির আন্তর্জাতিক মান সংরক্ষণে সকল ধরণের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে।

জনস্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য নিরাপদ মৎস্য খাদ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দেশি ও বিদেশি ভোক্তাদের জনস্বাস্থ্যের বিষয় বিবেচনায় রেখে মৎস্য ও চিংড়ির গুণগত মান বজায় রাখার নিমিত্তে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের গবেষণালব্ধ ফলাফলের আলোকে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাংলাদেশের যুগোপযোগী একাধিক আইন, বিধিমালা ও পলিসি গাইডলাইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। যেমন: মৎস্য ও মৎস্যপণ্য (পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ২০০৮, সংশোধিত ১৯৯৭। মৎস্য খাদ্য ও পশুখাদ্য আইন ২০১০ এবং মৎস্য হ্যাচারি আইন ২০১০। মৎস্য খাদ্য বিধিমালা ২০১১ ও মৎস্য হ্যাচারি বিধিমালা ২০১১ প্রক্রিয়াধীন। মৎস্য সঙ্গনিরোধ আইন ২০১১ প্রণয়ন চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। জাতীয় রেসিডিউ নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পলিসি গাইডলাইন ২০০৮ থেকে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। তাছাড়া দেশের মৎস্য ও চিংড়ির রাসায়নিক দূষণ প্রতিরোধ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ন্যাশনাল ওয়ার্কিং কমিটি ২০০৯ সাল থেকে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সর্বোপরি নিরাপদ মাছ পাওয়ার জন্য ভোক্তাদের সচেতন হতে হবে। ব্যবসায়ীদের সচেতন করার জন্য এ ব্যাপারে উদ্বুদ্ধমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। মিডিয়াগুলোয় প্রচার প্রচারণা করে গণসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে।

নিরাপদ খাদ্য ও জনস্বাস্থ্য

ড. মোঃ হাফিজুর রহমান

জীবন ধারনের জন্য নিরাপদ খাদ্য অপরিহার্য। সুস্বাস্থ্যের মূলেই নিরাপদ খাদ্য জরুরি যেমন পরিধানের জন্য বস্ত্র, চিকিৎসার জন্য ওষুধ। প্রথমেই আসা যাক নিরাপদ খাদ্য কি? নিরাপদ খাদ্য হলো এক বা একাধিক পদক্ষেপ যা ভোক্তার স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য খাদ্যকে খাদ্যের বিভিন্ন বিপত্তি (Hazard) থেকে রক্ষা করে। খাদ্যকে দূষিত করতে পারে তথা মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক খাদ্যস্থিত যে কোনো কিছুকে খাদ্য বিপত্তি বলা হয়। খাদ্য সংশ্লিষ্ট বিপত্তি নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে খাদ্য ব্যবসার সাথে জড়িত খাদ্য কর্মীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ দূষিত খাবার খেয়ে রোগাক্রান্ত হচ্ছে এবং যাদের অনেকেই গুরুতর অসুস্থ হচ্ছে। কেউ কেউ আবার সারা জীবনের জন্য রোগাক্রান্ত হচ্ছে যা জেনিটিক্যাল মডিফিকেশন করে থাকে এবং তা বংশ পরম্পরায় আক্রান্ত হচ্ছে। খাদ্যবাহিত রোগে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হচ্ছে শিশু, বয়স্ক ব্যক্তি, গর্ভবতী মহিলা এবং যারা আগে থেকেই অন্য কারণে অসুস্থ। খাদ্য বিপত্তিসমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে বিপত্তি চার ধরনের উৎস থেকে আসে (১) অণুজীব ঘটিত খাদ্য বিপত্তি (২) ভৌত বিপত্তি (৩) রাসায়নিক খাদ্য বিপত্তি ও (৪) এলার্জি সৃষ্টিকারী উপাদান ।

ব্যাকটেরিয়া একটি এককোষী ক্ষুদ্র অণুজীব যা খালি চোখে দেখা যায় না। এদের অধিকাংশ ক্ষতিকারক, খাদ্য বিষক্রিয়া ও পচন সৃষ্টি করে। সাধারণত ইঁদুর , তেলাপোকা, পোষা প্রাণী, ময়লা আবর্জনা ও নষ্ট খাবার ব্যাকটেরিয়ার প্রধান উৎস। ব্যাকটেরিয়া বংশ বৃদ্ধির জন্য উপর্যুক্ত আদর্শ তাপমাত্রা হল ৫-৬০° সেঃ। খাদ্য বিষক্রিয়া সৃষ্টির জন্য দায়ী ব্যাকটেরিয়া সাধারণত প্রতি ২০ মিনিট অন্তর অন্তর বংশবৃদ্ধি করতে পারে। বাস্তবতা হলো খাদ্য শৃঙ্খলের বিভিন্ন পর্যায় ও ক্ষেত্রে এমন কোনো খাদ্য ব্যবস্থা নেই যেখানে খাদ্যে বিষক্রিয়া বা পচন সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়া উপস্থিত থাকে না। সাধারণত ব্যাকটেরিয়া তার উৎস থেকে আহারযোগ্য অথবা রান্নাকরা খাবারের সংস্পর্শে বিভিন্ন মাধ্যমে যেয়ে থাকে। যেমন- হাত, পরিধেয় বস্ত্র, খাদ্য প্রস্তুতকরণে ব্যবহৃত সরঞ্জামাদি ও তৈজসপত্র এবং অন্যান্য খাদ্য স্পর্শক দ্রব্য।

এসব অণুজীব ঘটিত বিপত্তি থেকে খাদ্য নিয়ন্ত্রণ করতে হলে কোনো ভাবেই যেন ক্ষতিকারক ব্যাকটেরিয়া রান্না করা খাবারের সংস্পর্শে যেতে না পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। খাবার পরিবেশনকালে যথাসম্ভব হাত "Sanitizer" দিয়ে ভালোভাবে ধৌত করতে হবে। কাঁচা ও রান্না করা খাবার আলাদাভাবে রাখতে হবে। ধোয়া মোছার জন্য ব্যবহৃত পানি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হতে হবে। কীটপতঙ্গ যাতে খাবারে বসতে না পারে সেদিকে খেয়াল রাখা।

দ্বিতীয়ত, ভৌত খাদ্য বিপত্তিসমূহ, যার উৎস হলো: সাধারণত দালানকোঠার ইট-সুরকি, যন্ত্রপাতি ও রক্ষণাবেক্ষণ সামগ্রীর ভাঙা অংশ। এসব বিপত্তি খাদ্যকে মারাত্মক বিপত্তির মুখে না ফেললেও ঝুঁকি রয়েই যায়। তাই এর নিয়ন্ত্রণও জরুরি। সাধারণত অনুমোদিত সরবরাহকারী, কর্মচারীদের সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ, স্থাপনা ও যন্ত্রপাতি যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ, কাঠের তৈরি আসবাবপত্র ও সরঞ্জামাদি ব্যবহার করে এর প্রতিরোধ সম্ভব।

তৃতীয়ত, আসা যাক রাসায়নিক বিপত্তিসমূহে যা বর্তমানে বাংলাদেশে জনস্বাস্থ্যের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাসায়নিক খাদ্য বিপত্তি সাধারণত কৃষক পর্যায় বা মাঠ পর্যায় থেকে শুরু হয়ে থাকে। কৃষক সাধারণত কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণের জন্য রাসায়নিক দ্রব্যাদি স্প্রে করে থাকে কিন্তু অসচেতনতার ফলে তা প্রত্যাহারকালীন সময়ের আগে মাঠ থেকে উঠিয়ে বাজারে বিক্রি করে থাকে। যা ভোক্তা না জেনেই খেয়ে থাকে। মনে রাখা দরকার যে, রাসায়নিক উপাদান রান্না করার পরও নষ্ট হয় না।

দ্বিতীয়ত হলো, স্যানিটাইজিং উপাদান, যা খাদ্য বিপত্তির আরেকটি অন্যতম উৎস। রাসায়নিক খাদ্য বিপত্তি থেকে রক্ষা পেতে কিছু কিছু সুনির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলতে হবে খাদ্য উৎপাদন পর্যায় থেকে শুরু করে পরিবেশন পর্যন্ত। প্রথমত, ক্ষেতে কীটনাশক, বালাইনাশক স্প্রে করার পর তার প্রত্যাহার-কালীন সময় অতিবাহিত হওয়ার আগেই ক্ষেত থেকে ফসল উঠানো যাবে না। দ্বিতীয়ত, সঠিক মাত্রায় এসব রাসায়নিক দ্রব্যাদি স্প্রে করতে হবে। অনুমোদন নেই এমন রাসায়নিক দ্রব্য ও বালাইনাশক ব্যবহার থেকে বিরত থাকতে হবে।

ড. মোঃ হাফিজুর রহমান
সহযোগী অধ্যাপক, ফলিত পুষ্টি ও খাদ্য প্রযুক্তি বিভাগ
ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া-৭০০৩।

খাদ্য বিপত্তির চতুর্থ কারণ হলো: এলার্জি সৃষ্টিকারী ও অসহিষ্ণু খাদ্যসমূহ: এলার্জি সৃষ্টিকারী খাদ্যোপকরণ বলতে ঐ সকল খাদ্যোপকরণ অথবা তা থেকে প্রস্তুতকৃত খাদ্যপণ্যকে বুঝায়, যা সংবেদনশীল ভোক্তার শরীরবৃত্তীয় এলার্জিক ও অন্যান্য প্রতিক্রিয়া ঘটায়। এই অসহিষ্ণু খাদ্য ও খাদ্যোপকরণ থেকে রক্ষা পেতে এসব খাদ্য চিহ্নিতকরণ এবং বাছাই করে আলাদা রাখতে হবে, এবং সংশ্লিষ্ট বিধিবিধান কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে। বিশেষ করে খাদ্যের মোড়কের গায়ে কি কি উপাদান আছে তা উল্লেখ থাকতে হবে এবং তার প্রভাব সমূহ। খাদ্য প্রক্রিয়ায় রঞ্জক একটি বিশেষ উপাদান যা প্রায় প্রতিটি খাদ্যের সাথেই থাকে। এই উপাদানসমূহ কোনো কোনো শরীরে বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। ফলে এসব রঞ্জক ব্যবহার করার পূর্বে অনুমোদিত এবং Rules and Regulation মেনে ব্যবহার করতে হবে। খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণে রান্নাঘর একটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা যেখান থেকে খাদ্য তৈরি হয়ে থাকে। সুতরাং কিছু বিশেষ দিক লক্ষ রাখতে হবে নিরাপদ খাদ্য রান্না করার সময়। যেমন: রান্নাঘরের মেঝে পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে যাতে খাদ্য সংক্রমণ না হয়। যন্ত্রপাতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হতে হবে এবং পরিষ্কার পানি দিয়ে ধৌত করতে হবে। যারা রান্নার কাজে নিয়োজিত তাদের শারীরিক সুস্থতা ও পরিধেয় বস্ত্র পরিষ্কার হতে হবে। খালি হাতে রান্না ও রান্নার উপকরণ নাড়াচড়া না করা। রান্না অবস্থায় খালি হাতে খাদ্যের স্বাদ গ্রহণ না করা, প্রয়োজনে পরিষ্কার চামচ ব্যবহার করা। কাঁচা শাকসবজি ভালোভাবে পানি দিয়ে পরিষ্কার করা, প্রয়োজনে লবণ পানি দিয়ে ধৌত করা। সব রান্নার উপকরণাদি খাওয়ার উপযুক্ত পানি দিয়ে ধৌত করা। সর্বোপরি রান্নাঘরটি সুসজ্জিত এবং স্যাতসেঁতে থেকে দূরে রাখা। আমাদের আরেকটি সমস্যা হলো খাদ্যে ভেজাল, যা খাদ্যকে অনিরাপদ করে। খাদ্যে ভেজাল রোধে মাঠ থেকে সকল পর্যায়ে কঠোর আইনের আওতায় আনতে হবে। ক্রেতা এবং বিক্রেতাদের সচেতন করে তুলতে হবে যেন ভেজালযুক্ত খাবার তৈরি এবং পরিবেশন না করে। খাবার নিয়ে মুখরোচক বিজ্ঞাপন যা নিয়মবহির্ভূত তা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। রাস্তায় বিক্রিত খাবার নিয়মের মধ্যে আনতে হবে যা স্বাস্থ্যের জন্যে ঝুঁকিপূর্ণ। খাদ্যকে বিপত্তিমুক্ত করতে ব্যক্তিগত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সবাইকে বুঝতে হবে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বিষয়ক আইনের বিধিবিধান অমান্য করলে বিচারের সম্মুখীন হতে হবে। খাদ্য উৎপাদনের পর তার বর্জ্য সঠিক জায়গায় রাখতে হবে যাতে দূষণ এড়ানো যায়। সর্বোপরি আধুনিক পদ্ধতি হ্যাসাপ (হ্যাজার্ড এনালাইসিস এন্ড ক্রিটিক্যাল কন্ট্রোল পয়েন্ট) মেনে খাদ্য উৎপাদন, বাজারজাত করণ ও পরিবেশন করলে খাদ্য নিরাপদে সহায়ক হবে। এই হ্যাসাপ সিস্টেমের প্রতিটি ধাপ মেনে খাদ্য তৈরি করলে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। খাদ্য নিরাপদ রাখার পাঁচটি চাবিকাঠি- যেমন, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা , কাঁচা ও রান্না করা খাদ্য পৃথক রাখা, সঠিক তাপমাত্রায় (৬৫° সে. এর উপরে) রান্না করা, সঠিক তাপমাত্রায় খাদ্য সংরক্ষণ (৫° সে. এর নিচে এবং ৬০° সে. এর উপরে), নিরাপদ খাদ্যোপকরণ ও পানি ব্যবহার করতে হবে। এবং সকল পর্যায়ে ব্যাকটেরিয়াকে প্রতিহত করার ব্যবস্থা করতে হবে।

একটি দেশ ও জাতিকে সুস্বাস্থের অধিকারী করে তুলতে নিরাপদ খাদ্যের বিকল্প নেই। এ লক্ষ্যে সরকার ও সকল পেশার মানুষকে ঐকাবদ্ধ হতে হবে। "Safe Food Safe Nation"- এটাই হোক আমাদের সকলের প্রত্যাশা।

নিরাপদ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে অপচয়রোধ

ড. তরুণ কান্তি শিকদার

জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে আমরা বিভিন্ন দিবস পালন করে থাকি। এসব দিবস জাঁকজমকের সাথে পালনের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো বিষয়টির প্রতি গুরুত্বারোপ করে জনজীবনে তার প্রভাব বিস্তার করা। যেমন বিশ্ব পরিবেশ দিবস, পানি দিবস, বিদ্যুৎ দিবস, দুর্যোগ প্রশমন দিবস, জনপ্রশাসন দিবস, আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস, বিশ্ব নিরাপদ খাদ্য দিবস ইত্যাদি লক্ষণীয় যে এভাবে উদযাপনকৃত প্রতিটি দিবসই গণমানুষের জীবনযাত্রার সাথে সম্পৃক্ত। মানুষের শিক্ষা বিস্তার, জ্ঞানচর্চা এবং জীবনধারণের জন্য অপরিহার্য বিষয়গুলোকে প্রতিপাদ্য করে বিশেষ দিন হিসাবে পালন করা হয়। প্রতিটি দিবসের গুরুত্ব ও মানুষের প্রয়োজনীয়তার ওপর নির্ভর করে প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়। এ বছর নিরাপদ খাদ্য দিবসের মূল প্রতিপাদ্য 'নিরাপদ খাদ্যে ভরবো দেশ, সবাই মিলে গড়বো সোনার বাংলাদেশ'। প্রতিপাদ্যটির মধ্যে তিনটি বিষয় লুকায়িত আছে। যা হলো নিরাপদ খাদ্য, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা ও সমৃদ্ধ সোনার বাংলা। এই প্রবন্ধের মূল বিষয় খাদ্য অপচয়রোধের মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করা। জীবনধারণের জন্য খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা যেমন অপরিসীম তেমনি খাদ্যের গুণগত মান বজায় রাখা ও প্রকৃত পুষ্টিমানসমৃদ্ধ খাবার গ্রহণের প্রয়োজনীয়তাও অপরিহার্য। তবে উৎপাদিত খাদ্য পণ্যের সুষম বণ্টন ব্যবস্থা নিশ্চিত করে উৎপাদিত খাদ্যের অপচয়রোধ করা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। খাদ্যের এই অপচয়রোধ করতে পারলেই খাদ্য উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পাবে, নিশ্চিত হবে নিরাপদ খাদ্য সরবরাহ এবং খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধি পাবে।

এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ২০১৩ খ্রিঃ বিশ্ব পরিবেশ দিবসের প্রতিপাদ্য ছিল Think.Eat.Save যা বাংলায় 'ভেবে চিন্তে খাই অপচয় কমাই'। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ২০১৩ খ্রি. এই প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়। বর্তমান বিশ্বে প্রায় ৭৩৫ কোটি মানুষের বাস। এদের অন্নের সংস্থান আজ সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। দি এনভারমেন্টাল ফুড ক্রাইসিস রিপোর্টের তথ্য অনুযায়ী, আগামী ২০৫০ সাল নাগাদ বিশ্বে খাদ্য উৎপাদন ২৫% শতাংশ কমে যাবে যদি জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষতিসমূহ দ্রুত মোকাবিলা করা সম্ভব না হয়। অন্যদিকে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ১০ বিলিয়নে উন্নীত হবে। এই সংকটময় অবস্থায় একমাত্র পরিকল্পিত খাদ্য ব্যবস্থাপনা, গবেষণা, চিন্তাশীল উৎপাদন কৌশল ও খাদ্য তালিকা নির্বাচন এই বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে। যেমন একটি বিকল্প পশুখাদ্য হিসেবে শস্যদানার (Cereal) ব্যবহার কমিয়ে বিকল্প পশুখাদ্য উৎপাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ। কারণ বিশ্বের উৎপাদিত শস্যদানার ৪১-৪৫%-ই পশুখাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয়। যা বিশ্বের তিন বিলিয়ন মানুষের খাদ্য চাহিদা পূরণ করতে পারে। তাছাড়া এসব খাদ্য উৎপাদনে প্রচুর পরিমাণে সুপেয় পানিসহ প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহৃত হচ্ছে। যেমন এক কিলোগ্রাম মাংস উৎপাদনে সাকুল্যে ১৬,০০০ লিটার সুপেয় পানি ব্যবহার করা হয়। এক কেজি ধান উৎপাদনে প্রয়োজন হয় ৩,০০০ লিটার সুপেয় পানি। আর এসব উৎপাদনের প্রতিটি পর্যায়ে রয়েছে পর্যাপ্ত পরিমাণ জিএইচজি (GHG) গ্যাস নির্গমনের ভূমিকা। কিন্তু এত শ্রম, অর্থ ও পরিবেশ বিপর্যয়ের ঝুঁকি নিয়ে উৎপাদিত খাদ্যশস্য প্রতিনিয়ত নির্বিচারে নষ্ট হচ্ছে। তাই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে পরিবেশ সম্পর্কে গণজাগরণ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিশেষ দিবসসমূহে খাদ্য ও খাদ্যদ্রব্য অপচয়ের হাত থেকে রক্ষার জন্য সকলকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। তাহলে খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধি পাবে।

এবার প্রতিপাদ্যের Think. Eat. Save তিনটি বিষয়ের ওপর আলোচনা করা যাক :

Think ভাবনা:

যে কোনো কাজ করার পূর্বে চিন্তা ভাবনা করে কাজ করাই বুদ্ধিমানের কাজ। কথায় বলে 'ভাবিয়া করিও কাজ, করিয়া ভাবিও না'। একজন বুদ্ধিমান ও সচেতন ক্রেতা হিসেবে আপনি নিজেকে কতটা যোগ্য মনে করেন? আপনি কি প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পানির অপচয় রোধ করতে সক্ষম? আপনি কি অপ্রয়োজনীয় বাতিগুলো বন্ধ করে বিদ্যুৎ শক্তির অপচয় রোধ করতে সক্ষম? আপনি কি জ্বালানি সাশ্রয়ে সচেতন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন? আপনি কি আপনার শহর বা পাল্লিপার্শ্বের সুষ্ঠ বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ভূমিকা রাখতে পারছেন? আপনি কি কোন দায়িত্বশীল সংগঠনের সাথে একত্রিত হয়ে একটি উন্নয়নশীল পরিবেশসম্মত শহর গড়ে তোলার আন্দোলনের গর্বিত অংশীদার? যদি এগুলো সত্যও হয় তাহলেও আপনার অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, আপনি অসাবধানতাবশত যত খাদ্য ক্রয় করছেন তার প্রায় অর্ধেক ব্যবহারের পূর্বেই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আর বিশ্বব্যাপী এ কাজের সঙ্গে সবাই জড়িত। তাই বিষয়টি একটু ভিন্নভাবে চিন্তা ও অন্যকে চিন্তার খোরাক দিতে হবে। পরিসংখ্যান মতে, বিশ্বে যখন এক শত কোটি মানুষ (প্রতি সাত জনে একজন) ক্ষুধা নিয়ে রাতে ঘুমাতে যায়, তখন উপর তলার মানুষগুলো বা উন্নত বিশ্ব নির্দ্বিধায় মূল্যবান খাদ্য অপচয় করে।

ড. তরুণ কান্তি শিকদার
যুগ্ম সচিব (প্রশাসন), প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

FAO-এর তথ্য মতে, প্রতিবছর অস্ট্রেলিয়া চার মিলিয়ন টন খাদ্যের অপচয় করে। যা পরিবারপ্রতি প্রায় ১০০০ কিলোগ্রাম। আমেরিকার বার্ষিক উৎপাদন ১৮০ বিলিয়ন টন, যার মধ্যে ৫০ বিলিয়ন টন নষ্ট হয়। ইউরোপিয়ান দেশের উৎপাদিত খাদ্যের ২৫% ফুড চেইন থেকে নষ্ট হয়ে যায়। ডেনমার্ক প্রতি বছর ২.৯৩ বিলিয়ন ইউএস ডলার মূল্যের খাদ্য অপচয় করে। FAO-এর হিসাব মতে, বিশ্বে প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ খাদ্য (যার পরিমাণ ১.৩ বিলিয়ন টন) প্রতি বছর অপচয় হচ্ছে। FAO-এর এই প্রতিবেদন থেকে জানা যায় প্রতি বছর ইউরোপ ও নর্থ আমেরিকার মাথাপিছু খাদ্য অপচয়ের পরিমাণ ৯৫-১১৫ কিলোগ্রাম। কিন্তু আফ্রিকা ও এশিয়ায় এর পরিমাণ প্রতি বছর মাত্র মাথাপিছু ৬-১১ কিলোগ্রাম। যদিও উন্নয়নশীল দেশের খাদ্য অপচয়ের অন্যতম কারণ হলো আর্থিক সংকট, উন্নত ব্যবস্থাপনার অভাব, উন্নত কারিগরি সহায়তার অভাব এবং কৃষিপণ্য চাষ, সংরক্ষণ জনিত অবকাঠামোর অপ্রতুলতা ও বিপণন ব্যবস্থার দুর্বলতা। অন্যদিকে উন্নত বিশ্বে খাদ্য অপচয়ের অন্যতম কারণ এর গুণগত মান নির্ধারণ। অধিকাংশ প্যাকেটজাত খাদ্যের গায়ে লেখা থাকে Best-before-dates or 'use by dates'। ফলে মেয়াদ উত্তীর্ণের পর এসব খাদ্যদ্রব্য সরাসরি নষ্ট করে দেওয়া হয়। শুধু বিপণন কৌশল ও চাহিদা নিরূপণ না করে পণ্য উৎপাদনের জন্য এই ধরনের অপচয় হয়। সারা বিশ্বে ২০,০০০ হাজার শিশু খাদ্যের অভাবে প্রতিদিন মৃত্যুবরণ করছে। এই মানবিক কারণ ছাড়াও খাদ্য নষ্ট মানে প্রাকৃতিক সম্পদ নষ্ট। যেমন মাটি, পানি, বায়ু, মানুষের শ্রম, অর্থ ও জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার। খাদ্যের অপচয়িত অংশ আবার মিথেন, কার্বন ডাই অক্সাইড ইত্যাদি গ্রিন হাউজ গ্যাস উৎপাদন করে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তনে ভূমিকা রাখছে। এই বিষয়টি উৎপাদক, ভোক্তা, সরকারি ও বেসরকারি নীতিনির্ধারক পর্যায়ে সকলকে সচেতন করে তোলা প্রয়োজন।

Eat : (Educate, Activate, Transform)

খাদ্য গ্রহণ মানব জীবনের অন্যতম প্রধান কাজ। যে কোনো প্রাণীর দেহের গঠন ও জীবন ধারণের জন্য খাদ্য গ্রহণ অপরিহার্য। কিন্তু এই খাদ্য গ্রহণ কারো জন্য জীবন ধারণের, আবার কখনোবা কারো বিলাসিতা বা অপচয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ব্যক্তিজীবনে খাদ্যের অপচয় সমাজে ব্যাপক অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত সমস্যা তৈরি করে। তাই একজন চিন্তাশীল ব্যক্তিকে সর্বদা সচেষ্ট থাকতে হয়। তার চারপাশের মানুষগুলোকে খাদ্যের অপচয় যেন না হয় সে বিষয়ে সচেতন করে তুলতে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হয়। তিনিই একজন দায়িত্বশীল ভোক্তা যিনি নিজের খাদ্যের তালিকা যথার্থভাবে নির্বাচনে সক্ষম হন। যিনি EAT শব্দটির প্রকৃত অর্থ অনুধাবনে সতর্ক থাকেন অর্থাৎ E= Education, A= activate and T= Transmission-এর চর্চা করে থাকেন। যিনি কম কিনুন, কম খান এবং কম অপচয় করুন এই মতবাদ সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে একজন বিশ্ব নাগরিক হিসেবে কাজ করতে আন্তরিকভাবে এগিয়ে আসেন। আমাদের বাংলা অঞ্চলে অতি প্রাচীন প্রবাদ রয়েছে, 'উনু ভাতে দুনু বল ভরা ভাতে রসাতল'। আসলে খাদ্য তালিকা নির্বাচনের আমরা খুব বেশি সতর্কতা গ্রহণ করি না। নিরাপদ খাদ্য বলতে যে খাদ্য শরীরে পুষ্টিগুণ বৃদ্ধি করে এবং শরীরের সুষম পুষ্টি নিশ্চিত করে তেমন খাদ্যকে বোঝায়। অধিক অর্থ ব্যয়ে তৈলাক্ত ও রাসায়নিক খাবারের চেয়ে অতি সাধারণ প্রাকৃতিক উপায়ে উৎপাদিত অনেক খাদ্যদ্রব্য অধিক পুষ্টিমাণ সমৃদ্ধ ও স্বাস্থ্যকর। খাদ্য তালিকায় এ ধরনের খাবার বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক।

খাদ্য অপচয় কমানোর জন্য National Resources Defense Council (NRDC), USA এবং Warning, Advice and Reporting points (WRAP), UK কর্তৃক ১০টি কৌশলের (Tips) পরামর্শ প্রদান করছে:

1) Shop smart : আপনার উপযুক্ত খাদ্য তালিকা নির্ণয়ে কেতাদুরস্ত হোন। প্রয়োজনের অতিরিক্ত দ্রব্য ক্রয় থেকে বিরত থাকুন। কোন বিপণন কৌশলের কাছে হার মানবেন না। কারণ, অনেক সময় ব্যবসায়ীরা বেশি বিক্রয়ের জন্য অধিক পরিমাণ দ্রব্য কম মূল্যে প্রদান করেন। বিশেষ করে পচনশীল খাদ্যদ্রব্যের জন্য কখনোই অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করবেন না। খাদ্যদ্রব্য ক্রয়ের পূর্বে তার পুষ্টিগুণ জেনে নেওয়া আবশ্যক। খাদ্যের পুষ্টিগুণ জানা থাকলে অনেক সময় কম মূল্যে অধিক পরিমাণ পুষ্টিসমৃদ্ধ খাবার পাওয়া যেতে পারে।

2) Buy Funny fruits : অনেক ফল ও সবজি যা দেখতে সুন্দর নয় কিন্তু দামে সস্তা। এগুলো ক্রয় করে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হতে পারেন। আমাদের দেশে অনেক সময় এ ধরনের ফল বা সবজি ক্রয় করে নিজকে অতিরিক্ত পেস্টিসাইড-এর হাত থেকে রক্ষা করতে পারেন। ইদানীং কৃষিবিদগণ বলে থাকেন পোকা ও বাঁকা বেগুন স্বাস্থ্যের জন্য ভালো। কারণ, এতে ওষুধ কম প্রয়োগ করা হয়। দেখতে মসৃণ না হওয়ায় দামে সস্তা হয়। এ ধরনের খাদ্য অনেক সময় কৃষকের ফার্মেই অপচয় হয়ে যায়। তাই এগুলো ক্রয় করে আপনি খাদ্যের অপচয় রোধ করতে পারেন। আপনার এ ধরনের সিদ্ধান্ত একদিকে উৎপাদিত পণ্যের ব্যবহার নিশ্চিত করছে, অন্যদিকে রাসায়নিক সার মিশ্রিত খাদ্যগ্রহণ থেকে বিরত থেকে নিরাপদ খাদ্যগ্রহণে অন্যকে উৎসাহিত করছে।

3) Understand Expiration Dates : উন্নত বিশ্বের দেশসমূহে প্যাকেটজাত খাদ্যে 'Sell-byand use-by' লেখা থাকে। যা মূলত উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের একটি সাদামাটা হিসাবে খাদ্যের সর্বোচ্চ গুণগত মান বজায় রাখার জন্য। প্রকৃতপক্ষে এসব খাদ্য তারিখ উত্তীর্ণের পরও গ্রহণযোগ্য মাত্রা বজায় থাকে, শুধু শিশু খাদ্য ছাড়া। এ ধরনের পণ্য উৎপাদনের পূর্বে বাজার যাচাই করে চাহিদানুযায়ী উৎপাদন করা হলে অহেতুক অপচয়ের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। অধিক হারে নিরাপদ খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা যায়।

4) Zero Down Your fridge : কোন দ্রব্য কেনার পূর্বে আপনাকে পরিকল্পনা করতে হবে। পূর্বের কেনা সকল দ্রব্য শেষ করুন। খাদ্যমান ও ক্রয়ের তারিখ অনুযায়ী পচনশীল দ্রব্য ফ্রিজে আগে ব্যবহারের জন্য সাজিয়ে রাখুন। ফ্রিজের খাদ্য শেষ না হলে নতুন ক্রয় থেকে বিরত থাকুন। যা অপচয়রোধ করবে ও অর্থ সাশ্রয়ী হবে।

5) Say Freeze and Use Freezer : খাদ্য হিমায়িত করে রাখলে তা অনেক দিন গুণ ও মানে সমৃদ্ধ থাকে। আপনি অতিরিক্ত খাদ্য হিমায়িত করে সংরক্ষণ করতে পারেন ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য।

6) Requst small Portions: হোটেলসমূহে অনেক সময় কম মূল্যে খাবার অফার করে। তা গ্রহণ করলে সাশ্রয়ী হবেন। তবে অধিক হারে তৈলাক্ত খাবার গ্রহণ স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। তাই আপনার খাদ্য তালিকা বাছাই করার ক্ষেত্রে নিরাপদ খাদ্যের প্রতি লক্ষ রাখুন।

7) Compost : খাদ্যের উচ্ছিষ্টাংশ কম্পোষ্ট করে বা পুনঃচক্রায়ন করে অপচয় রোধ করা যায়। যা জলবায়ু পরিবর্তনে ভূমিকা রাখবে।

8) Use FIFO (First in First out) : খাদ্য সংগ্রহের জন্য কিচেন রুল মেনে চলুন। আগে সংরক্ষিত খাদ্য সামনের দিকে রাখুন এবং শেষ করুন। নতুন সংগ্রহ পিছনের ক্যাবিনেটে সংরক্ষণ করুন।

9) Love leftovers : আজ রাতের কিচেন রোস্ট দিয়ে হতে পারে পরবর্তী সকালের স্যান্ডউইচ অর্থাৎ ভাল খাবার নষ্ট না করে তা পরে ব্যবহার করুন। সৃষ্টিশীল হউন। হোটেল রেস্তোরাঁয় আপনার কেনা বেঁচে যাওয়া খাবার ফেলে না দিয়ে প্যাক করে নিয়ে আসুন। এজন্য কোনো প্রকার ইতস্তত করবেন না। খুব কম সংখ্যক লোকই হোটেলের অবশিষ্ট খাবার নিয়ে আসেন।

10) Donate : আপনার বেঁচে যাওয়া নষ্ট না হওয়া খাবারগুলো পার্শ্ববর্তী কোন ব্যক্তিকে দান করুন। মনে রাখবেন আপনি যে খাদ্যের অপচয় করছেন তা একজনের জীবনধারণের জন্য অত্যন্ত মূল্যবান। স্থানীয় উদ্যোগে একটি ফুড ব্যাংক গড়ে তুলতে পারেন।

এই ১০টি কৌশল অবলম্বন করলে কিছুটা হলেও খাদ্যের অপচয় রোধ হবে। আর এই অপচয়রোধ মানেই খাদ্য নিরাপত্তা সংরক্ষিত হওয়া।

Save : তিন অর্থেং save ব্যবহৃত হয়েছে। গরিব মানুষকে ক্ষুধার হাত থেকে বাঁচানো। নিরাপদ খাদ্য প্রদানের মাধ্যমে গরিব মানুষকে রুগ্নতার হাত থেকে বাঁচানো। আমাদের এই ধরিত্রীমাতাকে বৈশ্বিক উষ্ণতার হাত থেকে রক্ষা করে একটি সুন্দর পৃথিবী ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য রেখে যাওয়া এবং সর্বোপরি নিজের পকেট থেকে বেরিয়ে যাওয়া অর্থগুলোকে সংরক্ষণ করা। প্রকৃতপক্ষে জাতিসংঘ ঘোষিত জিরো হাঙ্গার অর্থাৎ ক্ষুধামুক্ত বিশ্ব গড়ার লক্ষ্যে সকলকে একযোগে কাজ করতে হবে। উৎপাদন কৌশল ও ব্যবস্থাপনা, বিপণন ব্যবস্থাপনা খাদ্য অপচয় রোধ এই সমন্বিত ব্যবস্থায় আসতে হবে। তবে আশ্চর্যজনক হলেও সত্য যে, বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন পরিবেশবাদী গোষ্ঠি খাদ্য অপচয়ের বিরুদ্ধে অল্প হলেও একটি সচেতনমূলক আন্দোলন দাঁড় করাতে সক্ষম হয়েছে। তাই এখনই শ্রেষ্ঠ সময় জনগণকে সাথে নিয়ে তাদের স্বাস্থ্য, এই ধরিত্রী এবং মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থাকে রক্ষা করার জন্য গণআন্দোলন গড়ে তোলা।

ন্যাচারাল রিসোর্স ডিফেন্স কাউন্সিল আমেরিকার একটি প্রতিশ্রুতিশীল পরিবেশবাদী সংগঠন-এর জরিপ মতে, আমেরিকা ১৫% খাদ্য অপচয় কমাতে পারলে তা দিয়ে ২৫ মিলিয়ন আমেরিকানকে একবার খাদ্য সরবরাহ করা সম্ভব। তবে দুঃখজনক হলেও বলতে হচ্ছে যে, বিশ্বে overweight লোকের সংখ্যা Underweight লোকের থেকে বেশি। কারণ উন্নত দেশের মানুষ ফাস্টফুড, সোডা ওয়াটার ইত্যাদিতে অভ্যস্ত হওয়ায় তাদের obesit বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর মূল কারণ সম্পদের বণ্টন ব্যবস্থা। যার আছে তার কোনো অভাব নেই, প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদের পাহাড় তৈরি হচ্ছে, অন্যদিকে বিত্তহীনের ন্যূনতম চাহিদা পূরণ হচ্ছে না। বণ্টন ব্যবস্থাপনায় সরকারকে এক্ষেত্রে দৃঢ় ভূমিকা রাখতে হবে।

WHO-এর তথ্যমতে সারা বিশ্বে ২.৩ বিলিয়নের বেশি মানুষ overweight এবং ৭০০ মিলিয়ন লোক অতিশয় মোটা (Obese)। আর নিম্ন ও মধ্য আয়ের দেশের ৩৪৭ মিলিয়ন লোক বিশ্বব্যাপী ডায়াবেটিস রোগে আক্রান্ত। ২০৩০ সাল পর্যন্ত এই ডায়াবেটিস রোগীর সংখ্যা বেড়ে দ্বিগুণ হবে। অতএব, প্রত্যেক সদস্যদের খাদ্য নিয়ে এখনই চিন্তার সময়। ফাস্টফুডের পরিবর্তে নিউট্রিশন যুক্ত ও স্বাস্থ্যসম্মত নিরাপদ খাবার নির্বাচন করতে হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে, ধরিত্রীমাতা নিরলসভাবে আমাদের খাদ্য উৎপাদনের জন্য

কাজ করে যাচ্ছে। উৎপাদিত ফসল যদি যথার্থভাবে ব্যবহার না হয় তাহলে তার ওপর অতিরিক্ত কর্ষণ পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণ হয়ে উঠবে। জেনে রাখা ভাল, খাদ্য উৎপাদনের জন্যই পৃথিবীর ৩০ ভাগ বনভূমি এবং ১০ ভাগ অনাবাদি ভূমি বিলীন হয়ে গেছে।

- বিশ্বের ৯ ভাগ সুপেয় পানি উত্তোলিত হয়েছে, যার ৭০ ভাগ কৃষি কাজে খাদ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়েছে।
- কৃষি কাজের জন্য বনভূমি উজাড় হওয়ায় ৩০ ভাগ গ্রিন হাউজ গ্যাস নির্গমন এর জন্য দায়ী।
- বৈশ্বিকভাবে কৃষিকাজ, খাদ্যপণ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য ৩০% তাপশক্তি বা জ্বালানি ব্যবহৃত হচ্ছে।
- কৃষি জমির আধিক্যের প্রয়োজনে এবং অপরিকল্পিত মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থপনার জন্য স্বাদু পানির মাছ বিলীন হতে চলেছে। অতিরিক্ত মাৎস্য সম্পদ আহরণের জন্য ৩০ ভাগ সামুদ্রিক মাছও কমে যাচ্ছে বলে গবেষকদের ধারণা।

সর্বোপরি খাদ্যের অপচয় মানেই অর্থের অপচয়। সামাজিকভাবে, বাণিজ্যিকভাবে, অর্থনৈতিকভাবে সকলেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যার পরিমাণ শুধু উন্নত বিশ্বের দেশগুলোর হিসাবে প্রতি বছর ২০০ বিলিয়ন ইউ এস ডলার। WRAP, UK-এর মতে যুক্তরাজ্যে বছরে প্রতিটি পরিবার অপচয় রোধ করলে ৬৮০ পাউন্ড সাশ্রয় করতে পারে। এছাড়া আপ্যায়নকারী সংস্থাগুলো (যেমন হোটেল, রেস্তোরা, পাব) থেকে সাশ্রয় হতে পারে ৭২৪ মিলিয়ন পাউন্ড। ইউনাইটেড স্টেটস ডিপার্টমেন্টাল অব এগ্রিকালচার-এর রিপোর্ট অনুযায়ী:

আমেরিকানরা প্রতিবছর জনপ্রতি ২০ ডলার হিসেবে ১৬৫ বিলিয়ন ডলার মূল্যের খাদ্য অপচয় করে। যা তাদের বার্ষিক ফুড বাজেটের ১০ ভাগ। শুধু নিউইয়র্ক সিটি প্রতি বছর ৩ মিলিয়ন টন খাদ্যের বর্জ্য ল্যান্ড ফিলে জমা করে যার জন্য ব্যয় হয় ২৫০ মিলিয়ন ইউ এস ডলার। এই আলোচনার মূল উদ্দেশ্য আমাদের প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় খাবারের অপচয় কমানোর জন্য দেশব্যাপী জন সচেতনতা তৈরি করা। জাতিসংঘের এফএও-এর ভাষ্য মতে, প্রতিবছর আমরা ১.৩ বিলিয়ন টন খাদ্য অপচয় করি। যা সাব-সাহারিয়ন আফ্রিকার সমগ্র বার্ষিক উৎপাদিত খাদ্য শস্যের সমান।

মানব জীবনের এই ভয়াবহ অবস্থার কথা বিবেচনা করে এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিশ্ব প্রেক্ষাপটে ভবিষ্যৎ খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়টি মাথায় রেখে বিশ্বের জনগোষ্ঠীকে খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়ে বিশেষভাবে সচেতন করার প্রয়োজন। ধরিত্রী মাতা বিশ্বের সাতশত পঁয়ত্রিশ কোটি (২০৫০ সন নাগাদ এক হাজার কোটি) সন্তানকে ভরণ পোষণের জন্য অকাতরে শস্য উৎপাদনে ভূমিকা পালন করছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য এই উৎপাদিত ফসলের এক-তৃতীয়াংশ যে কোনো ভাবে নষ্ট বা অপচয় হচ্ছে। খাদ্যশস্যের এই অপচয় পরিবেশ ও প্রতিবেশের ওপর মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

বিভিন্ন দিবসের এই আয়োজনে (Campaign) প্রতিটি পরিবার থেকে খাদ্য অপচয়রোধে সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে। তাহলে একটি সমন্বিত গণজাগরণ তৈরি হবে যা সম্মিলিতভাবে সারা বিশ্ববাসীকে খাদ্য অপচয়রোধে ভূমিকা রাখতে সহায়ক ভূমিকায় অঙ্গীকারবদ্ধ করবে। প্রত্যেককে অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী করবে এবং পরিবেশ সংরক্ষণে প্রত্যেককে অধিকতর সচেতন করে তুলবে। মনে রাখতে হবে কোনো উৎপাদিত খাদ্যদ্রব্য (Finished goods) নষ্ট হলে এর জন্য ব্যয়িত সকল প্রকার সম্পদের অপচয় হয়ে থাকে। যেমন এক কেজি ধান উৎপাদনে খরচ হয় ৩,০০০ লিটার পানি। এক কেজি দুধ উৎপাদনে খরচ হয় ১০০০ লিটার পানি। এক কেজি মাংস উৎপাদনে ব্যয় হয় ১৬,০০০ লিটার পানি। এখন ধরুন একটি উচ্চবিত্ত পরিবার অতিথি আপ্যায়নে যদি ১০ কেজি চালের ভাত নষ্ট করে তাহলে ৩০ হাজার লিটার-এর সমপরিমান মূল্যবান সুপেয় পানি তিনি নষ্ট করছেন। এ সাথে পরিবেশ ধ্বংসকারী অসংখ্য গ্রিন হাউজ গ্যাসও রয়েছে। অর্থাৎ খাদ্য ও খাদ্যদ্রব্য নষ্ট করার অর্থ হলো সমগ্র খাদ্যশৃঙ্খলা নষ্ট হয়ে যাওয়া। আর খাদ্য শৃঙ্খলা নষ্ট মানেই নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তি আরো দুর্লভ হয়ে যাওয়া।

বৈশ্বিক উষ্ণায়ন বৃদ্ধির ফলে খাদ্য উৎপাদন হ্রাস পাওয়ার অশনি সংকেত। যখন প্রকট ঠিক সেই সময়ে পরিসংখ্যান বলছে যে, ২০৫০ সন পর্যন্ত বিশ্বের জনসংখ্যা বেড়ে ১০ বিলিয়ন হবে। স্বাভাবিকভাবেই আগামী সময়ে আমাদের একপ্রকার সংকট মোকাবেলা করতে হবে। এছাড়া নগরায়নের কারণে পৃথিবীর প্রায় ১% কৃষি জমি প্রতি বছর বিলীন হয়ে যাচ্ছে। বিলীন হচ্ছে বনভূমি, সুপেয় পানির অপরিমিত ব্যবহার ভবিষ্যতে চরম সংকটের পূর্বাভাস দিচ্ছে। এই মুহূর্তে বিশ্বে প্রায় ১.৮ বিলিয়ন মানুষ চরম সুপেয় পানির সংকটে ভুগছে। এতগুলো সংকটকে অতিক্রম করে দেশের মানুষকে নিরাপদ খাদ্য সরবরাহ করা কঠিন চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জ গুলোর বিজ্ঞানভিত্তিক মোকাবেলা করে নিরাপদ খাদ্য দিবসের প্রতিপাদ্য নিশ্চিত করে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। তাহলেই সোনার বাংলা নিরাপদ খাদ্যে ভরে উঠবে।

নিরাপদ ও নির্ভেজাল খাদ্য: সমস্যার স্বরূপ ও উত্তরণের উপায়

ড. আবু সালেহ্ মোস্তফা কামাল

বর্তমানে বহুল প্রচলিত 'ভেজালমুক্ত খাদ্য' শব্দটিই আসলে ভেজালযুক্ত; ভেজালহীন অর্থে তথা প্রকৃতার্থে শব্দটি হবে নির্ভেজাল খাদ্য। নির্ভেজাল শব্দটি আজকাল নির্বাসিত হলেও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান-এর ১৮ অনুচ্ছেদে জনস্বাস্থ্য ও পুষ্টিমাত্রার উন্নয়নের বিষয়টি বিধৃত আছে। বিশুদ্ধ খাবার অধ্যাদেশ, ১৯৫৯ (সংশোধিত, ২০০৫ খ্রিঃ)-এর বিধান ৫এ ও ৫বি-তে খাদ্যকে যথোপযুক্তভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। অণুজীব বিজ্ঞানীদের মতে, প্রাকৃতিক খাদ্যসম্ভার অণুজীব ও বিষমুক্ত নয় অর্থাৎ খাদ্যদ্রব্যটি বিশুদ্ধ বা নির্ভেজাল মনে হলেও স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর "অণুজীব ও বিষাক্ত পদার্থের গ্রহণযোগ্য সীমা" অতিক্রান্ত হলে খাদ্যদ্রব্য আর নিরাপদ থাকে না। এই গ্রহণযোগ্য সীমা কি? গ্রহণযোগ্য সীমা লিঙ্গভেদে নারী-পুরুষের ওপর, বয়সের ওপর, দৈহিক ওজন ও উচ্চতা প্রভৃতি নিয়ামকের ওপর নির্ভর করে। এছাড়াও খাদ্যদ্রব্যের ধরন অনুযায়ী দৈনিক বা সাপ্তাহিকভাবেও নির্ধারিত হয়, আরও থাকে সর্বনিম্ন বা সর্বোচ্চ সীমা। বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় এগুলোকে একসেপ্টটেবল ডেইলি ইনটেক (ADI); রিকোমেন্ডেট ডেইলি অ্যালাউন্স (RDA); টলারেবল ডেইলি ইনটেক (TDI); টলারেবল উইকলি ইনটেক (TWI); আপার লেভেল (UL) ও লোয়েস্ট থ্রেসহোল্ড ইনটেক (LTI) নামে অভিহিত করা হয়। কতিপয় আন্তর্জাতিক সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান যথা:- FAO, WHO, EC, GMO/EFSA, IARC, IPCS, JECFA, ICMSF প্রভৃতির মাধ্যমে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত খাদ্যদ্রব্যে উপস্থিত ক্ষতিকর জীবাণু ও স্বাস্থ্যহানিকর বিষাক্ত দ্রব্যের গ্রহণযোগ্য সীমা বা মানমাত্রা নির্ধারিত হয়ে থাকে।

প্রকৃতিগতভাবে উৎপন্ন শাকসবজিতে প্রাকৃতিক ফাইটোট্রক্সিন থাকতে পারে। এ জাতীয় টক্সিন অনেক সময় উদ্ভিদের চারাবস্থায় থাকে পরিণতবস্থায় থাকে না, আবার এর উল্টোটাও হতে পারে অর্থাৎ উদ্ভিদের চারা অবস্থায় থাকে না; পরিণতবস্থায় থাকে। শহরতলী থেকে সদ্য ক্ষেত-তোলা ফ্রেশ শাকসবজি রান্না করে খেয়ে যদি কেহ পরিতৃপ্তির ঢেঁকুর তোলে তাতেও নিশ্চিন্ত থাকার কিছু নেই। এ জন্য যে, শহরতলীর আশে পাশে স্থাপিত শিল্প কলকারখানা থেকে নির্গত বর্জ্য বা রং মিশ্রিত দূষিত পানি যদি ক্ষেতে পতিত হয়, তাহলে সাবসট্রেট থেকে অনেক শাকসবজি সহজেই ভারী ধাতু (ক্রোমিয়াম, লেড, কোবাল্ট, লিথিয়াম, নিকেল, ক্যাডমিয়াম, মার্কারি) নিজ শরীরে আত্মীকরণ করতে পারে। হাইওয়ের পার্শ্বে হলে গাড়ির জ্বালানি থেকে নির্গত ভারী ধাতু বা ট্রেস এলিমেন্ট বৃষ্টির পানিতে পাতা থেকে ধুয়ে মাটিতে মিশে, যা শোষিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আবার এ সমস্ত শাকসবজি, ঘাস, গবাদিপশু খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে থাকে, তাদের মাংস আমরা খাই। গবাদিপশুর উচ্ছিষ্ট ও চামড়া প্রক্রিয়াকরণের পর উদ্ভূত উপজাত মাছ ও হাঁস-মুরগির খাবার তৈরিতে ব্যবহৃত হয় যা আমরা খাই। এছাড়া মোটা-তাজাকরণার্থে ইউরিয়া ও ভিটামিন খাওয়ানো, অধিকন্তু রোগ সংক্রমিত না হওয়ার জন্য টিকা ও অ্যান্টিবায়োটিকের যথেচ্ছ ব্যবহার তো আছেই। মরা মাছে ফরমালিন দেয়া থাকে মনে করে কেউ কেউ শিং, কই, পাঙ্গাশ, মাগুর জ্যান্ত মাছ খাওয়ার পরামর্শ দেন; এ ধরণের পরামর্শ আপাতঃদৃষ্টে ভালো তবে ক্ষতিকর দিক হলো মাছগুলো যদি লেগুনে চাষ করা হয় তাহলে হাসপাতালসহ বহুবিধ দূষিত আবর্জনাসমৃদ্ধ লেগুনের মাছে দূষিত পদার্থ আরও বেশি থাকে যা মারাত্মক স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে ফেলে দেয়। আর যদি সাধারণ পুকুর/নদীর হয়ে থাকে অর্থাৎ নিরাপদ হয় আর তা সকলেই কিনে খেতে আগ্রহী হয়ে ওঠে তাহলে জ্যান্ত মাছের দাম আকাশচুম্বি হবে এবং প্রজাতিগুলো স্বল্পসময়ে বিলীন হয়ে যাওয়ার আশঙ্কাও অমূলক নয়। আবার দেখুন, প্রাকৃতিকভাবে প্রাপ্ত পাকা কলায় তেজস্ক্রিয় পটাসিয়াম আছে তা সত্ত্বেও কলার কত গুণাগুণ এবং ডাক্তারগণ দৈনিক কলা খাওয়ার পরামর্শ দেন অর্থাৎ কলায় যে তেজস্ক্রিয় পটাসিয়াম আছে তা গ্রহণযোগ্য সীমার মধ্যে আছে। আমরা দই খাচ্ছি, মানে সাথে অগণিত ব্যাক্টেরিয়া ভক্ষণ করছি, অসুস্থ না হওয়ার কারণ ব্যাক্টেরিয়া তথা জীবাণুর সংখ্যা গ্রহণ সীমার মধ্যে থাকে। মাশরুম খাচ্ছি, মানে ছত্রাকের ফলদেহ খাচ্ছি। সিঙ্গেল সেল প্রোটিন হিসাবে স্পিরুলিনা খাচ্ছি মানে শৈবাল, সোজা বাংলায় শেওলা খাচ্ছি। সুতরাং জ্যান্তমাছ, ক্ষেতের টাটকা শাকসবজি যতই বিশুদ্ধ হোক না কেন তা কতখানি নিরাপদ এবং স্বাস্থ্যবান্ধব তা গবেষণাগারে পরীক্ষার মাধ্যমে ঐ সকল খাদ্যদ্রব্যে ক্ষতিকর জীবাণু ও বিষাক্ত দ্রব্যের উপস্থিতির পরিমাণের ওপর ভিত্তি করে নিরূপিত হয়ে থাকে। তাহলে বিষয়টির ব্যাখ্যায় প্রতীতি জন্মে যে, বৈজ্ঞানিকভাবে স্বীকৃত ও নির্ধারিত গ্রহণযোগ্য সীমা তথা গুণগত মানমাত্রার মধ্যেই নিহিত আছে নির্ভেজাল ও নিরাপদ খাদ্য (Safe Food)-এর যথার্থতা। গ্রহণযোগ্য সীমা নিরূপক তথা গুণগত মানমাত্রা নির্ধারণের নিয়ামকগুলো হলো:- ১) প্রাকৃতিক খাবারের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সহজাত গুণাগুণ (যেমন-বাহ্যসুরত, রং, সজীবতা, গঠন-সৌষ্ঠব ও স্বাদ, ২) পুষ্টিগুণ (শর্করা, স্নেহপদার্থ, খনিজলবণ ও ভিটামিনের পর্যাপ্ততা)। এছাড়াও খাবারভেদে প্রক্রিয়াকরণের আগে বা পরে খাবারটির পুষ্টিসূচক (নিউট্রিশনাল ইনডেক্স) ও জৈবিক মূল্য (বায়োলজিক্যাল ভ্যালু) নির্ধারণ করা হয়ে থাকে, ৩) অণুজীবীয় মান (মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বা রোগসৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাকের উপস্থিতি ও উপস্থিতির হার, ৪) টক্সিনের মানমাত্রা (ক) মোল্ড, ইস্ট ও ফাঙ্গাসজনিত অ্যাফ্লাটক্সিন, (খ) ভারী ধাতুজনিত ও (গ) ট্রেস এলিমেন্ট-এর মাত্রাতিরিক্ত উপস্থিতিজনিত, ৫) কীটনাশক রেসিডিউ, ৬) ফুড এডিটিভস ও ফুড প্রিজারভেটিভস-এর ব্যবহারজনিত গুণাগুণ ও এগুলোর মানমাত্রা, ৭) তেজস্ক্রিয়তাজনিত, ৮) জিএম খাদ্য এবং সর্বশেষ, ৯) ভেজাল মিশ্রিত খাদ্যদ্রব্য।

ড. আবু সালেহ্ মোস্তফা কামাল
যুগ্মসচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

খাদ্যে ভেজাল মিশ্রণ এবং খাদ্যে ফুড এডিটিভস ও প্রিজারভেটিভস হিসাবে রাসায়নিকদ্রব্য ব্যবহার কিন্তু এক জিনিস নয়। রাসায়নিকদ্রব্য প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন কারণে এর অপপ্রয়োগ করা হয়, আর ভেজালপ্রতারণার উদ্দেশ্যে জেনেশুনে আসল উপাদানের অনুরূপ নকল উপাদান মিশ্রিত করা হয়। রসায়নশাস্ত্র, প্রাণরসায়ন, ফার্মাসি, অণুজীববিজ্ঞান বিষয়ে প্রভূত উন্নতিসাধনের সাথে সাথে ফুড এডিটিভস বা ফুড প্রিজারভেটিভস এর ব্যবহার বাড়তে থাকে। কতিপয় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক বৈজ্ঞানিক কলাকৌশল অবলম্বনে নির্ধারিত পরিমাণে এগুলোর মিশ্রণ করা বিশ্বস্বীকৃত। অপরপক্ষে খাদ্যে ভেজাল মিশ্রণ কোন স্বীকৃত বিষয় নয়, বরং ইচ্ছাকৃত করায় তা দন্ডনীয় অপরাধ। প্রসঙ্গক্রমে বলা দরকার যে, স্বীকৃত রাসায়নিকদ্রব্য নির্ধারিত পরিমাণের অধিক এবং স্বীকৃত নয় এমন রাসায়নিকের ব্যবহারও দন্ডনীয় অপরাধ। আমরা জানি, খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহের পর হতেই এর স্বাভাবিকতা হারাতে থাকে। প্রথমত: খাদ্যদ্রব্যটির পারিপার্শ্বিক আর্দ্রতা, বায়ুপ্রবাহ, তাপমাত্রা, মোড়কের উপাদান এবং এর পুরুত্ব প্রভৃতি নিয়ামকের কারণে এদের বিপাকীয় কার্যক্রমের উপর প্রভাব বিস্তারের ফলে আস্তে আস্তে খাদ্যদ্রব্যের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণগত মান হ্রাস (ডেটোরিয়েরেশন) পেতে থাকে। পরবর্তীতে খাদ্যের পরিপক্বতা, পুষ্টিকণ, অম্লত্ব ও ক্ষারত্বের তারতম্যের কারণে অণুজীবের সংক্রমণ শুরু হয় এবং পরিণতিতে খাদ্যে পচন (Spoilage) ধরে। পচনকালের ব্যাপ্তি ও প্রক্রিয়াকরণের ধরনের ওপর ভিত্তি করে খাদ্যদ্রব্যকে অত্যন্ত পচনশীল (হাইলি-পেরিশেবল ১-৩ দিন); অধিক পচনশীল (সেমিপেরিশেবল ১-৩ সপ্তাহ) কিছুটা পচনশীল (সেমি-সেলফ স্টেবল ১-৪ মাস) এবং পচনরোধী বা সেলফ্ স্টেবল (১ বছর বা ততধিক সময় গুণগতমান অক্ষুন্ন থাকে) এই ৪ ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হয়েছে। খাদ্যের মান বজায় রাখা ও বিপণনের সুবিধার্থে, সর্বোপরি ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে ও জনস্বার্থে খাদ্যের ধরণানুযায়ী খাদ্যদ্রব্য প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণের মাধ্যমে খাদ্যদ্রব্যের সেলফ্ লাইফ নির্ধারিত হয়ে থাকে। অণুজীবের দ্বারা খাদ্য পচন রোধকল্পে এবং সেলফ্ লাইফ বৃদ্ধির জন্য মূলত কতিপয় জৈব এসিড, যৌগ ও নির্ভেজাল খাদ্যদ্রব্যের সাথে পরিমিত মাত্রায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে, যেগুলোকে খাদ্য-সংরক্ষক বা ফুড প্রিজারভেটিভস হিসাবে গণ্য করা হয়। অপরদিকে খাদ্যের প্রকৃতি অনুযায়ী যে সমস্ত জৈব-রাসায়নিক পদার্থ, এন্টিকেকিং এজেন্ট, অক্সিডেন্ড, রং প্রভৃতি পরিমিত পরিমাণে যোগ করে খাদ্যে কাঙ্ক্ষিত প্রভাব তথা বিপণন উপযোগী করা হয়; সে সমস্ত জৈব রাসায়নিক পদার্থসমূহকে ফুড এডিটিভস হিসেবে গণ্য করা হয়। ফুড এডিটিভস প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ হতে পারে। আমাদের দেশে খাদ্য বা খাদ্যদ্রব্যের সেলফ্ লাইফ বর্ধিতকরাসহ পুষ্টিগুণ অক্ষুন্ন রাখা, সজীবতা রক্ষা, খাদ্যকে সুস্বাদু করা ইত্যাদি উদ্দেশ্যকে আড়াল করে স্বল্পসময়ে অধিক লাভবান হওয়ার মানসে কতিপয় অর্থলিপ্সু তথা অপরিণামদর্শী মানুষ এমনকি অজ্ঞতার বশবর্তী হয়েও খাদ্যে ভেজাল মিশ্রণসহ অনুমোদিত কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত এবং অননুমোদিত রাসায়নিক ও জৈব রাসায়নিকের ব্যাপক অপব্যবহার ও অপপ্রয়োগের মাধ্যমে এক ভয়াবহ অবস্থার ধুম্রজাল সৃষ্টি করেছে। ভেজাল মিশ্রিত খাদ্যের বিষয়গুলো অনুভবযোগ্য ও দৃশ্যমান হওয়ায়, ভেজাল খাদ্য নিয়েই শোরগোল বেশি; কিন্তু অদৃশ্যমান হওয়ার কারণে নিরব ও গুপ্ত ঘাতক অপর ৬টি বিষয় যথা:- পুষ্টিগুণ, অণুজীবীয়মান, টক্সিনের মানমাত্রা, কীটনাশক রেসিডিউ, তেজস্ক্রিয়তা ও জিএম খাদ্য বরাবরই উপেক্ষিত থেকে যাচ্ছে যা অধিকতর বিষময়, আরও ভয়ানক। সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, নির্ভেজাল বা বিশুদ্ধ খাদ্যমাত্রই তা নিরাপদ, তা কিন্তু নয়; অর্থাৎ নিরাপদ খাদ্যমাত্রই তা নির্ভেজাল বা বিশুদ্ধ খাদ্য কিন্তু খাদ্যদ্রব্য বিশুদ্ধ বা নির্ভেজাল হলেই তা যে নিরাপদ খাদ্য (Safe Food) তা নির্দ্বিধায় বলা যাবেনা।

রাসায়নিক ও ভেজাল খাদ্যের ফলে যখন জীবন বিপন্ন হওয়ার উপক্রম তখন অন্তত ভেজালমুক্ত (মাত্রানির্ধারিত সুনির্দিষ্ট একটিভ ইনগ্রিডিয়েন্ট সমৃদ্ধ) ওষুধটি যেন মানুষ পায় কেননা প্রায় আড়াই কোটি মানুষ ঠিকমত ওষুধ না পেয়ে আরও স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে নিমজ্জিত। তাছাড়া অসুস্থতার চিকিৎসা করতে গিয়ে দেশে প্রতি বছর ৫ লক্ষ ৭০ হাজার মানুষ দরিদ্র হয়ে পড়ে যা পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তার জন্য এক বড় হুমকি। এসডিজি-২ অর্জনের জন্য বিষয়টি অধিকতর গুরুত্ববহন করে। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ও পরিবেশগত প্রেক্ষাপট বিবেচনায় উদ্ভূত সমস্যা নিরসনকল্পে নিম্নে উলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনা করা যেতে পারে।

১) জাতীয় রেফারেন্স ল্যাবপ্রতিষ্ঠাকরণ: স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীন ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন ও চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের তত্ত্বাবধানে নবনির্মিত খাদ্য বিশ্লেষণমূলক গবেষণাগার দুটিকে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন রেফারেন্স ল্যাব হিসাবে (ISO সনদ অর্জনকারী) প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা আবশ্যক। এক্ষেত্রে সমন্বয়সাধনও অপরিহার্য। কেননা কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে বালাইনাশক কারিগরি উপদেষ্টা কমিটি (পিটাক) আছে, যে কমিটি কৃষিতে ব্যবহার্য কীটনাশক, ছত্রাকনাশক হিসেবে কোনো কোনো কেমিক্যাল কি পরিমাণে ব্যবহার করা যেতে পারে তার প্রাথমিক নির্বাচন ও পরে চূড়ান্ত অনুমোদন দেয়। বিএসটিআই কোন খাদ্যে কি পরিমাণ জীবাণু থাকবে অর্থাৎ অণুজীবীয়মান, হেভিমেটালের পরিমাণ, কোন রাসায়নিক কতটুকু খাদ্য প্রক্রিয়াকরণে ও সংরক্ষণে ব্যবহৃত হবে তার তালিকা প্রণয়ন ও মানমাত্রা উপযুক্ত কমিটির মাধ্যমে নির্ধারণ করে থাকে। সুতরাং এই দুই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই খাদ্যদ্রব্য, কৃষিজ ও হর্টিকালচারাল প্রোডাক্টসমূহের মানমাত্রা নির্ধারণ ও তালিকা প্রণীত অবস্থায় আছে, প্রয়োজনে অন্যান্য দেশের ন্যায় প্রচলিত মূল খাবারগুলো (টোটাল ডায়েট স্টাডি) এর যুগোপযোগী তালিকা ও মানমাত্রা হালনাগাদ করা সম্ভব এবং এরূপ সমন্বিত ল্যাব প্রতিষ্ঠার ফলে রাসায়নিক ও ভেজাল খাদ্যদ্রব্য সম্পর্কিত মামলা-মকদ্দমা নিরসনেও সহায়ক হবে। একই সাথে ২০১০ সালের ডব্লিউএইচও-এর সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে খাদ্যদ্রব্যে ক্ষতিকর রাসায়নিকের প্রাদুর্ভাব রোধকরা সম্ভব হবে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের "ইমপ্রুভিং ফুড সেফটি, কোয়ালিটি এন্ড ফুড কন্ট্রোল ইন বাংলাদেশ" শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়িত ল্যাবটিও এক্ষেত্রে অনন্য ভূমিকা পালনে সহায়ক।

২) উৎসে জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ: পোষ্টিসাইড, ফাঙ্গিসাইড, ফরমালিন, ফুড এডিটিভস ও ফুড প্রিজারভেটিভস উৎপাদন বা আমদানিকারকদের তালিকাপ্রণয়ন করে ডাটাবেজ সংরক্ষণ করতে হবে। পাইকারি বিক্রেতাকে অবশ্যই লাইসেন্সধারী হতে হবে এবং কার কাছে কতটুকু বিক্রয় করলো তার দৈনিক, মাসিক ও বার্ষিক হিসাব রাখবে। এনবিআর থেকে আমদানির বার্ষিক পরিমাণের সাথে ক্রস-চেক করতে হবে। এতে চাহিদার সাথে উৎপাদন ও আমদানির সমন্বয় ঘটবে ফলে অপব্যবহার কমে যাবে। এরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ কম্পিউটারের যুগে কোন সমস্যা নয়, এতে ক্ষতিকর রাসায়নিক ও কীটনাশকের সহজলভ্যতা হ্রাস পাবে, ব্যবহার সীমিত হবে অপব্যবহার কমবে এবং দায়ী ব্যক্তিকে সহজেই শনাক্ত করে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব হবে। ব্যক্তিগত চাহিদা মেটানোর জন্য অল্প পরিমাণ শাকসবজি উৎপাদনের ক্ষেত্র ব্যতীত বাণিজ্যিকভাবে সবজি চাষের ক্ষেত্রে যে কৃষিপণ্য বা হর্টিকালচারালপ্রডাক্টে কীটনাশক বা ছত্রাকনাশক স্প্রে করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেবে তা স্থানীয় কমিটির মাধ্যমে সম্পন্ন করা যেতে পারে। উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি, স্বাস্থ্য বিভাগের প্রতিনিধি, পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রতিনিধির সমন্বয়ে গঠিত কমিটিকে অবহিত করে নির্দিষ্ট দিন ও ক্ষণে স্প্রে করবে কৃষক/উৎপাদনকারী। লিফলেটের নির্দেশানুযায়ী নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হওয়ার পর ফসল তোলার সময় উক্ত কমিটিকে পুনরায় জ্ঞাত করে বা পরিদর্শনের আহ্বান জানিয়ে চাষী ক্ষেত থেকে ফসল তোলা আরম্ভ করবেন। এমনটি করলে লিফলেটের নির্দেশনা যথাযথ প্রতিপালনের ফলে কীটনাশক বা ছত্রাকনাশকের ক্ষতিকর প্রভাব দূরীভূত হবে এবং এদের অবশিষ্টাংশ (রেসিডু) গ্রহণসীমার মধ্যে চলে আসবে। কীটনাশক ও ছত্রাক নাশকের এরূপ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত হলে এমনিতেই সব ঠিকঠাক থাকবে। এটা অত্যাবশ্যক এ জন্য যে, ১৯৯৭ সালে কীটনাশক ব্যবহারের পরিমাণ ছিল আট হাজার নব্বই টন, ২০০৮ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে আটচল্লিশ হাজার ছয়শত নব্বই টন। শতকরা হিসাবে ১০ বছরে ৩২৮% বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই বিদেশে বাংলাদেশের সবজির চাহিদা কমছে। পরবর্তীতে সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে বিগত ৫ বছরের তুলনায় বর্তমানে ২২টি থেকে ৪১টি দেশে সবজি রপ্তানি হচ্ছে। কীটনাশকের ব্যবহার কমাতে পারলে দেশের মানুষের স্বাস্থ্য ঝুঁকি হ্রাস পাবে, অন্যদিকে রপ্তানি অনেকগুণ বেড়ে যাবে: স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় কমবে, রপ্তানি আয় বাড়বে।

৩) শনাক্তকরণ ও শাস্তি বিধান: বিপণন বা বাজারজাত করার কোন পর্যায়ে কেউ কমিটির অগোচরে লিফলেটে প্রদত্ত নির্দেশনা অমান্য করলে কমিটির রিপোর্ট বা কমিটিভুক্ত কোনো সদস্যর লিখিত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে উপজেলা নির্বাহী অফিসার তাৎক্ষণিকভাবে মোবাইল কোর্ট করে নজির স্থাপনকারী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। অর্থাৎ ব্যবহার বিধি যথাযথ অনুসরণ না করার ফলে বা ভেজাল মিশ্রণের জন্য আনীত অভিযোগ সাপেক্ষে আইনানুগ জরিমানা বা শাস্তিপ্রদান করবে। কিন্তু অপরাধ করে ফেললে অর্থাৎ কৃষিপণ্য বা হর্টিকালচারাল প্রোডাক্ট অদৃশ্যমানভাবে বিষাক্ত হয়ে গেলে বা ভেজাল দ্রব্য মিশ্রিত হয়ে গেলে এবং তা আপাতদৃষ্টে অদৃশ্যমান হলে তখন আন্তর্জাতিক স্বীকৃত ৭টি নীতির উপরপ্রতিষ্ঠিত প্রতিরোধমূলক পরিকল্পিত কর্মসূচি বা হ্যাজার্ড এ্যানালাইসিস ক্রিটিক্যাল কন্ট্রোল পয়েন্ট (HACCP)-এর মাধ্যমে চিহ্নিত করা যাবে। পরীক্ষার জন্য গবেষণাগারে প্রেরণপূর্বক হেভিমেটাল টক্সিসিটি, ট্রেস এলিমেন্টের পরিমাণ নির্ধারণ, এ্যাফ্লাটক্সিন ও পেস্টিসাইড রেসিডিউ এর উপস্থিতি ও পরিমাণ নির্ধারণের জন্য বর্তমানে হাই পারফরমেন্স লিকুইড ক্রোম্যাটোগ্রাফ (HPLC); অ্যাটমিক অ্যাবজর্পসন স্পেকট্রোফটোমেট্রি (AAS); এনার্জি ডিসপার্স এক্স-রে স্পেকট্রোমিটার (EDX) লিকুইড ক্রোম্যাটোগ্রাফি ম্যাস স্পেকট্রোমিটার (LCMS) এমএস, ইনডাকটিভলি ক্যাপল্ড প্লাজমা-ম্যাস স্পেকট্রোমেট্রি (ICPMS) অনুসৃত পদ্ধতি অনুযায়ী রিপোর্ট প্রাপ্তি সাপেক্ষে ভোক্তা অধিকার আইনানুযায়ী প্রতিকারের ব্যবস্থা নিশ্চিত-করণসহ অধিকতর কঠিন শাস্তির বিধান নিশ্চিত করা হলে অপপ্রয়োগ বন্ধ হবে।

৪) কর্মপরিকল্পনা ও সমন্বয়সাধন: সিটি করপোরেশন, বিএসটিআই (BSTI), জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটপ্রভৃতিপ্রতিষ্ঠানে বিক্ষিপ্তাকারে থাকা যন্ত্রপাতি ও অভিজ্ঞ জনবলকে একত্রিত করে খাদ্যদ্রব্যের পুষ্টি উপাদান বিশ্লেষণের জন্য পুষ্টি ইনস্টিটিউট, ফাংশনাল ফুডের উপাদান বিশ্লেষণের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসী, প্রাণরসায়ন বিভাগ, খাদ্যে অণুজীবীয়মান পরীক্ষার জন্য অণুজীববিজ্ঞান বিভাগ ও বিসিএসআইআর-এর খাদ্য অণুজীববিজ্ঞান গবেষণাগার, হেভিমেটাল, ট্রেস এলিমেন্ট, পেস্টিসাইড রেসিডিউ, এ্যাফ্লটক্সিন প্রভৃতির জন্য BCSIR, BARI, BIRRI, BLRI-এর গবেষণাগার, তেজস্ক্রিয়তা বিষয়ক হলে সাভারস্থ আণবিক গবেষণা কেন্দ্র, জিন সংক্রান্ত হলে ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং পশুপাখির খাদ্য সংক্রান্ত হলে বিএলআরআই গবেষণাগারের দ্বারস্থ হওয়া যেতে পারে। বর্তমান গবেষণাগারগুলো বেশির ভাগই প্রকল্পের মাধ্যমে স্থাপিত, পরবর্তীতে তা রাজস্বখাতভুক্ত হলেও মেইনটেইনেন্সের জন্য বরাদ্দ না থাকার ফলে কালক্রমে বিকল হয়ে যায়, রেফারেন্স কেমিক্যাল থাকে না, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ক্যালিবারেটেড করা হয়না, নামিদামি কোম্পানির রাসায়নিক বা কোনো যন্ত্রের জন্য সুনির্দিষ্ট কোম্পানির রাসায়নিক আমদানি বা ক্রয়ের এখতিয়ার না থাকায় এসব অধিকাংশ গবেষণাগারের রিপোর্ট আন্তর্জাতিক মানের হয় না। অধিকন্তু রপ্তানি পণ্যের ক্ষেত্রে তো বটেই, উচ্চতর গবেষণার ক্ষেত্রেও তা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছে। প্রকল্পের মাধ্যমে জনবল নিয়োগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন চাপ উপেক্ষা করে উপযুক্ত টেকনিশিয়ানের নিয়োগের নিশ্চয়তা বিধান করে ব্যবহারিক গবেষণার জন্য সীমিতভাবে অডিটবিহীন খরচের প্রবিধান রাখা যেতে পারে এবং সময়ে সময়ে উপযুক্ত প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে দেশে বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করাও আবশ্যক।

৫) সচেতনতা বৃদ্ধি, তদারকি ও প্রচার: বিশুদ্ধ খাদ্য, নিরাপদ খাদ্য, নির্ভেজাল খাদ্য সম্বন্ধে আপামর জনসাধারণকে সচেতন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার। এক্ষেত্রে সভা, সমাবেশ, ওয়ার্কশপ, সেমিনার, লিফলেট বিতরণসহ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্টমিডিয়া তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম। তদারকি, পর্যবেক্ষণ ও মনিটরিং এর ক্ষেত্রে সিটি করপোরেশন, পরিবেশ অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পুষ্টি বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট, আণবিক শক্তি কমিশন থেকে প্রতিনিধি নির্বাচন করে কমিটি গঠন করা যেতে পারে।

পরিশেষে বলা যায় আশার বিষয় এটাই যে, এখনও চাষাবাদযোগ্য জমির বেশির ভাগই পলি এলাকায় এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের তথ্যানুযায়ী ২০১৬-১৭ সময়ে ৮.৫৩৫ লক্ষ হেক্টর সবজির চাষ হয়, যা ১৯৯৬ সালে হতো ৪.০৩৫ লক্ষ হেক্টর (৯ লক্ষ ৯৭ হাজার একর) জমিতে। তাই নিরাপদ খাবার প্রাপ্তি অদূর ভবিষ্যতে কতটা নিরাপদ হবে তা এখনই ভাবতে হবে। ভাবতে হবে এজন্য যে, স্বাধীনতার চারদশক অতিক্রান্ত হয়েছে, বেড়েছে জনসংখ্যা, বেড়েছে উৎপাদন, জিডিপি এর প্রবৃদ্ধি ঘটেছে, ইনকাম বেড়েছে, জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে, আয়কর প্রদানের আওতা বেড়েছে, চাকুরিজীবীদের বেতন বেড়েছে, মানুষের আয়ুষ্কাল বেড়েছে, আর তার সাথে পাল্লা দিয়ে এই চার দশকে রপ্তানিও বেড়েছে তিরিশগুণ। এরমধ্যে একটা জিনিসই প্রতিনিয়ত কমছে তা হলো মাথাপিছু চাষাবাদযোগ্য জমির পরিমাণ। প্রতিদিন ২২০ হেক্টর কৃষি জমি আমরা হারাচ্ছি আর প্রতিদিন যোগ হচ্ছে ছয় হাজার মানবসন্তান। আর এই হার অব্যাহত থাকলে আগামী ষাট বছর পর আর কোনো কৃষি জমি অবশিষ্ট থাকবে না। তা হলে নিরাপদ খাদ্যতো দূরের কথা, খাদ্য নিরাপত্তা ও হৃষ্টপুষ্ট জাতি গঠনের সবকিছুই স্বপ্নসার হয়ে প্রতিভাত হতে বাধ্য এবং তা অকল্পনীয়। খাবার যদি নিরাপদ হয় তা হলে হিসাব করে খাবার খেলে ঈপ্সিত ক্যালরি পাওয়া সম্ভব। পুষ্টিমান ও ফুডসেফটি নিশ্চিত না হলে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জিত হলেও অর্থাৎ পেটভরে খাবার জুটলেও পুষ্টির অভাব হতে বাধ্য।

খাদ্য নিরাপত্তা (Food Security)-এর ক্ষেত্রে সমগ্র জনগোষ্ঠির কথা না ভাবলেও চলে, কারণ যে কোনো পরিস্থিতিতে কিছু জনগণের খাদ্য যোগাড় বা ক্রয়ের জন্য তাদের আর্থিক সক্ষমতা অটুট থাকে। অপরদিকে, নিরাপদ বা নির্ভেজাল খাদ্য (Safe Food) নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সমগ্রজাতি তথা প্রায় ১৬ কোটি জনগণের জন্য তা বিবেচনায় রাখতে হবে, কারণ অনিরাপদ বা ভেজালখাদ্য ধনী-গরিব, রাজা-প্রজা তথা কোনো প্রকার শ্রেণি বৈষম্যের তোয়াক্কা করে না।

টেকসই উন্নয়নে নিরাপদ প্রাণীজ খাদ্য : জনস্বাস্থ্য ঝুঁকি ও করণীয়

আবু সহিদ ছালেহ মো. জুবেরী

বৈশ্বিক উন্নয়নচিন্তার প্রথম পর্যায় মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল (MDG)-এর সাফল্য অর্জনের ধারাবাহিকতায় আমাদের সামনে নতুন চ্যালেঞ্জ ২০৩০ সালের Sustainable Development Goal (SDG) বা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার ক্রমিক (২)-এ ক্ষুধার অবসান, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টিমান অর্জন এবং টেকসই কৃষির প্রসার, ক্রমিক (৩)-এ সকল বয়সী সকল মানুষের জন্য সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণ, ক্রমিক (৬)-এ সকলের জন্য পানি ও পয়ঃনিষ্কাশনের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ এবং (১২) ক্রমিকে পরিমিত ভোগ ও টেকসই উৎপাদন ধরন নিশ্চিত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। জাতিসংঘ ঘোষিত এসডিজি- ২০৩০ এর উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার "ভিশন ২০২১" ও ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এর আওতায় ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

ইতোমধ্যে বাংলাদেশের মানুষের মাথাপিছু আয় বেড়েছে, ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে, বাংলাদেশ খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের দ্বারপ্রান্তে। মানুষের জীবনযাত্রা, খাদ্যাভ্যাস ও রুচির পরিবর্তন হচ্ছে সময়ের সাথে সাথে। সহজাত প্রবৃত্তির তাড়না থেকেই মানুষ এখন নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তির জন্য সোচ্চার হচ্ছে। অধিকন্তু, উৎসনির্বিশেষে নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তি মানুষের সাংবিধানিক অধিকারও বটে।

স্বাস্থ্যবান মেধাবী জাতি গঠনে নিরাপদ প্রাণীজ আমিষের গুরুত্ব অপরিসীম। আমিষ জাতীয় খাদ্যের প্রায় শতকরা ৫০ ভাগের উৎস প্রাণীজ আমিষ তথা- ডিম, দুধ ও মাংস। এসব খাদ্য উপকরণ প্রায় প্রতিদিনই আমাদের খাদ্য তালিকায় থাকছে। কর্মসংস্থান, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, স্থানীয় সম্পদের সর্বাধিক উপযোগিতা সৃষ্টি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রাণিসম্পদের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

মানুষের সাংবিধানিক অধিকার নিশ্চিতকরণ, এসডিজি-২০৩০ এর নিরাপদ খাদ্য সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং ২০২১ সাল নাগাদ বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে ১৬ কোটি মানুষের জন্য নিরাপদ প্রাণিজ আমিষের উৎপাদন নিশ্চিতকরণ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পূর্ব শর্ত ও অপরিহার্য অনুষঙ্গ।

২. প্রাণীজ খাদ্যের অনিরাপদতা ও জনস্বাস্থ্য ঝুঁকি:

- মানুষ দৈনন্দিন প্রাণীজ আমিষের চাহিদা পূরণ করতে ডিম, দুধ ও মাংস খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করছে। এছাড়াও প্রক্রিয়াজাত খাদ্য যেমন-মাংস থেকে তৈরি নাগেট, চিকেন সসেজ, মিটবল ইত্যাদি; দুধ থেকে তৈরি ইয়োগার্ট, আইসক্রিম, মিষ্টি, মাখন, ঘি, পনির, দধি, মাঠা ইত্যাদি; ডিম থেকে তৈরি পুডিং, মেয়োনেজ প্রভৃতি খাবার সুপার মার্কেটগুলোতে পাওয়া যাচ্ছে এবং শিশুসহ সব ধরনের ক্রেতা এগুলো ক্রয় করছে।
- অসচেতনতা, অজ্ঞতা, অতিরিক্ত মুনাফার লোভ উৎপাদন পর্যায়ে প্রাণীজ খাদ্যকে দূষিত করছে অথবা খাদ্যকে দূষিত বা ভেজাল করার মতো পরিবেশ তৈরি করছে। ফলে প্রাণীজ খাদ্যে নানাবিধ বিপত্তি (Hazard) সৃষ্টি হয়ে খাদ্য অনিরাপদ হচ্ছে এবং জনস্বাস্থ্যের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলছে।

- **প্রাণীজ খাদ্যের বিপত্তি প্রধানত তিন ধরনের যথা-**

১) **ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস ও ফাঙ্গাস ইত্যাদি জীবাণুর সংক্রমণ:** অনিরাপদ পদ্ধতিতে পশুপাখি পালন ও ডিম-দুধ-মাংসের উৎপাদন, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাঁচা বাজারে ও যত্রতত্র পশুপাখি জবাই, মাংস প্রক্রিয়াকরণ, বিক্রয়, বিতরণ ও সংরক্ষণের ফলে নানাবিধ জীবাণু দ্বারা প্রাণীজ খাদ্য সংক্রমিত হচ্ছে এবং খাদ্যবাহিত রোগের সৃষ্টি হচ্ছে।

২) **রাসায়নিক বিপত্তি:** পশুপাখিতে অযৌক্তিকভাবে অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগ, পশুখাদ্যে অ্যান্টিবায়োটিকের সংমিশ্রণ ও ক্ষতিকর ট্যানারি বর্জ্যের ব্যবহার তথা ক্যানসার সৃষ্টিকারী ক্রোমিয়াম দ্বারা খাদ্য দূষণ এবং ক্রেতার আকর্ষণ বৃদ্ধি ও দীর্ঘসময় সংরক্ষণের জন্য প্রাণীজ খাদ্যে ক্ষতিকর রঞ্জক পদার্থ ও রাসায়নিক প্রিজারভেটিভ ব্যবহারের ফলে প্রাণীজ খাদ্যে রাসায়নিক বিপত্তির সৃষ্টি হচ্ছে।

৩) **ভৌত বিপত্তি:** অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে ধুলাবালি, পশুপাখির লোম ও বিষ্ঠা, পোকামাকড় , ধাতব বস্তু, কাঁচের টুকরা প্রভৃতি অবাঞ্ছিত বস্তু দ্বারা প্রাণীজ খাদ্যে ভৌত বিপত্তি সৃষ্টি হচ্ছে।

আবু সহিদ ছালেহ মো. জুবেরী
উপসচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়
(নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষে নিয়োজিত)

৩. জনস্বাস্থ্যের ওপর প্রাণীজ খাদ্য বিপত্তির ক্ষতিকর প্রভাব:

- প্রাণীজ খাদ্যবাহিত জীবাণুঘটিত রোগবালাই যেমন- সালমোনেলোসিস, সিগেলোসিস , কলিবেসিলোসিস, অ্যানথ্রাক্স, টিবি ইত্যাদি ও মৃত্যুহার বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- প্রতিবছর প্রায় ৩ মিলিয়ন ডায়রিয়াজনিত অসুস্থতার রিপোর্ট পাওয়া যাচ্ছে।
- ৫ বছরের কম বয়সের শতকরা ১৫ ভাগ শিশু ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মারা যাচ্ছে।
- মানবদেহে অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স তৈরি হচ্ছে: বৈশ্বিক পরিসংখ্যান অনুযায়ী প্রায় ৭০ শতাংশ অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করা হয় প্রাণীতে। বাংলাদেশের পোল্ট্রিতে, গবাদিপশুতে ও পশুখাদ্যে অ্যান্টিবায়োটিকের নিয়ন্ত্রণহীন ও অযৌক্তিক ব্যবহার উদ্বেগজনক।
- অ্যান্টিবায়োটিকের "প্রত্যাহার কাল" না মেনে পোল্ট্রি, গবাদিপশু ও প্রাণীজাত খাদ্য পণ্য বিক্রয় করা হচ্ছে। অ্যান্টিবায়োটিকের অবশিষ্টাংশ প্রাণীজ খাদ্যের মাধ্যমে মানবদেহে প্রবেশ করছে, যা প্রকারান্তরে অ্যান্টিবায়োটিকের কার্যকারিতা কমিয়ে রোগ প্রতিরোধ ও চিকিৎসা কার্যক্রমকে ঝুঁকিপূর্ণ ও ব্যয়বহুল করছে।
- ভেজাল ও দূষণযুক্ত প্রাণীজ খাদ্যের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাবে মানবদেহের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ কিডনি, লিভারের কার্যক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে এবং ক্যানসারজনিত রোগের ঝুঁকি বাড়ছে।
- জনবিভ্রান্তির ফলে প্রাণীজ আমিষ গ্রহণে দ্বিধা: গরু হৃষ্ট-পুষ্টকরণে ক্ষতিকর হরমোন ও স্টেরয়েড ব্যবহার এবং কৃত্রিম ডিম বিষয়ক বিভ্রান্তিকর প্রচারের ফলে ভোক্তাশ্রেণী উদ্বিগ্ন ও ভীত হয়ে প্রাণীজ খাদ্য গ্রহণে দ্বিধাগ্রস্থ হচ্ছে। ফলে স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও অর্থনীতি উভয়ের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে।

৪. প্রাণিজ আমিষ উৎপাদনে খামারিদের অননুমোদিত চর্চা : ক্ষুদ্র পরিসরে পরিচালিত সামাজিক গবেষণার ফলাফল

প্রাণিজ খাদ্য উৎপাদনকারী খামার পরিচালনায় খামারিদের অননুমোদিত চর্চা অনেক ক্ষেত্রেই প্রাণিজ খাদ্য বিপত্তি সৃষ্টির জন্য দায়ী। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক খামারি আধুনিক ও সঠিক পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ ব্যতীত খামার পরিচালনা করছেন। খামারে বায়োসিকিউটি বা জীবনিরাপত্তা অনুসরণ করা হচ্ছে না। রোগ প্রতিরোধের চেয়ে চিকিৎসা তথা ওষুধ ব্যবহারের প্রবণতা বেশি। নিবন্ধিত প্রাণী চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র ব্যতীত অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার, এন্টিবায়োটিকের 'প্রত্যাহার কাল' ও প্রাণিজ খাদ্যে এন্টিবায়োটিকের অবশিষ্টাংশের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে অসচেতনতা; পশুখাদ্যে অ্যান্টিবায়োটিক, হরমোন, স্টেরয়েড প্রভৃতি ক্ষতিকর রাসায়নিক ব্যবহার নিষিদ্ধ সংক্রান্ত আইনগত বিধিনিষেধ সম্পর্কে খামারিদের অজ্ঞতার চিত্র সামাজিক গবেষণায় পাওয়া যায়।

Fig : Compliance and noncompliance findings on structured questions

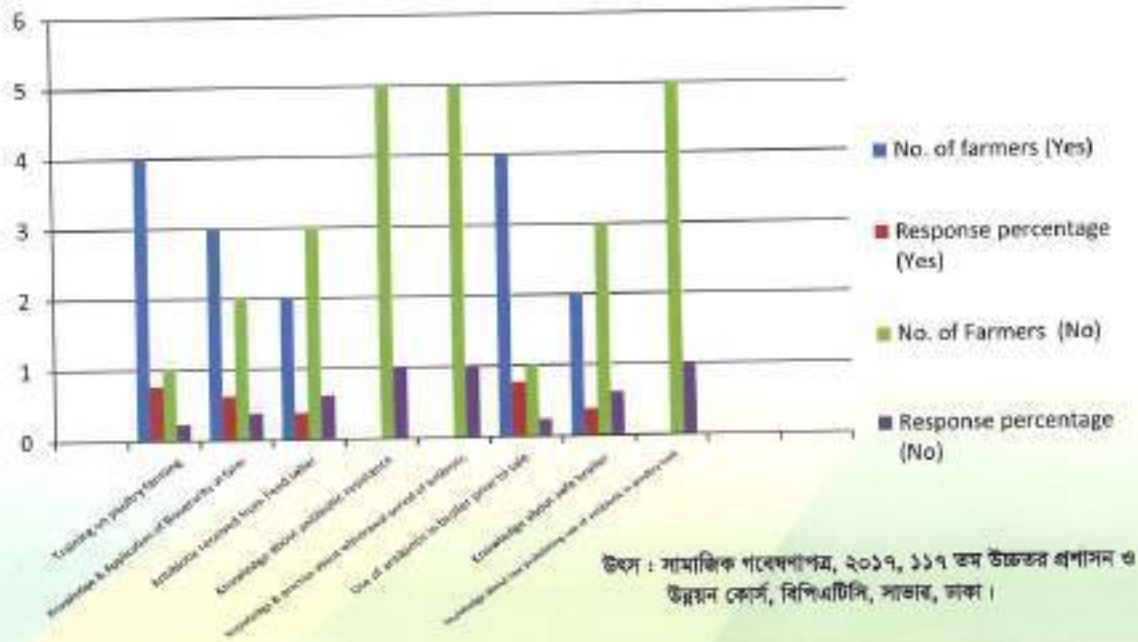

উৎস : সামাজিক গবেষণাপত্র, ২০১৭, ১১৭ তম উচ্চতর প্রশাসন ও উন্নয়ন কোর্স, বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা।

৫. নিরাপদ প্রাণীজ খাদ্যের জন্য করণীয় : সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে মেয়াদভিত্তিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে।

ক) স্বল্পমেয়াদি কার্যক্রম

- স্বাস্থ্যসম্মত আধুনিক প্রায়োগিক পদ্ধতিতে গবাদিপশু ও পোল্ট্রি পালন বিষয়ে খামারিদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।
- প্রশিক্ষণ অনুযায়ী গৃহীত কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিং করতে হবে।
- পশু-পাখির খামার ও পশুখাদ্য কারখানাগুলোকে শতভাগ রেজিস্ট্রেশনের আওতায় আনতে হবে।
- কারখানাগুলো নিয়মিত পরিদর্শন ও মনিটরিং এবং সন্দেহজনক খাদ্য নমুনা সরকার অনুমোদিত ল্যাবে পরীক্ষা করতে হবে।
- রেজিষ্টার্ড প্রাণি চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র ব্যতীত অ্যান্টিবায়োটিক ক্রয় ও বিক্রয় বন্ধ করতে হবে।
- বিধি-নিষেধ অমান্যকারীদেরকে আইন প্রয়োগের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।
- পশু-পাখির জবাইখানা নিয়মিত পরিদর্শন ও নিরাপদ রোগমুক্ত পশুপাখি জবাই নিশ্চিত করতে হবে।
- গণমাধ্যমে প্রচার ও জনসচেতনতামূলক সকল কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।

খ) মধ্যমেয়াদি কার্যক্রম

- নিরাপদ প্রাণীজ খাদ্য উৎপাদন গাইডলাইন প্রণয়ন করতে হবে।
- জনস্বাস্থ্য ঝুঁকিভিত্তিক প্রাণিরোগ অগ্রাধিকার দিয়ে উৎসে নিরাপদ প্রাণীজ খাদ্যের নিশ্চয়তামূলক প্রকল্প গ্রহণ এবং প্রাণিজ খাদ্য ও পশু খাদ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, পরিবহন ও সংরক্ষণে GMP, GHP প্রচলন করতে হবে।
- প্রাণীজ খাদ্য ও পশুপাখির খাদ্য নমুনার বিপত্তি বিশ্লেষণের সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে।
- মূল্য সংযোজিত নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন শৃঙ্খল (Value Chain) তৈরি করতে হবে।
- স্বাস্থ্যসম্মত পোল্ট্রি কাঁচা বাজার ও পশু-পাখির জবাইখানা স্থাপনে কার্যকর ভূমিকা রাখতে হবে।
- তথ্য-উপাত্তের নির্ভরযোগ্য ডাটাবেজ তৈরি, প্রমাণক কাগজপত্র সংরক্ষণ ও নিরাপদ খাদ্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর সাথে নেটওয়ার্ক স্থাপন করতে হবে।
- প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি তৈরি করতে হবে।
- রিফ্রেশার্স কোর্স ও অব্যাহত শিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতার উন্নয়ন করতে হবে।

গ) দীর্ঘমেয়াদী কার্যক্রম

- নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩-এর সাথে সমন্বয় করে প্রাণিসম্পদ বিভাগের বিদ্যমান আইন বিধির সংশোধন করতে হবে। পশু জবাই ও মাংসের মান নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১০-এর বিধিমালা দ্রুত প্রণয়ন করতে হবে।
- নিয়মিত সার্ভেলেন্স ও মনিটরিংয়ের জন্য প্রয়োজনীয় লোকবল নিশ্চিত করতে হবে।
- পশুপাখির খামার, প্রক্রিয়াজাতকরণের স্থাপনা ও পশুখাদ্যের কারখানায় HACCP পদ্ধতি চালু করতে হবে।
- নিরাপদ খাদ্যমান নির্ধারণ বিষয়ক গবেষণা ও উচ্চশিক্ষা কোর্স পরিচালনা করতে হবে।

৬. বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের উদ্যোগ গ্রহণ ও প্রত্যাশার অনুরণন :

নিরাপদ খাদ্য একটি মাল্টিসেক্টোরাল ইস্যু। প্রাণীজ খাদ্যসহ সকল খাদ্যের নিরাপদতা নিশ্চিত করতে হলে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংস্থার মধ্যে নিবিড় সমন্বয় অপরিহার্য। সর্বোচ্চ কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষকে সংশ্লিষ্ট বিভাগ/সংস্থাগুলোর সাথে নিবিড় যোগাযোগ, তথ্য বিনিময় ও সমন্বিত কার্যক্রম বৃদ্ধির লক্ষ্যে নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ অব্যাহত রাখতে হবে। নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩-এর যথাযথ বাস্তবায়ন বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের অন্যতম ম্যান্ডেট। সকলের সম্মিলিত প্রয়াসের মাধ্যমে বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়নে "সকলের জন্য নিরাপদ খাদ্য" নিশ্চিতকল্পে ষোল কোটি মানুষের একান্ত প্রত্যাশা- খাদ্য নিরাপত্তা ও নিরাপদ খাদ্যের বাংলাদেশ হোক ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত ও মেধাবী জাতির সোনার বাংলাদেশ।

নিরাপদ খাদ্যের নিশ্চয়তা বিধানে নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩-এর গুরুত্ব

অনিমা রানী বিশ্বাস

মানুষের মৌলিক চাহিদার অন্যতম প্রধান হলো খাদ্য। বর্তমান বাংলাদেশে ১৬ কোটি মানুষের বসবাস। বিপুল এ জনগোষ্ঠীর জন্য প্রয়োজন সুষম খাদ্যের উৎপাদন, সংরক্ষণ ও সরবরাহ। বাংলাদেশ খাদ্যে বিশেষ করে দানা জাতীয় ফসলের ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। কৃষির অভূতপূর্ব উন্নয়ন সাধিত হলে ও খাদ্য নিরাপদতায় এখনো পিছিয়ে রয়েছে। খাদ্য নিরাপদতা অর্জন বর্তমান সরকারের একটি অগ্রাধিকার প্রাপ্ত কার্যক্রম। খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জনে বহুমূখী কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বর্তমান বাংলাদেশের বড় চ্যালেঞ্জ হলো ১৬ কোটি মানুষের জন্য নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করা। এই সমস্যা উত্তরণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩-এর গুরুত্ব অপরিসীম।

নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩-এর পটভূমিটা সকলের জানা দরকার। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন ছিল একটি সুখী, সমৃদ্ধ, ক্ষুধামুক্ত ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলাদেশ গড়ার। জাতির জনকের সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভিশন ২০২১ ঘোষণা করেন। সরকারের গৃহীত রূপকল্প অনুযায়ী ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশের কাতারে বাংলাদেশকে নিয়ে যাওয়া। ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় সবার জন্য নিরাপদ খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিতকরণের প্রতিশ্রুতি রয়েছে। জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ভেজাল ও দূষণমুক্ত নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তির সাংবিধানিক অধিকার নিশ্চিতকরণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যুগোপযোগী বিচক্ষণ ও দূরদর্শী সিদ্ধান্তে Pure Food Ordinance 1959 রহিত করে "নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩" প্রণীত হয় এবং আইনটি ১০ অক্টোবর ২০১৩ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

আইনটির মূল উদ্দেশ্য নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করা, খাদ্য উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ, বিপণন ও বিক্রয় সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সমন্বয়ের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা। একটি দক্ষ ও কার্যকর কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কার্যকর নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি গড়ে তোলা। সে লক্ষ্যে ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ নিরাপদ নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ কার্যকর হয় এবং ২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখে সরকার একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করে। একজন চেয়ারম্যান, চারজন সদস্য ও একজন সচিব সমন্বয়ে কর্তৃপক্ষ গঠিত হয়েছে। কৃষি মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খাদ্য অধিদপ্তর, জনস্বাস্থ্য ও পুষ্টি প্রতিষ্ঠান, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ আণবিক শক্তি কমিশন, বাংলাদেশ অ্যাক্রিডিটেশন বোর্ড, বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই), মৎস্য অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, সিটি কর্পোরেশন (১১টি), পৌরসভা (৩২৩ টি), জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (৬৪) এর সঙ্গে সম্পৃক্ত। নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে এসকল সংস্থা নির্ধারিত ক্ষেত্রে স্ব-স্ব দায়িত্ব পালন করছে। খাদ্য সরবরাহ শৃংখলের প্রতিটি স্তরে খাদ্য ও খাদ্যোপকরণ যেন ভেজালমুক্ত ও দূষণমুক্ত থাকে সে বিষয়ে কর্তৃপক্ষ এসকল সংস্থাসমূহের সহযোগিতা ও পরামর্শ গ্রহণ, প্রশিক্ষণ, সচেতনতা ও উৎকৃষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ এবং সকল কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও সমন্বয়ের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করে।

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষে ৫ বিভাগ আছে- খাদ্যের বিশুদ্ধতা পরিবীক্ষণ, খাদ্য পরীক্ষাগার নেটওয়ার্ক, নিরাপদ খাদ্যমান প্রমিতকরণ, খাদ্যভোক্তা সচেতনতা, ঝুঁকি ও নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা এবং সংস্থাপন, আর্থিক ও জনসম্পদ ব্যবস্থাপনা। ৬৪টি জেলা ও মেট্রোপলিটন এলাকায় ৬টি বিশুদ্ধ খাদ্য আদালত নির্ধারিত হয়েছে। নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩-এর অপরাধসমূহ মোবাইল কোর্টের আওতায় আনা হয়েছে। প্রয়োজনীয় বিধি, প্রবিধান, নির্দেশিকা, কোড অব প্রাকটিস এবং আদর্শ অপারেটিং পদ্ধতি তৈরির কাজ চলমান। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও খাদ্য অধিদপ্তরের সাথে কার্যক্রম চলমান। পর্যায়ক্রমে আরো ৯টি সিটি কর্পোরেশনসহ সকল পৌরসভার সাথে কার্যক্রম শুরু করবে। নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত অন্যান্য সংস্থার সাথে সহযোগিতার ক্ষেত্র চিহ্নিত করার কাজ চলমান। নিরাপদ খাদ্যের গুণগতমান সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য দেশব্যাপী প্রচারণামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

এ বছর বিশ্ব খাদ্য দিবসের প্রতিপাদ্য ছিলো "অভিবাসনের ভবিষ্যৎ বদলে দাও খাদ্য নিরাপত্তা ও গ্রামীণ উন্নয়নে বিনিয়োগ বাড়াও"। খাদ্য নিরাপত্তা যেমন জরুরি তেমনি নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করাও জরুরি।

অনিমা রানী বিশ্বাস
উপসচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়
(নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষে নিয়োজিত)

ভোক্তা হিসেবে নিরাপদ খাদ্য ও ভেজাল খাদ্য চেনাটাও জরুরি। খাদ্য বা খাদ্যদ্রব্যের অংশ বিশেষ রঞ্জিত, স্বাদ-গন্ধযুক্ত, সংরক্ষণ বা আকর্ষণীয় করতে মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর ও নিষিদ্ধ উপাদান মিশ্রিত করলে ভেজাল খাদ্যে পরিণত হয়। খাদ্যে মাত্রাতিরিক্ত কোন উপাদান মিশ্রিত করলে খাদ্যদ্রব্যের গুণগুণ বা পুষ্টিমান হ্রাস পায়, তখন সে খাদ্যটিও ভেজাল খাদ্যে পরিণত হয়। খাদ্যের মধ্য হতে কোন স্বাভাবিক উপাদান সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে সরিয়ে স্বল্প মূল্যের ভিন্ন কোনো উপাদান মিশ্রিত করে খাদ্যের আপাত ওজন ও পরিমাণ বৃদ্ধি করলে বা আকর্ষণীয় করে ক্রেতার আর্থিক বা স্বাস্থ্যগত ক্ষতিসাধন করা হলে তাও হবে ভেজাল খাদ্য। প্রত্যাশিত ব্যবহার ও উপযোগিতা অনুযায়ী মানুষের জন্য বিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্যসম্মত আহার্য-ই নিরাপদ খাদ্য। সহজভাবে বলা যায় মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য উপযোগী বিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যই নিরাপদ খাদ্য।

খাদ্যে বা খাদ্যোপকরণে মাত্রাতিরিক্ত কীটনাশক বা বালাইনাশকের অবশিষ্টাংশ এবং পশু বা মৎস্য রোগের ওষুধের অবশিষ্টাংশ থাকলে সে খাবার অনিরাপদ। খাদ্যে বা খাদ্যোপকরণে মাত্রাতিরিক্ত কোন দূষক, টক্সিন ও ক্ষতিকর অণুজীবের উপস্থিতি থাকলে সে খাবার অনিরাপদ। খাদ্যে বা খাদ্যোপকরণে মাত্রাতিরিক্ত সংযোজন দ্রব্য এবং প্রক্রিয়াকরণ সহায়ক দ্রব্য মিশ্রিত হলে সে খাবার অনিরাপদ। যথোপযুক্ত ও অনুমোদিত খাদ্য সংস্পর্শক মোড়কে বা আধারে খাদ্য না রাখলে সে খাবার অনিরাপদ। আবার নিরাপদ খাদ্য বিভিন্ন উপায়ে অনিরাপদ খাদ্যে পরিণত হয়। যেমন:

- এলার্জি বা স্বাস্থ্যঝুঁকির সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও খাদ্য উৎপাদক বা বিক্রেতা কর্তৃক ক্রেতাকে সচেতন না করা।
- খাদ্যবাহিত রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির দ্বারা খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত ও পরিবেশন করলে নিরাপদ খাদ্য অনিরাপদ হয়।
- কাঁচা এবং রান্না করা খাবার পৃথক না রেখে পাশাপাশি বা একত্রে রাখা হলেও নিরাপদ খাদ্য অনিরাপদ হতে পারে।
- ৬০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের অধিক তাপমাত্রায় রান্না করা খাবার ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার নিচে সংরক্ষণ না করা হলে নিরাপদ খাদ্য অনিরাপদ হয়।
- ব্যক্তিগত অনভিজ্ঞতা বা অসাবধানতাবশত ভুলে হাঁচি, কাশি, অপরিষ্কার হাতের ছোঁয়া, চেখে পরখ করা ইত্যাদি। খাবারে উপস্থিত অণুজীবের জন্য বৃদ্ধি, টক্সিন উৎপাদন বা সংক্রমণ।
- অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্যবস্তুর উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাত, পরিবেশন ও সংরক্ষণ।
- খোলা খাবারে মাছি, কীটপতঙ্গ দ্বারা রোগজীবাণু ছড়ানো।

নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩-এর ২৩-৪২ ধারাসমূহে সুস্পষ্টভাবে বিধিনিষেধ উল্লেখ আছে। এ বিধিনিষেধ প্রতিপালনে ব্যর্থতা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। খাদ্য উৎপাদক বা ব্যবসায়ীর বিশেষ দায়-দায়িত্ব আইনের ৪৩ ও ৪৪ ধারায় বর্ণিত আছে। এগুলো মেনে চলা বাধ্যতামূলক। খাদ্য নিরাপদ রাখতে কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতা প্রদানে ও আইনের ১৯ ধারায় বাধ্যবাধকতার বিষয়টি বলা আছে।

যে কারো নিকট ভেজাল, দূষিত বা অনিরাপদ খাদ্য বিক্রয় হলে, তিনি বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান বা তাঁর ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট লিখিত অভিযোগ করতে পারবেন, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য আইনের ৬৬ ও ৭৮ ধারা বলে। ধারা ৬৪, ৬৫ ও ৬৬ মোতাবেক তিনি ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট জেলার বিশুদ্ধ আদালতে ইচ্ছা করলে মামলা দায়ের করতে পারবেন। আইনের ধারা ৬২ অনুযায়ী অভিযোগ প্রমাণিত হলে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অর্থদণ্ড আরোপিত হলে অভিযুক্ত আদায়কৃত অর্থের শতকরা ২৫ ভাগ অর্থ অভিযোগকারী প্রণোদনা হিসেবে পাবেন।

নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩-এর ২৩-৪২ ধারা মোতাবেক অপরাধ প্রমাণিত হলে অপরাধের ধরন অনুযায়ী ৬ মাস হতে ৫ বছর মেয়াদে কারাদণ্ড বা এক লক্ষ থেকে দশ লক্ষ পর্যন্ত অর্থদণ্ড বা উভয়দণ্ডের বিধান রয়েছে। একই অপরাধ পুনঃসংঘটনের জন্য অধিকতর দণ্ড এবং জরিমানার বিধান রয়েছে। ধারা ৩২, ৩৬, ৩৮-৪২-এ বর্ণিত অন্যান্য সকল অপরাধ আমলযোগ্য এবং অজামিনযোগ্য।

জীবন ও খাদ্য দুটি একে অপরের পরিপূরক। সুস্থ সবল জাতি গঠনে নিরাপদ খাদ্যের ভূমিকা অপরিসীম। আমরা বিশ্বাস করি যথাযথ পরিকল্পনা, বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি অনুসরণ বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩-এর বিধি ও প্রবিধানমালাসমূহের যথাযথ প্রয়োগ-এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করবে। সরকার, সরকারি/বেসরকারি সংস্থা, ব্যবসায়ী, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, জনপ্রতিনিধি, সাংবাদিক, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, ধর্মীয় নেতা, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াসহ সকল স্তরের জনগণের স্ব-স্ব ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের মাধ্যমে দেশের জনগণের জন্য নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত হবে।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রা অর্জনে নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনার ভূমিকা: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

মোঃ ইমরুল হাসান
মোঃ মাসুদ আলম

জাতিসঙ্ঘের নির্ধারিত ২০৩০-এর মধ্যে টেকসই লক্ষমাত্রা কিংবা ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্য অর্জনে (২০২১ ও ২০৪১-এর মধ্যে যথাক্রমে মধ্যম আয়ের ও উন্নত দেশে পরিণত হওয়া) নানাবিধ নিয়ামক বিভিন্নভাবে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখলেও সন্দেহের অবকাশ নেই নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অনেক বেশি অর্থবহ ভূমিকা পালন করবে। নিরাপদ খাদ্য, খাদ্যবিপত্তি, নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা এবং এর প্রয়োজনীয়তা, খাদ্য ব্যবসায়ী- খাদ্য নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা ও খাদ্য গবেষক তথা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সু-সম্পর্ক স্থাপন ইত্যাদি বিষয়গুলো খাদ্য নিরাপদতার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

খাদ্য নিরাপদতা কি এবং কেন?

প্রত্যেক দিন অসংখ্য মানুষ দুষিত খাবার খেয়ে রোগাক্রান্ত হচ্ছে এবং যাদের অনেকেই গুরুতর অসুস্থ হয়ে মৃত্যু মুখে পতিত হচ্ছে। কেউ কেউ আবার সারা জীবনের জন্য রোগের বাহক হচ্ছে এবং বংশ পরম্পরায় আক্রান্ত হচ্ছে। খাদ্যবাহিত রোগে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হচ্ছে শিশু, বয়স্ক ব্যক্তি, গর্ভবতী মহিলা এবং কমরোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তি।

নিরাপদ খাদ্যআইন ২০১৩ অনুসারে, "নিরাপদ খাদ্য" অর্থ প্রত্যাশিত ব্যবহার ও উপযোগিতা অনুযায়ী মানুষের জন্য বিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্যসম্মত আহার্য। আর খাদ্য বিপত্তি অর্থ মানব স্বাস্থ্যের প্রতিকূল কোনো কারণের উদ্ভব করিতে পারে এইরূপ কোনো জৈবিক, রাসায়নিক বা ভৌত, ইত্যাদি কারণে সৃষ্ট অথবা প্রাকৃতিক ভাবে উৎপাদিত পদার্থের উপস্থিতি বা সৃষ্ট অবস্থা।

খাদ্যবিপত্তি যেমন অণুজীবঘটিত, ভৌত, রাসায়নিক অথবা এলার্জি সৃষ্টিকারী বা অসহিষ্ণু প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিকারী খাদ্য বিপত্তি মাঠ থেকে পাত পর্যন্ত খাদ্য শৃঙ্খলের যেকোনো পর্যায়ে ঘটতে পারে।

খাদ্যশৃঙ্খলের এমন কোনো পর্যায় নেই যেখানে জৈববিপত্তি তথা ব্যাকটেরিয়ার উপস্থিতি নেই। তাছাড়া, যেকোনো পর্যায়ে ইস্ট, মোল্ড ও ভাইরাসও আসতে পারে। রাসায়নিক খাদ্য বিপত্তি ইচ্ছাকৃত এবং অনিচ্ছাকৃতভাবে খাদ্যশৃঙ্খলে যুক্ত হতে পারে। অনিচ্ছাকৃত বিপত্তির মধ্যে আছে বালাইনাশক, আগাছানাশক, পরিষ্কার- পরিচ্ছন্নতার কাজে ব্যবহৃত রাসায়নিক দ্রব্য ইত্যাদি। আর ইচ্ছাকৃত বিপত্তিতে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের অননুমিত খাদ্য সংযোজিত দ্রব্য যেমন: সংরক্ষণকারী রাসায়নিক, রঞ্জক দ্রব্য, সুগন্ধি দ্রব্য ইত্যাদি। খাদ্য বিপত্তি প্রাকৃতিকভাবেও আসতে পারে যেমন, এলার্জি সৃষ্টিকারী বা অসহিষ্ণু প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিকারী খাদ্যদ্রব্য, বায়োটক্সিন এবং হিস্টামিন যা বিভিন্ন ধরণের উদ্ভিদ, প্রাণী ও অণুজীব থেকে আসতে পারে। ভৌত বিপত্তির মধ্যে ভাঙা গ্লাস, চুল, প্লাস্টিকের টুকরা ইত্যাদি খাদ্য শৃঙ্খলের যে কোনো পর্যায়ে আসতে পারে। বিভিন্ন বিপত্তি থেকে খাদ্যকে রক্ষা করে জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনার কোনো বিকল্প নেই। নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩ অনুসারে, নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (Food Safety Management System) বলতে নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, প্রস্তুতকরণ ও বিপণনে উৎকৃষ্ট পদ্ধতির (Good Agricultural Practices, Good Manufacturing Practices, Good Hygienic Practices) অনুশীলনসহ গ্রহণযোগ্য ব্যবস্থা, বিপত্তি বিশ্লেষণ (Hazard Analysis), সংকটকালীন জরুরি নিরাপত্তা সাড়া (Food Safety Emergency Response), অবশিষ্টাংশ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি (Residual Control System) ও খাদ্যের অনিরাপদতার উৎস নিরীক্ষা পদ্ধতি (Food Safety Auditng System) এবং সংশিষ্ট বিষয় অনুশীলন, যাহা এতদসংক্রান্ত বিদ্যমান আইনে নির্ধারিত মানদণ্ড ও বাধ্যবাধকতা প্রতিপালন নিশ্চিত কল্পে খাদ্য ব্যবসা পরিচালনার জন্য অনুমোদিত নির্দেশনায় (Approved Guidelines or Directives) বিদ্যমান।

খাদ্য নিরাপদতা হল এক বা একাধিক পদক্ষেপ যা ভোক্তার স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য খাদ্যকে খাদ্যের বিভিন্ন বিপত্তি থেকে রক্ষা করে। খাদ্যকে দুষিত করতে পারে তথা মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক খাদ্যস্থিত যেকোনো কিছুকে খাদ্যবিপত্তি বলা হয়। এক্ষেত্রে খাদ্য ব্যবসার সাথে জড়িত খাদ্যকর্মীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে খাদ্য সংশ্লিষ্ট বিপত্তি নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে।

মোঃ ইমরুল হাসান
ন্যাশনাল কনসালটেন্ট, ফুড সেইফটি সিস্টেম স্পেশিয়ালিস্ট, এফএও
মোঃ মাসুদ আলম
ন্যাশনাল কনসালটেন্ট, ফুড সেইফটি সাইন্টিস্ট, এফএও

এখন আসা যাক কেন আমাদের জন্য নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন? উত্তর খুবই স্বাভাবিক। বিষয়গুলো যদি বুলেট পয়েন্ট আকারে দেই তাহলে দাঁড়ায়:

- আপামর জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য সুরক্ষা
- রপ্তানিকৃত দেশের ভোক্তা সাধারণের স্বাস্থ্য সুরক্ষা
- কৃষিজ খাদ্য খাতের সুরক্ষা
- অর্থ খাতের সুরক্ষা ও উন্নয়ন
- ব্যবসা খাতের সুনাম ধরে রাখা
- পর্যটন খাতের সুরক্ষা, বিকাশ ও উন্নয়ন
- প্রক্রিয়াজাতকরণে সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়ন
- খাদ্য ঝুঁকি / বিপত্তিনিয়ন্ত্রণে যথাযথ ও ডাইনামিক ভূমিকা
- উৎপাদন নিয়ন্ত্রণে সঠিক ব্যবস্থাপনা (Systematic management)
- যথোপযুক্ত ডকুমেন্টেশন
- খাদ্য ব্যাবসার সাথে জড়িত সকল ট্রেড পার্টনারদের যোগাযোগ স্থাপন
- খাদ্য সরবরাহ শৃঙ্খলে সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহার
- খাদ্য অপচয়রোধকল্পে
- সর্বদা সঠিক মানসম্মত পণ্য উৎপাদন।
- ভোক্তা অভিযোগ নিরসনে।
- যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ খরচ কমবে।
- পণ্যের উৎপাদন বাড়বে এবং উৎপাদন খরচ কমবে।
- পণ্যের চাহিদা বাড়বে দেশে এবং বিশ্ব বাজারে
- যেকোনো নামি-দামি ব্র্যান্ডের সাথে সম-অবস্থান।

বাংলাদেশের মাঝারি ও বড় খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকারী বেশ কিছু কারখানা নিজ উদ্যোগে ব্যবসায় সুনাম এবং রপ্তানি ধরে রাখার স্বার্থে নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনার আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত বিভিন্ন পদ্ধতি যেমন জিএমপি বা হ্যাসাপেরকোডেক্স গাইডলাইনস-সিএসি/আরসিপি ১-১৯৬৯, সংস্করণ ৪-২০০৩ (CAC/RCP 1-1969, Rev. 4-2003) অনুযায়ী খাদ্য উৎপাদনে সঠিক অনুশীলন, বিআরসি-গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ড ফর ফুড সেফটি, আইএফএস-ফুড, আইএসও/এফএসএসসি ২২০০০, গ্লোবাল গ্যাপ, বিএপি, এএসসি, ওরগানিক, হালাল ইত্যাদি অনুশীলন করে আসছে। কিন্তু পথখাবার, রেস্তোরাঁ, ক্ষুদ্র ও বেশিরভাগ মাঝারি খাদ্য কারখানাতে একবারেই অনুপস্থিত। আর এক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয়ভাবে নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনার কোনো বিকল্প নেই। আসার কথা বাংলাদেশ সরকার নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ মহান সংসদে অনুমোদন করেছে এবং এই আইনের আলোকে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ এবং জাতীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হয়েছে। কর্তৃপক্ষ নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩ বাস্তবে রূপদিতে, পঞ্চবার্ষিকি পরিকল্পনা প্রণয়ন, খাদ্য আদালত প্রতিষ্ঠা, নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শক ও খাদ্য এনালিস্টের দায়িত্ব প্রণয়ন, খাদ্য পরীক্ষাগার নির্ধারণ, প্রয়োজনীয়বিধি, প্রবিধি প্রণয়ন ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমসহ বিভিন্ন খাদ্য নিয়ন্ত্রণে সংস্থাগুলোর সাথে সমন্বয়, নিয়ন্ত্রণ ও সহযোগিতা কার্যক্রম ইত্যাদি অব্যাহত রয়েছে।

আমরা জানি বাংলাদেশ ইতোমধ্যে খাদ্য নিরাপত্তায় সফলতা অর্জন করেছে এবং বর্তমানে আমরা কিন্তু নিম্ন মধ্যম আয়ের জাতি হিসেবে সাফল্যের টেকুর তুলতেই পারি। কিন্তু যদি প্রশ্ন করা হয় নিরাপদ খাদ্য নিয়ে আমরা কতটুকু সফল তখন কিন্তু পক্ষে- বিপক্ষে নানাবিধ ঝড় উঠবে এবং এ বিষয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম থেকে শুরু করে ইলেক্ট্রনিক, প্রিন্ট ও টিভি-রেডিওতে আলোচনার ঝড় চলবে বৈ থামবে না। এক্ষেত্রে আমরা সবাই বিজ্ঞানী! যা হোক একটু পরিসংখ্যান দেখি আসি:

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এর প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রতীয়মান যে, দূষিত খাবার গ্রহণে প্রতি বছর প্রায় ৬০০ মিলিয়ন বা প্রায় প্রতি ১০ জন মানুষের মধ্যে প্রায় ১ জন অসুস্থ হয়। এর মধ্যে ৪২০,০০০ জন মারা যায়, যার মধ্যে ৫ বৎসরের কম বয়সী শিশুর সংখ্যা ১২৫,০০০। আমেরিকার খাদ্য ও ওষুধ প্রশাসনের হিসাব মতে খাদ্যবাহিত রোগের ২% থেকে ৩% দীর্ঘ মেয়াদী অসুস্থতার কারণ হতে পারে। অ্যামেরিকান সেন্ট্রাল ডায়াগনোসিস সেন্টারের মতে অধিকাংশ খাদ্যবাহিত অসুস্থতা সালমোনেলা, ক্যাম্পাইলোব্যাকটার ও Ecoli0157:H7 ওনরো ভাইরাসের কারণে সংঘটিত হয়। বাংলাদেশ দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার মধ্যে অবস্থিত। এই অঞ্চলটি বিশ্বের জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশেরও বেশি এবং বিশ্বে খাদ্যবাহিত রোগে এ অঞ্চল দ্বিতীয় অবস্থানে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় বসবাসকারী লোকের ১৫০ মিলিয়নেরও বেশি অসুস্থ থাকে এবং ১৭৫,০০০ জনেরও বেশি মারা যায়। প্রতিবছর খাদ্যবাহিত অসুস্থতার কারণে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ৫ বছরের কম বয়সী ৬০ মিলিয়ন শিশু অসুস্থ এবং ৫০,০০০ শিশু মারা যায়।

উপরোক্ত তথ্য-উপাত্ত থেকে এটা প্রতীয়মান হওয়া যায়, আমরা আপামর জনগোষ্ঠীর জন্য খাদ্য নিশ্চিত করেছি ঠিকই, নিরাপদ খাদ্যের নিরাপত্তা থেকে অনেক পিছিয়ে আছি। ফলশ্রুতিতে জাতি প্রয়োজনীয় পুষ্টি থেকেও বঞ্চিত হচ্ছে। তাই আমরা যদি ২০৩০ সাল নাগাদ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে চাই, পুষ্টি চাহিদা পূরণ করে স্বাস্থ্যবান জাতি গঠন করতে চাই, সেক্ষেত্রে নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনার কোনো বিকল্প নেই। তাই, আসুন সবাই মিলে খাদ্যকে নিরাপদ করি, সুস্থ ও সবল জাতি গড়ি।

নিরাপদ খাদ্যে সুন্দর আগামী

আতাউর রহমান মিটন

অনাবিল উৎসাহ-উদ্দীপনা ও প্রাণচাঞ্চল্যের মধ্যে দিয়ে দেশে প্রথমবারের মতো 'জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস' পালিত হচ্ছে। সরকার প্রতিবছর ২ ফেব্রুয়ারি 'জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস' পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই সিদ্ধান্তটি নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে সরকারের সদিচ্ছারই প্রমাণ। দেশের প্রতিটি মানুষের জন্য নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে সরকার বদ্ধপরিকর। উৎপাদন থেকে খাবার প্লেট পর্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির যথাযথ অনুশীলনের মাধ্যমে খাদ্যকে নিরাপদ রাখতে সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিচ্ছে। তবে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা এই সদিচ্ছা পূরণের অন্যতম চাবিকাঠি।

খাদ্য আমাদের অন্যতম মৌলিক অধিকার। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫ (ক) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সকল নাগরিকের খাদ্যের মৌলিক চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের 'মৌলিক দায়িত্ব'। জাতিসংঘের ঘোষণা অনুযায়ী, ব্যক্তির শারীরিক ও মানসিক চাহিদাপূরণ আত্মমর্যাদা এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ খাবারের স্থায়ী জোগানের নিশ্চয়তা বিধানই হচ্ছে খাদ্য অধিকারের মূল কথা। মানুষের খাদ্য নিরাপদ হবে এটাই প্রত্যাশিত। যে খাবার নিরাপদ নয়, তা খাদ্য নয়। অনিরাপদ খাদ্য স্বল্পমেয়াদি স্বাস্থ্য সমস্যার পাশাপাশি দীর্ঘমেয়াদি জটিলতা সৃষ্টি করে। ফলে রাষ্ট্রের পাশাপাশি পরিবার বা ব্যক্তিকেও এর কুফল ভোগ করতে হয়।

বর্তমান সরকার দেশের সকল মানুষের নিরাপদ খাদ্য অধিকার নিশ্চিত করতে অঙ্গীকারবদ্ধ। সরকারের সেই সদিচ্ছা পূরণে নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ জনগণকে সাথে নিয়ে নিরলসভাবে কাজ করছে। মহান ভাষা আন্দোলনের এই মাসে 'নিরাপদ খাদ্য দিবস' পালন আমাদের খাদ্য নিরাপত্তা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সুরক্ষায় সরকারের রাজনৈতিক অঙ্গীকার পূরণের আরেকটি মাইলফলক।

বাংলাদেশে খাদ্যের কোনো অভাব নেই। দেশের সর্বস্তরে মানুষের আয় রোজগার বৃদ্ধি পাওয়ায় মানুষের পক্ষে খাদ্য গ্রহণে অভিগম্যতাও বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশ আজ গর্বিত খাদ্য উৎপাদনে অভূতপূর্ব সফলতা অর্জনের জন্য। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ছিল প্রায় সাড়ে সাত কোটি কিন্তু সকলের চাহিদা মেটানোর মতো খাদ্য তখন উৎপাদিত হতো না। অথচ এখন বাংলাদেশের জনসংখ্যা প্রায় ১৬ কোটি অর্থাৎ দ্বিগুণেরও বেশি হওয়া সত্ত্বে ও আমরা খাদ্যাভাব বা খাদ্য সংকটের মতো কোনো ভয়াবহ পরিস্থিতি মোকাবেলা করছি না। বাংলাদেশ ধান উৎপাদনে বিশ্বের মধ্যে চতুর্থ, সবজি উৎপাদনে তৃতীয়, মিষ্টি পানির মাছ উৎপাদনে চতুর্থ। এই সূচকগুলো বাংলাদেশের সংগ্রামী মানুষগুলোর লুক্কায়িত প্রতিভা এবং আমাদের খাদ্য সার্বভৌমত্বের পরিচয় বহন করে। এটাই আমাদের গৌরব। এটাই আমাদের স্বাধীনতা ও বিজয়ের সার্থকতা।

সরকারের সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুযায়ী আগামী ২০২১ সালে দেশে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা ১০.২-এ নামিয়ে আনা এবং 'সবার জন্য খাদ্য' নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩ প্রণয়ন বর্তমান সরকারের একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এই আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। তবে এটাও মনে রাখতে হবে যে, 'মানুষের জন্য আইন, আইনের জন্য মানুষ নয়'। আমরা বাংলাদেশকে একটা বৃহত্তর কারাগার হিসেবে দেখতে চাই না। আইনের আওতায় কাউকে শাস্তি দেয়ার চাইতে বরং আইন অনুযায়ী বা আইনের আওতায় নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ, বিপণন ও বিক্রয় সংশ্লিষ্ট সমন্বয়ের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্টদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানের প্রস্তাব করছি।

খাদ্যদূষণ এবং খাদ্যে ভেজাল এক নয়। খাদ্যে ভেজাল মেশানো একটি অনৈতিক কাজ এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এক্ষেত্রে আইনের 'জিরো টলারেন্স' দেখানো উচিত। কিন্তু খাদ্য দূষণ একটি জটিল প্রক্রিয়া এবং উৎপাদকের অনিচ্ছা সত্ত্বেও উৎপাদিত খাদ্য দূষিত হতে পারে। খাদ্যে উৎপাদনে ব্যবহৃত মাটি, পানি ও বাতাস দূষণের কারণেও উৎপাদিত খাদ্য দূষিত হতে পারে। আবার নিরাপদ উপায়ে উৎপাদিত খাদ্যও অনিরাপদ হ্যান্ডেলিংয়ের কারণে দূষিত হতে পারে। খাদ্য কিভাবে দূষিত হয় তা জানা আমাদের সকলের জন্য অপরিহার্য। মানুষ যত বেশি এই বিষয়গুলো জানবে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা ততই বেগবান হবে।

নিরাপদ খাদ্য সকলের প্রাণের বিষয়। নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে হলে খাদ্যের কঠোর মান নিয়ন্ত্রণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। খাদ্যমান পরীক্ষার যন্ত্রপাতি এবং পদ্ধতি নির্ভুল হওয়া আবশ্যক। ফলের ওপর ফরমালিন প্রয়োগ করা যায় না বা করলেও কোন তারতম্য ঘটে না সেই বিজ্ঞানটা সকলের জানা আবশ্যক। খাদ্য দূষিত হওয়ার বিপজ্জনক তাপমাত্রা ৫-৬০ ডিগ্রি সেলসিয়াস সেটাও জানতে হবে। আইন সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং আইন বাস্তবায়নে 'সামাজিক উদ্যোগ' গ্রহণ বা 'সামাজিক তদারকি' জোরদার করা প্রয়োজন।

আতাউর রহমান মিটন
সাধারণ সম্পাদক, নিরাপদ ফাউন্ডেশন

নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন ও বিপণনে আর্থিক সহায়তা বৃদ্ধি করা হলে তা দেশের সামগ্রিক খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে। এমনকি তা আমাদের রপ্তানি আয় বৃদ্ধিতেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। আমাদের মনে হয় একটা কথা স্পষ্ট করে বলার সময় এসেছে, তা হলো বাংলাদেশের জনগণ এখন আর ৫-১০ হাজার টাকা পরিমাণ ক্ষুদ্র ঋণের জালে আটকা পড়তে আগ্রহী নয়। আমাদের জনগণের সক্ষমতা বেড়েছে এবং তারা এখন ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের দিকে, বাণিজ্যিক খামারের দিকে নজর দিতে চায়। সমাজভিত্তিক মূল্যবোধের জাগরণ ঘটিয়ে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন ও বিপণনে আমাদের সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকার বাংলাদেশকে উন্নত রাষ্ট্রের পথে পরিচালনা করছেন। আমাদের অর্থনৈতিক ভিত্তি প্রতিনিয়ত মজবুত হচ্ছে। সে কারণেই আমরা আশাবাদী যে আগামীতে নিরাপদে খাদ্যে অর্থায়ন বৃদ্ধি পাবে এবং আমরা খাদ্য নিরাপদতায় বিশ্বের বুকে দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করতে সক্ষম হবো। বাংলাদেশের খাবারকে এমন একটা মানে নিয়ে যেতে সক্ষম হবো যাতে করে আমাদের রপ্তানিক্ষেত্রে কোনো বাধা না থাকে। পর্যটকগণ বাংলাদেশে এসে নিরাপদে খাবার গ্রহণ করবেন এবং ফিরে গিয়ে আমাদের খাদ্যমান ও আতিথিয়তা সম্পর্কে অন্যদের উৎসাহিত করবেন এমন একটা ভবিষ্যতের স্বপ্ন আমাদের সকলের। সুন্দর সেই বাংলাদেশ গড়ে তুলতে হলে নিরাপদ খাদ্যের সামাজিক আন্দোলনে যুব সমাজকে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত করতে হবে। নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনে যুবদের প্রশিক্ষণ ও আর্থিক সহায়তা দেয়ার মাধ্যমে আমরা বেকারত্ব অবসানের পাশাপাশি সকলের জন্য নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তি সহজতর করতে পারি।

জাপানের মানুষের গড় আয়ু বিশ্বে সবচেয়ে বেশি। তথাপি সে দেশের সরকার ২০০৪ সাল থেকে আইন করে 'খাদ্য শিক্ষা' কর্মসূচি পরিচালনা করছে। সঠিক খাদ্যাভ্যাস অনুশীলনের মাধ্যমে জাপানিরা যেন সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে পারে সেই লক্ষ্যে জাপানের সকল সরকারি কিন্ডারগার্টেন বা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে 'সোকু-ইকু' (খাদ্য শিক্ষা) নামক কর্মসূচীটি পরিচালিত হয়। অপুষ্টি কিংবা স্থূলতা উভয়ই অসুস্থতা এবং রাষ্ট্রের জন্য বোঝা। উন্নত দেশগুলোর মতো আমরাও এ বিষয়ে ধীরে ধীরে সচেতন হচ্ছি। উল্লেখ্য, জাপানে 'খাদ্য শিক্ষা' কর্মসূচিটি বাস্তবায়িত হয় মিড-ডে মিল এর সাথেই। এই কর্মসূচির অন্যতম আরেকটি দিক হলো শিক্ষার্থীদের খাদ্য উৎপাদন এবং পরিবেশনের সাথে সম্পৃক্ত করা। এর ফলে শিশুদের মধ্যে দায়িত্বশীলতা, নেতৃত্ব দান এবং টিম ম্যানেজমেন্ট শেখার সুযোগ তৈরি। হয়। সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাচ্চাদের মধ্যে খাদ্য কি, কিভাবে তৈরি হয়, খাদ্য উৎপাদনের পেছনে কত পরিশ্রম হয় সেই সচেতনতা সৃষ্টি করা না হলে তারা খাদ্য উৎপাদনের সাথে জড়িতদের সম্মান করতে শিখবে না। বিশেষ করে, কৃষি পেশায় আগামীতে কাউকে পাওয়া যাবে না। জাপানের এই অভিজ্ঞতা থেকে আমরা শিক্ষা নিতে পারি। আমাদের দেশেও শিক্ষা কারিকুলামে 'নিরাপদ খাদ্য' বিষয়ক আলোচনা সংযুক্ত করা প্রয়োজন মনে করি।

নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা একটি জটিল প্রক্রিয়া। খাদ্য ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত প্রায় ২৫ লক্ষ ব্যক্তি ও ১৮টি মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করাটা এখনও অনেক বড় একটা চ্যালেঞ্জ। ভোক্তার পক্ষে তো টেস্ট কিট নিয়ে বাজারে যাওয়া বা হোটেলে খাওয়া সম্ভব নয়। ভোক্তা নিশ্চিন্ত নির্ভরতায় বাজার করবে বা খাবার খাবে সেই নিশ্চয়তা দেবার জন্য করণীয় সম্পর্কে সর্বস্তরে আলোচনা হতে হবে। আমাদের 'খাদ্যমান মনিটরিং' ব্যবস্থাপনা জোরদার করতে হবে। বিদেশ থেকে আমদানিকৃত খাদ্যপণ্য দেশে ঢোকার মুখেই সঠিকভাবে পরীক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। এর জন্য কার্যকর ল্যাব প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩-এর আওতায় গঠিত নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সাথে জনগণের সেতুবন্ধন মজবুত করতে হবে। নিরাপদ খাদ্য নিয়ে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি অনেক দেশি-বিদেশি সংগঠন কাজ করছে। এদের সকলকে একটা ছাতার নিচে এনে সমন্বয়ের কাজকে বেগবান করা যায়। নিরাপদ খাদ্য বিষয়ে গণমাধ্যমের ভূমিকা অত্যন্ত শক্তিশালী। গণমাধ্যমে যখন কিছু প্রকাশিত বা প্রচারিত হয় সাধারণ মানুষ তা বিশ্বাস করে। অনেক সময় না বুঝে নেতিবাচক সংবাদ বা প্রতিবেদন প্রকাশের কারণে জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয় এবং প্রকারান্তরে তা জনগণের উপকারের চেয়ে ক্ষতিই করে বেশি। সুতরাং সঠিক তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করতে হবে। মানুষ যেন সহজেই অভিযোগ দায়ের করতে পারে তার জন্য ডিজিটাল প্রযুক্তিনির্ভর ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। নিরাপদ খাদ্য তদারকির দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিদের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং তারা যেন নির্ভুলভাবে খাদ্যের মান যাচাই করতে পারে তার জন্য যথাযথ কারিগরি সক্ষমতা নিশ্চিত করতে হবে। জনমনে আস্থার অভাব ঘটে বা বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়, এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করা থেকে সংশ্লিষ্ট সকলের বিরত থাকা প্রয়োজন।

নিরাপদ খাদ্য সকলের অধিকার। সরকার এই অধিকার নিশ্চিতকরণে অঙ্গীকারবদ্ধ। 'নিরাপদ খাদ্য দিবস' পালন কেবল আনুষ্ঠানিকতা নয়, বরং সরকারের শুভ উদ্যোগের একটি অনন্য নিদর্শন হয়ে উঠুক এই কামনা করছি। 'কার্যকর সমন্বয় সাধন' আমাদের সকলের চাওয়া। নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ সমন্বয়ের সেই কাজটুকু যথাযথভাবে করলে আমরা জনগণ তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব। নিরাপদ খাদ্যে গড়ে উঠুক সুন্দর আগামী। নিরাপদ খাদ্য দিবস সফল হোক।

খাদ্য নিরাপত্তা ও নিরাপদতা: প্রেক্ষিত ভিশন ২০২১ ও সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

সমীর কুমার বিশ্বাস

আমাদের জাতির পিতা, স্বাধীনতার মহান স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘের ২৯তম সাধারণ অধিবেশনে বক্তব্য বক্তব্য প্রদানকালে বলেছিলেন 'আসুন সবাই মিলে এমন এক পৃথিবী গড়ে তুলি যেখানে দারিদ্র্য, ক্ষুধা, যুদ্ধ এবং দুর্ভোগ থাকবে না এবং মনুষ্যত্বের স্বার্থে বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করি। Let us together create a world that can eradicate poverty, hunger, war and human sufferings and achieve global peace and security for the well being of humanity.' জাতির পিতার এই ঐতিহাসিক বক্তব্যের মাঝে আমরা ক্ষুধামুক্ত বিশ্ব এবং মানুষের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তার বিশ্ব গড়ার দৃঢ় প্রত্যয় খুঁজে পাই। ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত একটি নিরাপদ বিশ্বের জন্য খাদ্য নিরাপত্তা ও নিরাপদতা একটি অন্যতম উপাদান/নিয়ামক হিসেবে আমরা অবশ্যই তুলে ধরতে পারি।

মানুষের মৌলিক চাহিদাসমূহ হচ্ছে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা। খাদ্যকে আমরা আমাদের মৌলিক চাহিদার সর্বাগ্রে দেখতে পাই। মূলত আমাদের অস্তিত্ব খাদ্যের ওপর নির্ভরশীল একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। খাদ্য নিরাপত্তা ও নিরাপদতা তাই আমাদের জন্য একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক তথা রাষ্ট্রীয় স্থিতিশীলতা ও উন্নয়ন খাদ্য নিরাপত্তার সংঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। এ প্রেক্ষিতেই আমাদের বিভিন্ন জাতীয় নীতিমালা ও কর্মপরিকল্পনায় খাদ্য নিরাপত্তা ও নিরাপদতার বিষয়টি তাই অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে উত্থাপিত হতে দেখি।

বর্তমানে বাংলাদেশের বহুল আলোচিত ও কাঙ্ক্ষিত পরিকল্পনা হচ্ছে 'দিনবদলের সনদ', যা আমাদের উপহার দিয়েছে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' নামক একটি উন্নয়ন কর্মযজ্ঞ। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২০২১-এ আমরা এই ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপরেখা পাই। উক্ত প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় আমরা খাদ্য নিরাপত্তা ও খাদ্য নিরাপদতা নিয়ে যে লক্ষ্য বা ভিশন পাই তা নিম্নরূপ-

টার্গেট নং	রূপকল্প ২০২১-এর লক্ষ্যমাত্রা
০২	২০১১ সালের মধ্যে দেশের সকল মানুষের জন্য নিরাপদ সুপেয় পানির ব্যবস্থা ।
০৩	২০১২ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা।
১৬	২০২১ সালের মধ্যে দেশের ৮৫% নাগরিকের মানসম্মত পুষ্টির চাহিদা পূরণ।
১৭	২০২১ সালের মধ্যে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য প্রতিদিন ন্যূনতম ২১২২ কিলোক্যালরির উর্ধ্বে খাদ্য ।
১৯	২০২১ সালের মধ্যে গড় আয়ু ৭০ বছরে উন্নীত করা ।

বর্তমানে বাংলাদেশ উন্নয়নের মহাসড়কে এগিয়ে চলছে দৃপ্ত পায়ে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার মহাপ্রত্যয় নিয়ে আমরা রচনা করেছি সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা। এ মহাপরিকল্পনায় আমরা খাদ্য নিরাপত্তা ও নিরাপদতা নিয়ে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা পাই। সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার (২০১৬-২০২০) কৃষির মাধ্যমে খাদ্য সেক্টরের উন্নয়ন বিষয়ক কর্মপরিকল্পনায় আমরা নিম্নোক্ত অঙ্গীকারসমূহ পাই:

Crop sub-sector strategies under the 7th Plan:

The major objective of crop sub-sector for 7th FYP are to:

Ensure food security for the national populace in which food is broadly defined to go beyond cereals, and food security is defined in terms of all its dimensions including availability, access, utilization (nutrition) and stability.

Targets: With a view to enhancing agricultural production and ensuring food security, the target under the 7th FYP would be to attain and maintain self-sufficiency in staple food (rice) production and meet the nutritional requirement of the population through supply of an adequate and diverse range of foods.

(Source: 7th Five Year Plan (FY 2016-2020); General Economic Division (GED), Planning Commission, Government of the people's Republic of Bangladesh. Page-266-267)

সমীর কুমার বিশ্বাস
উপসচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়
(বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষে নিয়োজিত)

সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার (২০১৬-২০২০) স্বাস্থ্য বিষয়ক কর্মপরিকল্পনায় বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার স্বাস্থ্য বিষয়ক সংজ্ঞাকে সামনে রেখে খাদ্য নিরাপত্তা ও নিরাপদতার বিষয়ে আমরা নিম্নোক্ত অঙ্গীকারসমূহ পাই:

The World health Organization defines health as 'a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity.

Government's vision for health, nutrition and population sector is as follows:

The Government seeks to create conditions whereby the people of Bangladesh have the opportunity to reach and maintain the highest attainable level of health. It is a vision that recognizes health as a fundamental human right, and therefore, the need to promote health and to alleviate ill health and suffering in spirit of social justice. This vision derives from a value framework that is based on the core values of access, equity, gender equality and ethical conduct.

(Source: 7th Five Year Plan (FY 2016-2020); General Economic Division (GED), Planning Commission, Government of the people's Republic of Bangladesh.) Page: 501)

বাংলাদেশ সরকার খাদ্য নিরাপত্তা ও খাদ্য নিরাপদতাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে তার কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করছে। ইতোমধ্যে নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩ প্রণীত হয়েছে। উক্ত আইনে খাদ্য নিরাপত্তা ও খাদ্য নিরাপদতাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করে নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনার বিষয়ে জোর দেওয়া হয়েছে। নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩-এর প্রবেশক অংশে আইনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে:

(১) বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির যথাযথ অনুশীলনের মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিকরণ।

(২) খাদ্য উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ, বিপণন ও বিক্রয় কার্যক্রম সমন্বয়ের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ।

(৩) উপরোক্ত লক্ষ্য অর্জনে একটি দক্ষ ও কার্যকর কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা।

উল্লেখ্য যে, খাদ্য নীতি ২০০৬ এবং খাদ্য নীতির আলোকে প্রণীত অ্যাকশন প্লান ২০০৮-২০১৫ তেও নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণের বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার (২০১৬-২০২০) স্বাস্থ্য বিষয়ক কর্মপরিকল্পনায় জনগণের পুষ্টি নিশ্চিতকরণের বিষয়ে উক্ত নীতিমালার আলোকে বলা হয়েছে-

Strategy for Nutrition: A strategy for nutritional planning is outlines in the National Food Policy (2006) and the National Food Policy Plan of Action-NFP PoA(2008-2015), which was developed by 11 line ministries. The main objectives of the NFP PoA are to achieve adequate and stable supply of safe and nutritious food for everyone.

(Source: 7th Five Year Plan (FY 2016-2020); General Economic Division (GED), Planning Commission, Government of the people's Republic of Bangladesh.) Page: 519)

বাংলাদেশের জাতীয় উন্নয়নের পরিকল্পনা বর্তমানে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য বা এসডিজির আলোকে করা হচ্ছে দেশজ উন্নয়নকে বৈশ্বিক উন্নয়নের সাথে সামঞ্জস্য করার জন্য। এসডিজিতেও নিরাপদ খাদ্য ও খাদ্য নিরাপদতার কথা সবিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। উল্লেখ্য যে, এসডিজির অন্যতম নীতি হচ্ছে Leave No One Behind বা কাউকে বাদ দিয়ে উন্নয়ন নয়। এই সকলের জন্য উন্নয়নের দলিলে খাদ্য নিরাপত্তা ও নিরাপদতার বিষয়ে আমরা অভীষ্টসমূহ এভাবে পাই:

অভীষ্ট-২ (Goal 2)	খাদ্য (Food)	ক্ষুধার অবসান, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টিমান অর্জন এবং টেকসই কৃষির প্রসার। (End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture)	৮টি লক্ষ্যমাত্রার আওতায় ১৩টি সূচক
অভীষ্ট-৩ (Goal 3)	স্বাস্থ্য (Health)	সকল বয়সী সকল মানুষের জন্য সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণ (Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages)	১৩টি লক্ষ্যমাত্রার আওতায় ২৬টি সূচক

আমাদের দেশের জনসংখ্যা বর্তমানে প্রায় ১৬ কোটি। প্রতিদিন এ সংখ্যা বেড়েই চলছে। এ বিপুল মানুষের জন্য খাদ্য জোগান দেয়া সরকারের একার পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার। আবার জনসংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ কমে যাচ্ছে। এ কারণে আমাদের খাদ্য নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ছে। পুরো পৃথিবীর খাদ্য নিরাপত্তা বর্তমানে যেখানে মারাত্মক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি সেখানে আমাদের মতো দরিদ্র ও প্রযুক্তিগতভাবে পশ্চাৎপদ দেশের সীমিত সামর্থ্য নিয়ে আমরা এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কতটুকু সামর্থ্য হবো? এ প্রশ্নের উত্তর ও উপায় আমাদেরই খুঁজে বের করতে হবে। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য আমাদের খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে। আমাদের যে পরিমাণ খাদ্যশস্য দরকার, তা যদি আমরা উৎপাদন করতে না পারি, তাহলে খাদ্য ঘাটতি হবেই। আর এ ঘাটতি পূরণের জন্য আমাদের আন্তর্জাতিক বাজারের ওপর নির্ভরশীল হতে হবে। কিন্তু এ নির্ভরতা আমাদের জন্য ভীষণভাবে বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। এ অভিজ্ঞতা আমরা ২০০৭ সালে অর্জন করেছি। তখন সারা বিশ্বে আমাদের প্রধান খাদ্য চালের উৎপাদন মারাত্মকভাবে হ্রাস পেয়েছিল। নিজেদের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য বিশ্বের প্রধান প্রধান চাল উৎপাদনকারী দেশ চাল রপ্তানি বন্ধ করে দিয়েছিল। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের এবং আমাদের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের একমাত্র উপায় আমাদের নিজেদের অভ্যন্তরীণ খাদ্য উৎপাদন বাড়ানো এবং এ ক্ষেত্রে বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ করা। গর্বের সাথে বলতে পারি যে, আমরা বর্তমানে খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতার দ্বারপ্রান্তে চলে এসেছি।

খাদ্য নিরাপত্তার সাথে সাথে বর্তমানে খাদ্য নিরাপদতার বিষয়টিও জোরেশোরে উচ্চারিত হচ্ছে। এ জন্য বর্তমান সরকার সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। নিরাপদ খাদ্য আইন প্রণয়ন এবং এর আওতায় জারিকৃত বিধিমালা [নিরাপদ খাদ্য (খাদ্যদ্রব্য জব্দকরণ ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ) বিধিমালা, ২০১৪; নিরাপদ খাদ্য (কারিগরি কমিটি) বিধিমালা,২০১৭] ও প্রবিধানমালা [নিরাপদ খাদ্য (রাসায়নিক দূষক, টক্সিন ও ক্ষতিকর অবশিষ্টাংশ) প্রবিধানমালা ২০১৭; খাদ্য-সংযোজন দ্রব্য ব্যবহার প্রবিধানমালা,২০১৭; মোড়কাবদ্ধ খাদ্য লেবেলিং প্রবিধানমালা,২০১৭] এর বিধিবিধানসমূহকে প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন করার জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তি মানুষের অন্যতম মৌলিক অধিকার। এই অধিকার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞগণ তিনটি বিষয়কে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন। এগুলো হলো-(১) খাদ্যের সহজলভ্যতা বা সহজপ্রাপ্যতা (Availability); (২) খাদ্য ক্রয়ের বা সংগ্রহের সক্ষমতা (Accessibility) এবং (৩) প্রাপ্ত খাদ্যের গুণগত মান বা পরিমাণের পর্যাপ্ততা (Adequacy)। এর প্রতিটি ধাপে বিজ্ঞানসম্মতভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করে আমাদের অগ্রসর হতে হবে এবং নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ সরকারের সকল উদ্যোগকে জনবান্ধব করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করে যাচ্ছে।

ত্রিশ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের এই পবিত্র সংবিধানের ১৫.ক অনুচ্ছেদে আমরা খাদ্যকে একটি মৌলিক মানবাধিকার হিসেবে পাই। 'মৌলিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা' শীর্ষক উক্ত অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রের দায়িত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে-'অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা।' পবিত্র সংবিধানের এই মৌলিক মানবিক প্রয়োজনীয়তার নিরিখেই বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা ও নিরাপদতা সুরক্ষার সকল কর্মকাণ্ড পরিচালিত হবে-এটাই এখন সময়ের দাবি।

বাংলাদেশে উদ্যানতাত্ত্বিক ফসলের গুণগতমান ও নিরাপদতা নিশ্চিতকরণ

ড. মোহাঃ কামরুল হাছান

ভূমিকা

উদ্যানতাত্ত্বিক ফসল বিশেষ করে ফল, শাকসবজি এবং মসলাজাতীয় পণ্য ভিটামিন, খনিজ পদার্থ, এন্টিঅক্সিডেন্ট এবং হজম উপযোগী আঁশের উল্লেখযোগ্য উৎস। আমাদের প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় পর্যাপ্ত পরিমাণে ফল ও শাকসবজি থাকা দরকার যা বিশেষভাবে শিশু ও বাড়ন্ত বয়সের মানুষের সুস্থ ও সবল থাকার জন্য ভূমিকা রাখে। পুষ্টি নিরাপত্তা, জনস্বাস্থ্য এবং রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য গুণগতমানসম্পন্ন ও নিরাপদ খাদ্য সরবরাহ একটি বড় চ্যালেঞ্জ। বর্তমানে আমাদের সমাজে খাদ্য নিরাপদতা (Food Safety) সংক্রান্ত ভীতি বিরাজমান। বিগত বছরগুলোতে খাদ্য ভেজালজনিত কারণে ক্যান্সার, হৃদরোগ এবং কিডনিরোগে মৃত্যুহার বৃদ্ধি পেয়েছে ১.২। খাদ্যে বালাইনাশক সহ অন্যান্য এগ্রো-কেমিক্যালের অবশিষ্টাংশের মাত্রাতিরিক্ত উপস্থিতি একটি উল্লেখযোগ্য নিরাপদতা ঝুঁকি হিসাবে বিবেচিত হয়। এছাড়াও অণুজৈবিক দূষণ ও বিষাক্ত পদার্থের (Toxin) উপস্থিতি খাদ্যকে অনিরাপদ করতে পারে। সাম্প্রতিককালে দেশের এই গভীর সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে বাংলাদেশে নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩ জারি করা হয়েছে এবং এই আইনের আওতায় বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ (বিএফএসএ) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যা বর্তমান বাংলাদেশ সরকারের একটি সময়পোযোগী পদক্ষেপ। খাদ্য উৎপাদন (যেমন বীজ, সার, উদ্ভিদ বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক, কীটনাশক, পানি ইত্যাদি) এবং সংগ্রহোত্তর (সংগ্রহ, ঝাড়াই, বাছাই, ধৌতকরন, পরিবহন, প্যাকেজিং, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সরবরাহ ইত্যাদি) পর্যায়ে নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমেউন্নত গুণগুনসম্পন্ন এবং নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন করা সম্ভব হবে যা দেশের আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে রপ্তানি বাড়াতে সাহায্য করবে। যদিও বাংলাদেশ পূর্ব থেকেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ফল ও শাকসবজি রপ্তানি করে আসছে কিন্তু সাম্প্রতিককালে আমদানিকারক দেশের চাহিদা মোতাবেক স্ট্যান্ডার্ড রক্ষা না করায় বেশ কিছু রপ্তানীকৃত পণ্য আমদানিকারক দেশকর্তৃক অযোগ্য ঘোষণা করা হয়েছে। সুতরাং মাঠ থেকে ভোক্তার পাত পর্যন্ত খাদ্যের গুণগতমান ও নিরাপদতা রক্ষা করতে হলে খাদ্য শৃঙ্খলের সকল পর্যায়ে উন্নত কৃষিজ অনুশীলন (Good Agricultural Practice)-এর কোনো বিকল্প নেই। এছাড়া খাদ্য নিরাপদতা অর্জনের জন্য জনসচেতনতা, গবেষণা, প্রশিক্ষণ এবং নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩ এর যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করা বাঞ্ছনীয়।

বাংলাদেশে উদ্যানতাত্ত্বিক ফসলের উৎপাদনেরবর্তমান অবস্থা

উষ্ণ ও অউষ্ণমণ্ডলীয় আবহাওয়ার কারণে বাংলাদেশে রকমারি ফলমূল, শাকসবজি এবং মসলাজাতীয় ফসল উৎপাদিত হয়। উদ্যানতাত্ত্বিক ফসলসমূহ মোট আবাদী জমির প্রায় ৭.৫ % (ফল ১%, সবজি২%, আলু ৩%, মসলা ১% এবং ফুল ও মিষ্টি আলু ০.৫%) দখল করে আছে। বর্তমানে ১৪৯ হাজার হেক্টর জমি থেকে পায় ৪৮০৪ হাজার মে. টন ফল উৎপাদিত হচ্ছে।

সাম্প্রতিককালে সবজি উৎপাদনে বাংলাদেশে বিপ্লব সাধিত হয়েছে। জাতিসংঘের বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থার তথ্য অনুযায়ী সবজি উৎপাদন বৃদ্ধি হারের দিক দিয়ে বাংলাদেশ বিশ্বে তৃতীয়। বর্তমানে প্রায় ২১৪ এবং ৪৩২ হাজার হেক্টর জমি থেকে যথাক্রমে ২২৩৯ এবং ৩৮১৮ হাজার মে. টন গ্রীষ্মকালীন ও শীতকালীন সবজি উৎপাদিত হচ্ছে।

আলু বাংলাদেশে প্রধান কন্দজাতীয় ফসল এবং বিশ্বে বাংলাদেশ ৭ম বৃহৎ আলু উৎপাদনকারী দেশ। বর্তমানে বাংলাদেশে ৪৭৬ হাজার হেক্টর জমি থেকে পায় ৯৪৭৪ হাজার মে.টন আলু উৎপাদিত হচ্ছে। বর্তমানে আলু সংরক্ষণের জন্য দেশে পায় ৪০০-এর অধিক কোল্ডস্টোরেজ রয়েছে।

বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে মসলাজাতীয় ফসল উৎপাদিত হচ্ছে। বিগত ২০১৫-১৬ সনে ৩৯৬ হাজার হেক্টর জমিতে ২৪৮৮ হাজার মে. টন মসলাজাতীয় ফসল উৎপাদিত হয়েছে।

উদ্যানতাত্ত্বিক ফসল রপ্তানির বর্তমান অবস্থা

বাংলাদেশে প্রায় ১০০ ধরনের সবজি, ৭০ ধরনের ফল এবং ৬০ ধরনের মসলাজাতীয় ফসল উৎপাদিত হয় এবং এদেশ থেকে পায় ১০০ ধরনের ফল ও সবজি বিশ্বের প্রায় ৪০টির ও অধিক দেশে রপ্তানি হচ্ছে (হরটেক্স ফাউন্ডেশন, ২০১৩)। বাংলাদেশ থেকে রপ্তানিকৃত পণ্য মূলতঃ বিভিন্ন দেশের এথনিক (Ethnic) বাজারগুলোতে যায়। বাংলাদেশ থেকে প্রথমবারের মতো আম ২০১৫ সালে

ড. মোহাঃ কামরুল হাছান
অধ্যাপক, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও
কনসালটেন্ট, এফএও

যুক্তরাজ্যের ওয়ালমার্ট-এ রপ্তানি হয়। সারণী ৫ অনুযায়ী ২০০৮-২০০৯ থেকে ২০১২-১৩ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে ফল ও সবজি রপ্তানি ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু ২০১৫-২০১৬ সালে রপ্তানি কমেছে যা প্রধানত স্যানিটারি ও ফাইটোস্যানিট্যারি স্ট্যান্ডার্ড-এর অপর্যাপ্ততা এবং আমদানিকারক দেশের চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হওয়ার কারণে ঘটেছে। সুতরাং টেকসই রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য পণ্যের গুণগতমান ও নিরাপদতার বিষয়টি গুরুত্বসহকারে বিবেচনায় নিতে হবে।

বাংলাদেশে জনস্বাস্থ্য ও পুষ্টির বর্তমান চিত্র

যদিও এদেশের মানুষের স্বাস্থের উন্নয়ন ঘটছে তথাপিও দেশে ৫ বৎসরের কম বয়সী শিশুদের মধ্যে খর্বাকৃতি (Stunting) ৩৬%, ওয়েস্টিং (Wasting) ১৪%, কম ওজন সম্পন্ন শিশু (Low Birth Weight) ৩৩%[৪]। তাছাড়া বাংলাদেশে ১২% মহিলারদীর্ঘস্থায়ী পুষ্টির অভাব (Chronic Energy Deficiency)[৫], ১০% পূর্ণ বয়স্ক মানুষের ডায়াবেটিস[৬] এবং ১৭.৯০% মানুষ স্থূলাকার (Obesity)[৭]। এক্ষেত্রে সুষম খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমে সুন্দর ও স্বাস্থকর জীবন যাপন নিশ্চিতকরণ অনেকাংশেই সম্ভব। উদ্যানতাত্ত্বিক ফসল বিবেচনা করলে একজন পাপ্তবয়স্ক মানুষের প্রতিদিন ৪০০ গ্রাম ফল ও সবজি, ১০০ গ্রাম আলু এবং ২০ গ্রাম মসলাজাতীয় খাদ্য গ্রহণ করা প্রয়োজন। যদিও উদ্যানতাত্ত্বিক ফসলের গ্রহনমাত্রা বেড়েছে তথাপিও কাঙ্ক্ষিত মাত্রার চেয়ে অনেক কম। এক্ষেত্রে উৎপাদন বাড়ানো এবং সংগ্রহত্তোর অপচয় কমানোর উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

উদ্যানতাত্ত্বিক ফসলের সংগ্রহোত্তর ক্ষতি ও অপচয়

পৃথিবীতে মানুষের ভক্ষণের জন্য উৎপাদিত খাদ্যের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ (১.৩ বিলিয়ন টন) সংগ্রহোত্তর পর্যায়ে নষ্ট ও অপচয় হয়। ফল, সবজি, মূল ও কন্দজাতীয় ফসলে সংগ্রহোত্তর ক্ষতি সবচেয়ে বেশি (৪৫%)[১০,১১]। বাংলাদেশে নির্বাচিত ১৩টি ফল ও সবজির সংগ্রহত্তোর ক্ষতি নির্ণয় করা হয়েছে এবং ফসলভেদে এ ক্ষতি ২৪-৪৪% যা প্রায় ৩৪৪২ কোটি টাকার সমান[১২,১৩]। বাংলাদেশে উচ্চমাত্রায় সংগহোত্তর ক্ষতির মূল কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে উন্নত সংগহোত্তর পদ্ধতির অভাব; আলু ব্যতীত অন্যান্য ফসলের অপর্যাপ্ত সংরক্ষণ ব্যবস্থা; উন্নত পরিবহন ব্যবস্থার অভাব; সংরক্ষণকাল বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত কলাকৌশলের অভাব; অপর্যাপ্ত প্রক্রিয়াকরণের ব্যবস্থা; পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ ও জনসচেতনতামূলক কার্যক্রমের অভাব এবং পাবলিক-প্রাইভেট অংশীদারিত্বের অভাব। উপরোক্ত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও উচ্চমানের ফল ও সবজি প্যাকেজিং এবং দূরপাল্লার পরিবহন ক্ষেত্রে প্লাস্টিক ক্রেটের ব্যবহার শুরু হয়েছে এবং এতে সংগ্রহোত্তর ক্ষতি কমার সাথে সাথে পণ্যের গুণগতমানও বজায় থাকছে।

উদ্যানতাত্ত্বিক ফসলের সরবরাহ শৃঙ্খলে খাদ্য নিরাপদতা ঝুঁকিসমূহ

বাংলাদেশে উদ্যানতাত্ত্বিক ফসলের সরবরাহশৃঙ্খল (Supply Chain) যথেষ্ট বিস্তৃত এবং অনেকগুলো মধ্যসত্বভোগীর (Middlemen) হাত ঘুরে ভোক্তার নিকট পৌঁছে[১৪]। নিরাপদতা ঝুঁকিজনিত ভীতি ও আতঙ্ক ভোক্তার পণ্য ক্রয়ের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। অনেকে ফল ক্রয় করছে না আবার অনেকে ক্রয়ের সময় যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করছে। আমরা জানি, খাদ্য-শৃঙ্খলের যেকোনো পর্যায়ে দূষণ হতে পারে। উদ্যানতাত্ত্বিক ফসলে সরবরাহ শৃঙ্খলে প্রধান প্রধান ঝুঁকিসমূহগুলো নিম্নরূপ।

(ক) রাসায়নিক ঝুঁকি

প্রধান প্রধান রাসায়নিক ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে ভারী ধাতু, বিষাক্ত পদার্থ ও বিভিন্ন এগ্রো-কেমিক্যালের অবশিষ্টাংশ।

ভারী ধাতুর অবশিষ্টাংশ

খাদ্যে ভারী ধাতু যেমন আর্সেনিক, লেড, মার্কারী, ক্রোমিয়াম, ক্যাডমিয়াম ইত্যাদির মাত্রাতিরিক্ত উপস্থিতি মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকির কারণ হতে পারে। বাংলাদেশের মানুষ কি মাত্রায় ভারী ধাতুজনিত কারণে স্বাস্থ্যঝুঁকির মধ্যে আছে তার পর্যাপ্ত তথ্য নেই। একটি গবেষণায় দেখা গেছে, পালংশাক, লালশাক এবং ডাঁটাশাকে ক্যাডমিয়াম (যথাক্রমে ০.৫৮, ০.৩৪ এবং ০.৪৮ মাইক্রোগ্রাম/গ্রাম) এবং ক্রোমিয়াম (যথাক্রমে ৬.২০, ৫.৭০ এবং ৪.৮১ মাইক্রোগ্রাম/গ্রাম) এর মাত্রা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) কর্তৃক নির্ধারিত সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রার চেয়ে বেশি[১৫]। ফল বা সবজিতে ভারী ধাতু দূষণের উৎসসমূহের মধ্যে রয়েছে দূষিত পানি ও মাটি, অপর্যাপ্ত কম্পোস্টকৃত জৈবসার (যেমন পোল্ট্রি ম্যানিউর), শিল্পবর্জ্যের কারণে দূষিত পানি ইত্যাদি।

বালাইনাশকের অবশিষ্টাংশ

আধুনিক কৃষিতে বালাইনাশকের (কীটনাশক, ছত্রাকনাশক, মাকড়নাশক, আগাছানাশক ইত্যাদি) ব্যবহার বহু পূর্ব থেকেই হয়ে আসছে। বর্তমানে ৩৫৯ এবং ৫৩৫৯টি বালাইনাশক যথাক্রমে সাধারণ নাম এবং বাণিজ্যিক নামে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধিত হয়েছে। খাদ্যে কীটনাশকের মাত্রাতিরিক্ত উপস্থিতি একটি অন্যতম মানবসৃষ্ট স্বাস্থ্যঝুঁকি। খাদ্যে কীটনাশকের মাত্রাতিরিক্ত অবশিষ্টাংশের মূল কারণসমূহ হলো অনিবন্ধিত বালাইনাশকের ব্যবহার; ঘনঘন বালাইনাশকের প্রয়োগ; পূর্ব-সংগ্রহ বিরতি (Preharvest Interval) মেনে না চলা; একাধিক বালাইনাশকের মিশ্রণে ককটেল আকারে প্রয়োগ; ব্যবহারকারীদের অজ্ঞতা; মোটিভেশনের অভাব; গণমাধ্যমেরযথাযথ প্রচারণার অভাব ইত্যাদি। একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে ৪২টি সবজি নমুনার মধ্যে ১৪টিতে সহনীয় মাত্রার চেয়ে বেশি পরিমাণে বালাইনাশকের অবশিষ্টাংশ রয়েছে। নির্ণয়কৃত বালাইনাশকগুলো হলোডায়াজিনন, ম্যালাথিয়ন, কুইনালফস, ফেনিট্রিথিয়ন, সাইপারমেথ্রিন, ফেভালেরেট ও প্রোপিকোনাজোল ১৬। সম্প্রতি দিনাজপুরে লিচু খেয়ে অনেক শিশু মৃত্যুর খবর আমরা জেনেছি এবং এ ঘটনা মূলত কীটনাশকের বিষক্রিয়ার কারণে হয়েছে যা বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে (দৈনিক ডেইলি স্টার, ২৭ জুন, ২০১৫)।

বালাইনাশকের এ রাসায়নিক ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য অনেক কিছু করণীয় রয়েছে, যেমন-অ্যাক্রিডিটেড টেস্টিং ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠা, জাতীয় রেসিডিউ কন্ট্রোল প্লান তৈরি করা, বালাইনাশকের যথেচ্ছ ব্যবহার রোধে নিয়ন্ত্রণ আরোপ ইত্যাদি। এক্ষেত্রে সম্প্রতি বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত "রাসায়নিক দূষক, টক্সিন এবং ক্ষতিকর অবশিষ্টাংশ প্রবিধানমালা ২০১৭" যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে হবে। তবে খুশির খবর এইযে, বিগত বছরগুলোতে কীটনাশক ব্যবহার ধারাবাহিকভাবে কমে প্রবনতা লক্ষ করা যাচ্ছে।

উদ্ভিদ বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রকের অবশিষ্টাংশ

বাংলাদেশে উদ্যান ফসল উৎপাদনে বিশেষ করে আগাম ফসল, ফসলের উচ্চ ফলন, আকার এবং ওজন বৃদ্ধি করা ইত্যাদির জন্য বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক যেমন অক্সিন, জিবারেলিন ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। গবেষণায় দেখা গেছে, আমে বায়োজিম, ফার্টি এবং ইন্ড (বাণিজ্যিক নাম) এবং লিচুতে ওকোজিম, পানোফিক্স, পেনকোজেব, লিটোসেন, ভস্ক্যাল সুপার, ভিটাপাস, কেনফেন এবং ফলিমোর (বানিজ্যিক নাম) ব্যবহার করা হয় ১৩। দুর্ভাগ্যজনক হলো উক্ত রাসায়নিক দ্রব্যের অবশিষ্টাংশ এবং জনস্বাস্থ্যের ওপর এর প্রভাব সম্পর্কিত গবেষণা বাংলাদেশে নেই বললেই চলে।

ফল পাকাতে রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার

সাধারণত ক্লাইম্যাকটারিক ফলসমূহ (যেমন-আম, কলা, পেঁপে ইত্যাদি) পাকানোর জন্য উন্নত দেশে ইথিলিন গ্যাস সুপারিশকৃত মাত্রায় ব্যবহার করা হয়। কিন্তু বাংলাদেশে ফল পাকানোর জন্য ইথিফোন (সক্রিয় উপাদান) সমৃদ্ধ বিভিন্ন বাণিজ্যিক নামের ফরমুলেশন, যেমন হারভেস্ট, রাইপেন, প্রফিট, টমটম ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। উক্ত ফরমুলেশনসমূহ ফল পাকানোর জন্য এদেশে সম্ভবত নিবন্ধিত নয়। সুতরাং স্বাস্থ্যসম্মতভাবে ফল পাকানোর জন্য ইথিলিন গ্যাস ব্যবহারের পদ্ধতি এদেশে এনে পরীক্ষাকরত ব্যবহারকারীদের নিকট সহজলভ্য করা সময়ের দাবি।

(খ) অণুজৈবিক দূষণজনিত নিরাপদতা ঝুঁকি

বিভিন্ন ধরনের অণুজীব দ্বারা তাজা, প্রেশকাট এবং প্রক্রিয়াজাতকৃত ফল ও সবজি দূষণ হতে পারে এবং মানবদেহের জন্য বিভিন্ন ধরনের রোগ যেমন- টাইফয়েড (Salmonella), আমাশয় (Shiegella), খাদ্যে বিষক্রিয়া (Staphylococci), বটুলিজম (Clostridium botulinum) এবং লিস্টেরিওসিস (Listeria monocytogenes) হতে পারে। অণুজৈবিক দূষণের মূল কারণ সমূহের মধ্যে রয়েছে দূষণযুক্ত উপকরণ (যেমন মাটি, পানি, সার ইত্যাদি) ব্যবহার; যথাযথ উৎপাদন এবং উৎপাদন পরবর্তী ব্যবস্থাপনার অভাব; অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্য প্রস্তুত; নিম্নমানের খাদ্য উপকরণ ব্যবহারএবং খাদ্য প্রস্তুত ও বিতরণে নিয়োজিত খাদ্য কর্মীর ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধান (Personal Hygiene)-এর অভাব। সম্প্রতি কুষ্টিয়া এবং মানিকগঞ্জে তরমুজ খেয়ে বেশ কয়েকজন মানুষ মৃত্যুবরণ করেছেন, যার প্রাথমিক কারণ হিসাবে রং-এর ব্যবহার অনুমান করা হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে গবেষণার মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে উক্ত দূর্ঘটনার কারণ ছিল অণুজীব ঘটিত দূষণ (দৈনিক সান, ২১ এপ্রিল ২০১৪; দৈনিক ইনডিপেন্ডেন্ট, ৬ মে, ২০১৪)।

(গ) খাদ্য শৃঙ্খলে অন্যান্য নিরাপদতা ঝুঁকি

পচনশীল খাদ্য যেমন ফল ও শাকসবজি দীর্ঘকাল সংরক্ষণের জন্য সংরক্ষণকারী রাসায়নিক দ্রব্য, বিশেষ করে ফরমালিন (৪০% ফরমালডিহাইডের দ্রবণ) ব্যবহারের কথা পত্রপত্রিকায় এসেছে। এখানে উল্লেখ্য যে ফলমূলসহ বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যে বিভিন্ন মাত্রায় প্রাকৃতিকভাবে ফরমালডিহাইড বিদ্যমান রয়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে যে, বাংলাদেশে একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ প্রতিদিন বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য থেকে যে পরিমাণ ফরমালডিহাইড গ্রহণ করে তা সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রার চেয়ে অনেক কম[১৬,১৭]।

সবজিকে উজ্জ্বল সবুজ বর্ণ করার জন্য অনুমোদিত রঞ্জক যেমন মেলাকাইট গ্রীন ব্যবহারের ঝুঁকি রয়েছে, যা মানবদেহে এলার্জি, অ্যাজমা, ক্যান্সার ইত্যাদি রোগ সৃষ্টি করতে পারে। এছাড়াও অন্যান্য নিরাপদতা ঝুঁকিসমূহ হলো টক্সিন (আফলাটক্সিন, পাটুলিন ইত্যাদি) পলি অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন, ক্লোরোপ্রোপানলস, ভিনাইল ক্লোরাইড মনোমার ইত্যাদির খাদ্যে উপস্থিতি। সবশেষে মারাত্মক অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্য প্রস্তুতকরণ এবং মেয়াদোত্তীর্ণ খাদ্য সংরক্ষণ ও বিক্রয়ও উল্লেখযোগ্য নিরাপদতা ঝুঁকি।

খাদ্য নিরাপদতা সংশিষ্ট আইন

বর্তমানে নিরাপদ খাদ্য সরবরাহের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রায় ১৭টি আইন রয়েছে। সর্বশেষ আইনটি হলো নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩ যার অধীনে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ গঠিত হয়েছে। এই আইনের আওতায় ইতিমধ্যে বেশ কিছু প্রবিধানমালা (যেমন-নমুনা সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ; রাসায়নিক দূষক, টক্সিন এবং ক্ষতিকর অবশিষ্টাংশ; প্যাকেজিং ও লেবেলিং; খাদ্য সংযোজন দ্রব্য ইত্যাদি) জারি হয়েছে। এই আইনে বিভিন্ন অপরাধের জন্য সর্বোচ্চ ৫ বছরের কারাদণ্ড এবং ২০ লক্ষ টাকার জরিমানার বিধান রয়েছে। এই আইন বাস্তবায়নের জন্য দরকার খাদ্য নিয়ন্ত্রণ সংস্থাসমূহের মধ্যে কার্যকর সমন্বয়; দক্ষ নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা/ইন্সপেক্টর নিয়োগ; খাদ্য নমুনা বিশ্লেষণের জন্য প্রয়োজনীয় অ্যাক্রিডিটেড ল্যাবরেটরি স্থাপন, জনসচেতনতা বৃদ্ধি, চাহিদামাফিক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা ইত্যাদি।

উদ্যানতাত্ত্বিক ফসলের গুণগতমান ও নিরাপদতা নিশ্চিতকরণে চ্যালেঞ্জসমূহ

- পর্যাপ্ত সংগ্রহোত্তর অবকাঠামো (যেমন প্যাকিং হাউজ নির্মাণ, নিম্ন তাপমাত্রায় সংরক্ষণের ব্যবস্থা, রেফ্রিজারেটেড পরিবহনের ব্যবস্থা ইত্যাদি) নির্মাণ।
- খাদ্যশৃঙ্খলের বিভিন্ন পর্যায়ে উন্নত কৃষিজ অনুশীলন (Good Agricultural Practice) গ্রহণ।
- খাদ্যশৃঙ্খলে দূষক এবং দূষকের অবশিষ্টাংশ মনিটরিং।
- খাদ্য উৎপাদন ও সরবরাহের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক ফুড সেফটি স্ট্যান্ডার্ডসমূহের সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রয়োগের মাধ্যমে টেকসই রপ্তানি বৃদ্ধি।
- উৎপাদন এবং উৎপাদন পরবর্তী পর্যায়ে কার্যকর খাদ্য নিরাপদতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা।
- সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে সেফ ফুড অফিসার/সেফ ফুড ইন্সপেক্টর ইত্যাদির চাহিদা পূরণের জন্য দক্ষ গ্রাজুয়েট তৈরির লক্ষ্যে আধুনিক কোর্স কারিকুলা চালু করা।
- খাদ্য নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থাসমূহের মধ্যে কার্যকরী এবং টেকসই সমন্বয় স্থাপন।

উপসংহার

খাদ্য নিরাপদতা নিশ্চিতকরণ একটি বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ, যা শুধুমাত্র আইন প্রয়োগকারী বা নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা কর্তৃক অর্জন সম্ভব নয়। এজন্য দরকার খাদ্যশৃঙ্খলে বিভিন্ন অংশীজন, যেমন উৎপাদনকারী, ব্যবসায়ী, প্রক্রিয়াজাতকারক, নীতিনির্ধারক, ভোক্তসংগঠন, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, গবেষক, চিকিৎসক, সুধী সমাজের প্রতিনিধি এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাঝে সমন্বয়। উদ্যানতাত্ত্বিক ফসলের সরবরাহ শৃঙ্খলে উৎপাদন এবং উৎপাদন পরবর্তী পর্যায়ে দূষণ প্রতিরোধে উন্নত চর্চার মাধ্যমে খাদ্য নিরাপদতা অর্জন সম্ভব। উদ্যানতাত্ত্বিকফসলসহ অন্যান্য খাদ্যের নিরাপদতা অর্জন করতে হলে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ যেমন আধুনিক গবেষণা (রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট, সংগ্রহত্তোর অপচয়রোধ ইত্যাদি), উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড (খাদ্য নিয়ন্ত্রক সংস্থা সমূহের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, সংগ্রহোত্তর অবকাঠামো নির্মাণ, অ্যাক্রিডিয়েটেড ফুড টেস্টিং ল্যাবরেটরি স্থাপন, GAP, GHP, HACCP, FSMS বিষয়ক প্রশিক্ষণ ইত্যাদি) এবং য যোপযোগী নীতিমালা (দক্ষ জনশক্তি তৈরি, ফুড সেফটি বিষয়ক কোর্স কারিকুলাম চালু, সংগ্রহোত্তর অপচয় রোধকল্পে স্ট্রাটেজি প্রণয়ন, রিস্ক বেজড ফুড ইনস্পেকশন চালু, আন্তর্জাতিক মান, যেমন ISO, IPPC, Codex ইত্যাদির আলোকে বিদ্যমান আইনের আধুনিকায়ন) গ্রহণ করতে হবে।

তথ্যপঞ্জী

1. Morol, S. 2014. Maximum death in the country is due to stroke. The Daily ProthamAlo (In Bengali), 19 December 2014.
2. Rasul, C.H. 2014. Alarming situation of food adulteration (Editorial). Bangladesh Medical J. Khulna, 46: 1-2.
3. BBS. 2017. Yearbook of Agricultural Statistics-2016. Bangladesh Bureau of Statistics, Statistics and Informatics Division, Ministry of Planning, Government of the People's Republic of Bangladesh, p. 571.
4. BDHS (Bangladesh Demographic and Health Survey). 2014. National Institute of Population Research and Training, Ministry of Health and Family Welfare, Dhaka, Bangladesh. p. 328
5. NMS.2011-12. Final Report-National Micronutrient Status Survey 2011-12 (conducted in support of ICDDRB, UNICEF, GAIN and IPH), p. 140.
6. NCD-RFS (Non-Communicable Disease Risk Factor Survey). 2010. World Health Organization. p. 135.
7. Akter, S., M.M. Rahman, S.K. Abe and P. Sultana. 2014. Prevalence of diabetes and prediabetes and their risk factors among Bangladeshi adults: a nationwide survey. Bulletin of the World Health Organization
8. Nahar, Q., S. Choudhury, M.O. Farooque, S.S.S. Sultana and M.A. Siddiquee. 2014. Dietary Guidelines for Bangladesh. Bangladesh Institute of Research and Rehabilitation in Diabetes, Endocrine and Metabolic Disorders (BIRDEM) (In Support of NFPCSP). Dhaka. p. 44.
9. HIES. 2016.Preliminary Report onHousehold Income and Expenditure Survey. BangladeshBureau of Statistics. Statistics Division, Ministry of Planning, Government of People's Republic of Bangladesh. p. 132.
10. FAO. 2015. Global Initiative on Food Loss and Waste Reduction. FAO-UN, Rome, Italy (Available online: www.fao.org/save-food).
11. FAO. 2017. SAVE FOOD: Global Initiative on Food Loss and Waste Reduction (Available Online: (http://www.fao.org/save-food/resources/keyfindings/en/).
12. Hassan, M.K 2010. A Guide to Postharvest Handling of Fruits and Vegetables. Department of Horticulture, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh, with financial support from the USAID and EU and technical support from FAO. p. 117.
13. Hassan, M.K., B.L.D. Chowdhury and N. Akhther. 2010. Final Report- Postharvest Loss Assessment: A Study to Formulate Policy for Loss Reduction of Fruits and Vegetables and Socio-Economic Uplift of the Stakeholders, Department of Horticulture, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh (Funded by USAID and EU & Jointly implemented by FAO and FPMU of MoFDM). p. 189.
14. Hassan, M.K., S.K. Raha and N. Akhther. 2012. Final Report- Improving the Performance of Marketing Systems of Fruits and Vegetables in Bangladesh, Department of Horticulture, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh (funded by EU & USAID and implemented by FAO and Ministry of Food). p. 179.
15. Naser, H.M., S. Sultana, N.U. Mahmud, R. Gomes and S. Noor. 2011. Heavy metal levels in vegetables with growth stage and plant species variations. Bangladesh J. Agril. Res., 36(4): 563-574.
16. Islam, M.M. 2014. Use of Chemicals in Food- How Safe? Research Results and Mitigation (In Bengali). Co-ordinated Sub-Project on Contaminants and Adulterants in Food Chain and their Mitigation. Bangladesh Agril. Res. Council (BARC), Dhaka. p. 48.
17. Wahed, P., M.A. Razzaq, S. Dharmapuri and M. Corrales. 2016. Determination of formaldehyde in food and feed by an in-house validated HPLC method. Food Chem., 202: 476-483.

নিরাপদ খাদ্য: কি এবং কেন

মানসুরা মকবুল

খাদ্য হলো জীবনের অপরিহার্য অংশ। বেঁচে থাকার জন্য প্রতিদিন খাদ্য গ্রহণ করতে হয়। আর খাদ্য যিনি গ্রহণ করেন তিনি হলেন ভোক্তা। বেঁচে থাকার রসদ এই খাদ্য, যা আমাদের শরীরের পুষ্টি সাধন, ক্ষয় পূরণ ও বৃদ্ধি সাধন করে থাকে সেই খাদ্য অবশ্যই নিরাপদ হওয়া জরুরি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, নিরাপদ খাবার বা খাদ্য নিরাপত্তা বলতে কী বোঝায়?

খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়টি মাঠে খাদ্য উৎপাদন থেকে শুরু করে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে খাবার টেবিলে খাদ্যগ্রহণ পর্যন্ত প্রযোজ্য। একে বলা হয় 'ফার্ম টু ফর্ক এপ্রোচ'। এই নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন এবং গ্রহণ নিশ্চিতকরণ প্রক্রিয়া নির্ভর করে উৎপাদনের প্রতিটি ধাপের ওপর। যেমন– খামারে উৎপাদন, উৎপন্ন পণ্যটি সংগ্রহ, সংরক্ষণ, পরিবহন এবং ভোক্তা পর্যন্ত পৌঁছানোর পর সেটির সঠিক পদ্ধতিতে প্রক্রিয়াজাতকরণ। এই সব'কটি প্রক্রিয়া যখন জীবাণুমুক্ত উপায়ে সম্পন্ন করা সম্ভব হয় এবং খাবারটি ভোক্তা নিরাপদে গ্রহণ করে তা থেকে পুষ্টি গ্রহণ করতে পারবে তখনই কেবল খাবারটিকে নিরাপদ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া যায়।

একইভাবে অনিরাপদ খাবার বলতে বোঝায়, যখনই এই 'ফার্ম টু ফর্ক এপ্রোচ'-এর যেকোনো পর্যায়ে খাবারটি জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং ভোক্তা তা গ্রহণ করে অসুস্থ হয়ে যান। অনিরাপদ খাদ্য গ্রহণের ফলে মানুষের শরীরে নানারকম বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। স্বল্পমেয়াদি প্রতিক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে পেটের পীড়া, ডায়রিয়া, বমি, জ্বর, আমাশয়, টাইফয়েড এবং আরও বিভিন্ন জীবাণুবাহী অসুস্থতা। এর ফলে ভোক্তা রোগে ভুগে কষ্ট পান এবং দৈনন্দিন কাজকর্ম ব্যাহত হয়। দীর্ঘমেয়াদে অনিরাপদ খাবার আরও বড় সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। অনেক সময় শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কার্যক্ষমতা কমে গিয়ে শরীর সঠিক পুষ্টি গ্রহণে অক্ষম হয়ে পড়ে। এর ফলে শরীরের বিভিন্ন অসঙ্গতি দেখা দেয় এবং যেটি পরবর্তীতে শরীরের স্থায়ী ক্ষতি করে থাকে। এতে একদিকে যেমন শিশুরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাদের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়, পেটের পীড়া ও অন্যান্য সমস্যায় ভোগে, অপরদিকে প্রান্তবয়স্করা পাকস্থলি, যকৃত ও ত্বকের নানা ধরনের রোগের শিকার হয়। এসব রোগব্যাধি কখনও কখনও ভয়াবহ পর্যায়ে পৌঁছে এবং ভোক্তার মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

আমাদের গ্রহণকৃত খাবারগুলো বিভিন্নভাবে অনিরাপদ হয়ে উঠতে পারে, যেমন ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাসের আক্রমণে, অথবা কোনো রাসায়নিক পদার্থের অনিয়ন্ত্রিত উপস্থিতিতে বা কোনো বাহ্যিক পদার্থের উপস্থিতিতে, যেটি ওই খাবারের অংশ নয়। খাদ্য উৎপাদন থেকে গ্রহণ পর্যন্ত যেকোনো পর্যায়েই এই সংক্রমণগুলো হতে পারে। সুতরাং উৎপাদনের প্রতিটি ধাপে রাসায়নিকের সঠিক ও নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার, সঠিক কীটনাশক নির্বাচন, বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে সঠিকভাবে মোড়কজাতকরণ, সঠিক তথ্য প্রদান, মেয়াদ নিশ্চিতকরণ ও ভোক্তার কাছে নিরাপদে পৌঁছে দেয়াটা জরুরি। আমাদের দেশে খাবারের ভেজালমুক্ত নিশ্চিত করাটাও একটি বড় চ্যালেঞ্জ। সাম্প্রতিক সময়ে বাচ্চাদের দুধে মেলামিনের উপস্থিতি জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টি করে কারণ, এটি জীবনের জন্য হুমকিস্বরূপ। উৎপাদিত পণ্যে মাত্রাতিরিক্ত কীটনাশকের ব্যবহার, মাছে মাত্রাতিরিক্ত রাসায়নিকের ব্যবহার এসবও মানুষের শরীরে দীর্ঘমেয়াদি অঙ্গহানির জন্য দায়ী।

নিরাপদ পরিবেশে খাদ্য উৎপাদন, আমদানিকরণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, পরিবহন, বাজারজাতকরণ ও খাবার জন্য প্রস্তুতকরণ– এই পুরো বিষয়টিই আমাদের দেশে আজ কিছুটা হুমকির মুখে। উৎপাদনের প্রতিটি ধাপে যারা জড়িত আছেন, তাদের সঠিক জ্ঞানের স্বল্পতা, অসতর্কতা, গুরুত্বহীনতা ও জনগণের অসচেতনতাই মূলত এই বিষয়টির সঙ্গে জড়িত। তবে আশার কথা হলো বাংলাদেশ ইতিমধ্যেই বিষয়টিকে গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছে। এ ব্যাপারে সামনের দিকে অগ্রসর হওয়ার লক্ষ্যে ২০১৫ সালে 'বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ' (বিএফএসএ) গঠিত হয়েছে। তৈরি করা হয়েছে নিরাপদ খাদ্য আইন-২০১৩। এই আইনের পূর্বেও আমাদের দেশে কিছু বিধিমালা প্রচলিত ছিল। তবে এই আইনের বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো নিরাপদ খাদ্যের পূর্ণ বিবরণ।

যেমন– বলা হয়েছে, ভেজাল খাদ্যের অর্থ– ক. কোনো খাদ্য বা খাদ্যদ্রব্যের অংশ, যাতে মানবস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর বা জীবনহানিকর কোনো রাসায়নিক বা ভারী ধাতু বা কীটনাশক ব্যবহার করা হয়; খ. মানবস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর এমন কোনো খাদ্যদ্রব্য অথবা কোনো আইন বা বিধির অধীনে নিষিদ্ধ করা হয়েছে এমন কোনো উপাদান মিশ্রিত খাদ্যদ্রব্য; গ. খাদ্যদ্রব্যের সঙ্গে কোনো আইন বা বিধির অধীনে নিষিদ্ধ ভিন্ন কোনো উপাদান মেশানো, রঞ্জিত করা, আবরণ দেয়া বা আকার পরিবর্তন করা, যার ফলে খাদ্যের গুণাগুণ বা পুষ্টিমান কমে যায়;

মানসুরা মকবুল
চেয়ারম্যান, খাদ্য প্রযুক্তি ও পুষ্টি বিজ্ঞান বিভাগ
সোনিপ্রবি

ঘ. খাদ্যদ্রব্যে বিকিরণসহ কোনো দূষণীয় বা বিষাক্ত উপাদানের উপস্থিতি, যা খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুতকারী, ক্রেতা বা গ্রহণকারীর স্বাস্থ্যহানির কারণ হতে পারে। এই আইনে বিএফএসএ গঠনের পাশাপাশি খাদ্য ব্যবসায়ীদের দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করা হয়েছে। এখানে প্রত্যেক খাদ্য ব্যবসায়ী নিরাপদ খাদ্য আইন-২০১৩-এর অধীনে বিধি ও প্রবিধান পালন করে তার নিয়ন্ত্রণাধীন ব্যবসার মাধ্যমে খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, আমদানি, বিতরণ ও বিপণনের নিশ্চয়তা প্রদান করবেন। খাদ্যে ভেজাল মেশানোর জন্য সংশোধিত পিএফও (পিওর ফুড সংশোধনী আইন), ১৯৫৯-এর সর্বোচ্চ শাস্তি ২ লাখ টাকা জরিমানা এবং ৩ বছর সশ্রম কারাদণ্ড বৃদ্ধি করে ২০ লাখ টাকা জরিমানা এবং ৫ বছর কারাদণ্ড নির্ধারণ করা হয়েছে।

নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণের জন্য খাদ্য উৎপাদক, প্রক্রিয়াজাতকারক এবং ভোক্তাকে একযোগে কাজ করতে হবে। খাদ্য নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেশের প্রতিটি মানুষের অধিকার। এই অধিকার নিশ্চিত হলে মানুষ নিরাপদ খাদ্য গ্রহণের সুযোগ পাবেন এবং একইসঙ্গে তা দেশের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের দ্বার উন্মুক্ত করবে। একটি সুস্থ জনগোষ্ঠীই কেবল পারে কর্মের মাধ্যমে দেশকে এগিয়ে নিতে, দেশের উন্নয়নে অবদান রাখতে ও অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে। নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করা না গেলে দেশের টেকসই উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হবে। তাই সুস্থ-সবল জনগোষ্ঠীর জন্যে নিরাপদ খাদ্যের বিকল্প নেই। আর এ বিষয়টি কেবল আইন করে নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন মাঠপর্যায় থেকে শুরু করে সকল পর্যায়ের মানুষের সচেতনতা, এ বিষয়ক জ্ঞান বিতরণ ও তার প্রয়োগ, সেটির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি ও তার মূল্যায়ন। একটি অগ্রগামী জাতি গঠনে এর ভূমিকা অনস্বীকার্য।

প্রাণিজ আমিষ, নিরাপদ পুষ্টি ও মেধাসমৃদ্ধ বাংলাদেশ

ডা. কুলসুম বেগম চৌধুরী

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা, বাংলাদেশ

আমাদের জীবন ধারনের জন্য খাবারের ভূমিকা অপরিসীম। সঠিক শারীরিক গঠন ও বৃদ্ধি, সুস্থ দেহ, শক্তি জোগান এবং স্বাভাবিক কার্যক্ষমতার জন্য সুষম খাদ্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। সমস্ত প্রয়োজনীয় পুষ্টি যথা, শর্করা, আমিষ, চর্বি, ভিটামিন, মিনারেল যথাযথ অনুপাতে খাবারে উপস্থিতিই হচ্ছে সুষম খাদ্য। এর মধ্যে আমিষ আমাদের দেহের গঠন,বৃদ্ধি ও ক্ষয়পূরণের জন্য অত্যাবশ্যক। আমিষ শুধুমাত্র দেহের গঠন, বৃদ্ধি ও ক্ষয়পূরণেই নয়, আমাদের দেহে শক্তির উৎস হিসেবেও কাজ করে। ১ গ্রাম আমিষ থেকে আমরা ৪ কিলো ক্যালরি শক্তি পেয়ে থাকি। আমাদের দেহের ১৬ শতাংশই আমিষ দ্বারা তৈরি। পেশী, হাড়, চামড়া, চুল, এবং শরীরের অন্যান্য অংশ বা টিস্যু মূলত আমিষ। আমিষ প্রকৃতপক্ষে পেপটাইড বন্ড দ্বারা একত্রিত অ্যামাইনো এসিড দ্বারা তৈরি পলিমার চেইন। শরীরে আমিষের ছোট ছোট পলিপেপটাইড চেইনগুলো হজমকরণের সময় হাইড্রোক্লোরিক এসিড এবং প্রোটিএজ এনজাইমের মাধ্যমে ভেঙ্গে যায় যা শরীরের জৈব সংশ্লেষনে তৈরি হয় না এমন অপরিহার্য অ্যামাইনো এসিড শোষণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নয়টি গুরুত্বপূর্ণ এমাইনো এসিড যেমন তারা phenylalanine, ভ্যালিন, থ্রিয়োনিন, ট্রিপটোফোন, মেথিয়োনিন, লিউসিন, আইসোলিউসিন, লাইসিন এবং হিস্টিডিন শরীরে উৎপন্ন হয় না কিন্তু অপুষ্টিজনিত মৃত্যু প্রতিরোধে অত্যাবশ্যকীয়, সেগুলো খাবারের মাধ্যমে গ্রহণ করতে হয়। প্রয়োজনীয় অ্যামাইনো এসিডের সংখ্যা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। তবে হিস্টিডিন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের শরীরে উৎপন্ন না হওয়ার কারণে অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো এসিডের সংখ্যা অধিকাংশের মতে ৯টি। ৫টি অ্যামাইনো অ্যাসিড যেমন, অ্যালানিন, অ্যাসপারটিক অ্যাসিড, অ্যাসপ্যারাজিন, গ্লুটামিক এসিড এবং সেরিন মানবদেহ শরীরের মধ্যে তৈরি করতে সক্ষম। ছয়টি শর্তসাপেক্ষ অপরিহার্য অ্যামাইনো অ্যাসিড যেমন, আর্জিনিন, সিস্টিন, গ্লাইসিন, গ্লুটামিন, প্রোলিন এবং টাইরোসাইনয়া বিশেষ প্যাথোফিজিওলজিকাল অবস্থায়, যেমন অপরিণত অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হওয়া শিশু বা গুরুতর উপসর্গগত সমস্যায় আক্রান্ত মানবদেহে তৈরি হতে পারে না। অ্যামাইনো এসিডসমূহ মানবদেহের জন্য অত্যাবশ্যকীয় উপাদান যেমন, নিউক্লিক এসিড, কো-এনজাইম, হরমোন, অ্যান্টিবডি, সেল মেরামত এবং অন্যান্য মলিউকুল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আমিষজনিত অপুষ্টির কারণে মানসিক প্রতিবন্ধকতা এবং শিশুরোগ যেমন, উদাসীনতা, ডায়রিয়া, কর্মনিষ্ক্রিয়তা, বৃদ্ধিব্যাহত, খসখসে ত্বক, ফ্যাটি লিভার এবং পেট এবং পা ফোলাসহ বিভিন্ন ধরনের অসুস্থতা হতে পারে।

খাদ্য তালিকায় মূলত প্রাণিজ ও উদ্ভিজ্জ উৎস থেকে আমরা আমিষ পেয়ে থাকি যেমন, মাংস, দুগ্ধজাত খাদ্যপণ্য, মাছ, ডিম, শস্য, বাদাম এবং বাদামজাত পণ্য ইত্যাদি। আমিষ খাদ্য উৎস বিস্তৃত পরিধিতে রয়েছে এবং সহজলভ্য। কিন্তু আমিষ জাতীয় খাবারে নির্দিষ্ট অ্যামাইনো এসিডগুলো উচ্চমাত্রায় থাকে কিন্তু এই খাবারগুলির হজম প্রক্রিয়া এবং অ্যান্টি-নিউট্রিশনাল ফ্যাক্টরের কারণে আমিষের পুষ্টি মূল্য খুব কম হয়। সেজন্য আমিষ উৎস হিসেবে হজমকরণ ও মাধ্যমিক পুষ্টি প্রোফাইল যেমন, ক্যালরি, কোলেস্টেরল, ভিটামিন এবং অপরিহার্য মিনারেলের ঘনত্ব বিবেচনা করা উচিত। মাংস, দুধ ও দুগ্ধজাত খাদ্যপণ্য, ডিম, সয়াবিন, মাছ ইত্যাদি পূর্ণ আমিষের উৎস। বিভিন্ন দানাদার ও অদানাদার শস্যপণ্যও আমিষের অন্যতম উৎস। ১৬ কোটি মানুষের এই দেশে আমিষ উৎস হিসেবে সাধারণত ডাল, মাছ, মাংস, ডিম ও দুধ জনপ্রিয় এবং সহজলভ্য। বর্তমান সময়ে আমিষ উৎস হিসেবে ডিম এবং মুরগির মাংস নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে। বাংলাদেশে পোল্ট্রি খামার বৃদ্ধির সাথে সাথে আমিষ হিসেবে বিশেষ করে ডিম ও মুরগির মাংস গ্রহণ বেড়ে গেছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) এর সর্বশেষ আবাসন ও ব্যয়ের পরিসংখ্যান (HIES) ২০১৬ সালের রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, মুরগির মাংস, হাঁস, গরুর মাংস, মাছ এবং ডিমের মাথাপিছু গ্রহণ ২০১০ সালের তুলনায় অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। HIES ২০১৬-এর তথ্যমতে, প্রোটিন আইটেমগুলোর মধ্যে ডিম এবং মুরগি গ্রহণ গত ছয় বছরে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বেড়েছে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, জনপ্রতি ডিম গ্রহণ ২০১৬ সালে ১৩.৫৮ গ্রামে বৃদ্ধি পেয়েছে যেখানে ২০১০ সালে মাত্র ৭.২০ গ্রাম ছিল। একইভাবে ২০০৭ সালে ১১.২২ গ্রামের তুলনায় মুরগি ও হাঁসের মাংস গ্রহণ ২০১৬ সালে প্রতিদিনে ১৭.৩৩ গ্রাম পর্যন্ত বেড়েছে। দ্যা ডেইলি অবজারভার-এর ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ এ প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, যদিও গত পাঁচ বছরে লাইভস্টক এর উৎপাদনের পরিমাণ বেড়েছে, এখনও ৭৪ কোটি মেট্রিক টন দুধ, ৯ কোটি টন মাংস এবং ৪৮৩ কোটি সংখ্যক ডিমের ঘাটতি রয়েছে। বাংলাদেশে এখনও ১৪৭ কোটি টন চাহিদার বিপরীতে ৭৩ কোটি টন দুধ, ৭১ কোটি টন মাংস চাহিদার বিপরীতে ৬২ কোটি টন এবং ১,৬৭৫ কোটি সংখ্যক ডিমের বার্ষিক চাহিদার বিপরীতে ১১৯২ কোটি টন উৎপাদন করছে।

ডা. কুলসুম বেগম চৌধুরী
ন্যাশনাল কনসালটেন্ট, ফুড সেফটি
আইএফএসসি প্রকল্প

সুতরাং, আমাদেরকে ক্রমবর্ধমান চাহিদার বিপরীতে লাইভস্টক খাদ্যপণ্যের উৎপাদন বাড়াতে হবে। এখন এই উৎপাদন বাড়াতে সবার আগে খাদ্য নিরাপদতা নিশ্চিত করতে হবে কারণ, নিরাপদতা নিশ্চিত করতে না পারলে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করলেও সেই খাবার আমাদের পুষ্টি চাহিদা পূরণে তেমন কোনো ভূমিকা রাখতে পারবে না বরং অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে, কারণ চিকিৎসা ব্যয় ও উৎপাদন খরচ বেড়ে যাবে। বাংলাদেশ জার্নাল অব ভেটেরিনারি মেডিসিন এ "Bangl. J. Vet. Med. (2011). 9 (2): 95 – 120)" প্রকাশিতস্টাডি থেকে দেখা যায় যে, মানবদেহে রোগ সৃষ্টিকারী প্রায় ১৪১৫টি জীবাণু আছে যার মধ্যে ৬১% জুনোটিক এবং প্রায় অর্ধেক সংখ্যক জীবাণুর কারণে সৃষ্ট রোগ প্রাদুর্ভাব আকারে দেখা দেয়, এর মধ্যে ৭৫% রোগই জুনোটিক। বাংলাদেশে রেকর্ডকৃত জুনোটিক রোগগুলো হলো, অ্যানথ্রাক্স, যক্ষ্মা, ব্রুসেলোসিসিস, সালমোনেলোসিস, ক্যাম্পাইলোব্যাক্টেরিওসিস এবং লেপটোস্পাইরোসিস, যার মধ্যে অ্যানথ্রাক্স রোগের ক্লিনিক্যাল প্রাদুর্ভাব, মানুষের ও গবাদিপশু উভয়েই রিপোর্ট করা হয়েছে। ২০০৯ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত অ্যানথ্রাক্সের কারণে শত শত গবাদিপশু মারা গেছে এবং ৬৫০ জনেরও বেশি মানুষের ত্বকে অ্যানথ্রাক্সের সংক্রমণ ঘটে যার মধ্যে দুজন মানুষের মৃত্যু ঘটেছিল। বাংলাদেশে প্রধানতম ভাইরাসজনিত জুনোটিক রোগের মধ্যে রয়েছে এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা, রেবিস, নিপাভাইরাসের সংক্রমণ, জাপানি এনসেফালাইটিস, রোটা ভাইরাল ডিজিজ এবং ডেঙ্গু জ্বর। H5N1 মারাত্মক রোগসৃষ্টিকারী সেরোটাইপ দ্বারা এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগ মানুষ এবং পোল্ট্রির জন্য অত্যন্ত বিপদজনক। তথ্যমতে, H5N1 দ্বারা ছয়জন মানুষ দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলতবে প্রত্যেকেই সুস্থহয়েছে। ২৭ মার্চ ২০০৭ সালেএভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসটি বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো ৬৪টি জেলার মধ্যে ৫১টি জেলায় ছড়িয়ে পড়ে: ৪৬০টিরও বেশি সংখ্যক প্রাদুর্ভাবের ফলে ২০ লাখের বেশি পোল্ট্রি বিনষ্ট করা হয়েছিল, ফলে বাংলাদেশের ৫৫ বিলিয়ন টাকা পরিমান ক্ষতি সাধন হয়। বাংলাদেশে জুনোটিক রোগ হিসেবে জলাতঙ্ক রোগকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে এবং এটি প্রধানত কুকুরের কামড় দ্বারা মানুষ ও খাদ্যউপযোগী প্রাণীতে সংক্রমিত হয়। ২০০৯ সালে রেবিস দ্বারা ১ লক্ষ মানুষ আক্রান্ত হয় এবং তন্মধ্যে ন্যূনতম ২ হাজার সংখ্যক লোক মারা যায়। নিপা ভাইরাস দ্বারা মারাত্মক সংক্রামক রোগ বাংলাদেশে ২০০১ সাল থেকে ফেব্রুয়ারি ২০১১ পর্যন্ত ১৭৩ মানুষে চিহ্নিত করা হয়েছে, যার মধ্যে ১১০ (৬৩.৫৮%) মারা যান। জাপানি এনসেফালাইটিস (JE) হল একটি ভেক্টর জনিত জুনোটিক রোগ যা ১৯৭৭ সালে প্রাদুর্ভাব আকারে দেখা দিয়েছিল এবং ১২.৩৮% এনসেফালাইটিস রোগীদের জে.ই. ভাইরাস দ্বারা সংক্রমণের প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে: এ রোগের ফলে মৃত্যু শারীরিক প্রতিবন্ধকতা এবং মানসিক সমস্যা দেখা গিয়েছিল। রোটাভাইরাল ডিজিজ স্তন্যপায়ী এবং পাখির বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত একটি রোগ এবং রিপোর্ট অনুযায়ী, বাংলাদেশে ২৩.৭৫% মানুষ, ১২-৪৩.৭৮% প্রাণী এবং ১৩.১৫% ব্রয়লার মুরগি রোটাভাইরাস জনিত ডায়রিয়া রোগে আক্রান্ত হয়েছে। রিপোর্ট অনুযায়ী, ডার্মাটোমাইকোসিস রোগ দ্বারা ৯.৩% গবাদিপশু, ১৮.৬% ছাগল এবং ২৫.২% মানুষ (প্রাণী সংস্পর্শের কারণে) আক্রান্ত হয়েছে। উপরোক্ত তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে, সব ধরনের ইমার্জিং, রি-ইমার্জিং এবং উপেক্ষিত জুনোটিক রোগ ব্যাপকভাবে আমাদের দেশে দেখা দেয় এবং এ রোগগুলো মানব স্বাস্থ্যের জন্য একটি বড় হুমকিস্বরূপ।

নিচুমানের ভেটেরিনারি চিকিৎসা সেবার কারণে অ্যান্টিবায়োটিক রেজিসট্যান্স, দরিদ্র জনগোষ্ঠী, যাদের জুনোটিক রোগ ও অ্যান্টিবায়োটিক রেজিসট্যান্স সম্পর্কে ধারণা নেই এবং গবাদি পশুপাখির সংস্পর্শে থাকা মানুষ এবং লাইভস্টক পণ্য উৎপাদনের ধাপগুলোতে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও অব্যবস্থাপনা, বাংলাদেশে নিরাপদ খাদ্য পরিস্থিতিকে আরও নাজুক করে তুলছে। তাই নিরাপদ প্রাণিজাত খাদ্যপণ্য উৎপন্ন করতে প্রথমেই দরকার খামার থেকে গ্রাহক পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে সংশ্লিষ্ট সবার সচেতনতা সৃষ্টি, সাথে সাথে গবাদি প্রাণিচিকিৎসায় অনুমোদিত ওষুধ প্রয়োগও ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন, প্রাণিশিল্পকারখানায় GHP, GMP, HACCP এবং ফুড সেফটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম-এর ব্যবহার করতে অণুপ্রাণিতকরণ ও সংশ্লিষ্ট সকল আইনের সঠিক প্রয়োগ বাস্তবায়ন।

এখনই সময়, আমাদেরকে খাদ্য নিরাপদতা নিশ্চিত করে প্রাণিজাত খাদ্যপণ্য উৎপাদন করে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে প্রাণিজ আমিষ পুষ্টিপূরণ করে মেধাবী জাতির বাংলাদেশ গড়তে হবে।

নিরাপদ খাদ্য দর্শন

হরিদাস ঠাকুর

খাদ্য জীবনের অনিবার্য প্রয়োজন

'খাদ্য ছাড়া চলে না জীবন/খাদ্য জীবন চালায়। খাদ্য জোগায় শক্তি সাহস/না হলে জীবন পালায়।' কবির এ কাব্যানুভূতির সত্যতা সম্পর্কে কারো কোনো দ্বিমত কোনো কালেই ছিল না-এখনও নেই। সেই প্রাচীনকালেও খাদ্যের অন্বেষণে আদিম মানুষকে আমরা জীবনবাজি রেখে শিকারে বেরুতে দেখি। সভ্যতার পথপরিক্রমায় মানুষ যখন পরিশীলিত জীবনের অভিযাত্রায়-তখন কাব্যকলায় মানুষের জীবনবোধ ফুটে উঠেছে। এসময় আমরা কাব্যসুষমায় খাদ্যের অনিবার্য প্রয়োজনীয়তার কথা উপস্থাপিত হতে দেখি-

কাব্যেন দর্শনং হন্তি, কাব্যংগীতেন হন্যতে।
গীতঞ্চ স্ত্রীবিলাসেন,সর্বং হন্তি বুভুক্ষুতা।

কোথাও দর্শনের আলোচনা হতে থাকলে সেখানে যদি কবিতা পাঠ শুরু করে দেয়া হয়, তবে দর্শন আলোচনা বন্ধ হয়ে যাবে। কারণ, কবিতা-দর্শনকে হত্যা করে (কাব্যেন দর্শনং হন্তি); আবার কাব্যচর্চাও বন্ধ হয়ে যায় গানবাজনা শুরু হলে; গানবাজনা কবিতার চেয়ে চিত্তচমৎকারী (কাব্যংগীতেন হন্যতে); নারীসঙ্গ পাওয়া গেলে গানবাজনাও শিকেয় ওঠে, গানবাজনার চেয়ে নারীবিলাসের আকর্ষণ অনেক প্রবল (গীতঞ্চ স্ত্রীবিলাসেন); আর কাব্য দর্শন, সংগীতবাদ্য, নারী বিলাস-সবকিছুর চেয়ে বড় পেটের ক্ষুধা, ক্ষুধার্ত মানুষকে এ সবের কোনটিই আনন্দ দিতে পারে না, পেটের ক্ষুধা সবকিছুকে নিহত করে (সর্বং হন্তি বুভুক্ষুতা)। পেটের এই সর্বগ্রাসী ক্ষুধা নিবারিত হয় খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমে।

প্রাচীন থেকে বর্তমানে ফিরে আসলেও আমরা দেখবো খাদ্যের প্রতি মানুষের অনিবার্য আকুতি। জীবনকে এগিয়ে নেবার জন্য-অস্তিত্বের অমোঘ প্রয়োজনে খাদ্যের জন্য সাধারণ মানুষের হাহাকার। ক্ষুধা কোন আইন মানে না এবং এই আইন না মানার প্রবল বিচ্যুতি শেষ হয় খাবার সংগ্রহ ও গ্রহণের মাধ্যমে। আমরা কিশোর কবি সুকান্তের কবিতায় খাদ্যের অন্বেষায় মানুষের সর্বগ্রাসী প্রয়াসের কথা জানতে পারি-

হে মহাজীবন, আর এ কাব্য নয়
এবার কঠিন কঠোর গদ্য আনো
বিপদ লালিত্য ঝঙ্কার মুছে যাক
গদ্যের কড়া হাতুড়িকে আজ হানো।
প্রয়োজন নেই কবিতার স্নিগ্ধতা
কবিতা তোমায় দিলাম আজকে ছুটি
ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়
পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।

ক্ষুধার্ত মানুষের কাছে 'পূর্ণিমার চাঁদ'কে 'ঝলসানো রুটি' মনে হওয়ার যে দর্শন, তা-ই আমাদের খাদ্য নিরাপত্তা ও নিরাপদতার পেছনের দর্শনের অবধারিত উপস্থিতির কথা বলে দেয়।

নিরাপদ খাদ্য মানুষের মৌলিক অধিকার

'খাদ্য প্রাপ্তি মৌলিক অধিকার বলে গণ্য-নিরাপদ খাদ্য তাই সকলের জন্য'। সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকেই মানুষ খাদ্য অন্বেষণ ও খাদ্য গ্রহণকে জীবনের অপরিহার্য উপাদান হিসেবে অনুভব করে আসছে। পোলিশ অর্থনীতিবিদ 'কোপেকি'র মতে আদিমকাল থেকে সভ্যতার উন্মেষ ও অগ্রগতিতে মানবজাতিকে ছয়টি শক্তি ব্যবহার/উদ্ভাবনের ধাপ পেরিয়ে আসতে হয়েছে। এর প্রথম ধাপটি ছিল প্রিমিটিভ ম্যান/আদিম মানুষেরা যারা ছিল দশ লক্ষ বছর আগের মানুষ এবং তাদের শক্তির উৎস ছিল খাবার। সে সময় থেকে বর্তমান সময় অবধি খাবারের বিকল্প কোন কিছুই আমরা পাইনি জীবন ধারণের জন্য। দিন দিন মানুষের খাবার উৎপাদন, সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও গ্রহণের মাঝে এসেছে নানান কলাকৌশল এবং এর সঙ্গে তাল মিলিয়ে খাবার তার বিশুদ্ধতা হারিয়ে হয়েছে অশুদ্ধ/ভেজাল/দূষণযুক্ত। সময়ের পরিক্রমায় জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় নিরাপদ খাদ্য আন্দোলন হয়ে উঠেছে এক অনিবার্য অনুষঙ্গ।

হরিদাস ঠাকুর
অধ্যক্ষ, সিজেএমএই, নরসিংদী

ভাবতে হবে সাধারণ মানুষের কথা

মানুষের মৌলিক চাহিদাসমূহ হচ্ছে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা। খাদ্যকে আমরা আমাদের মৌলিক চাহিদার সর্বাগ্রে দেখতে পাই। মূলতঃ আমাদের অস্তিত্ব খাদ্যের ওপর নির্ভরশীল একথা নিদ্বিধায় বলা যায়। খাদ্য নিরাপদতা তাই আমাদের জন্য একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক তথা রাষ্ট্রীয় স্থিতিশীলতা ও উন্নয়ন খাদ্য নিরাপদতার সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে এবং জীবনের সামনের দিকে এগিয়ে নিচ্ছে।

আমাদের দেশের জনসংখ্যা বর্তমানে প্রায় ১৬ কোটি। প্রতিদিন এ সংখ্যা বেড়েই চলছে। এই বিপুল মানুষের জন্য খাদ্য জোগান দেয়া সরকারের জন্য একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ। জনসংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ কমে যাচ্ছে। এ কারণে আমাদের খাদ্য নিরাপত্তা ও নিরাপদতা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ছে। বর্তমানে তাই অধিক খাদ্য উৎপাদন করে অধিক জনসংখ্যার মুখে কীভাবে খাদ্য জোগান দেওয়া যায়, তার বৈজ্ঞানিক উপায় খুঁজে বের করতে হবে।

খাদ্য নিরাপদতার দর্শন:

সচেতনতা গুণগত মান নিশ্চিত করে খাদ্যকে নিরাপদ করে

খাদ্য দর্শনের বিষয়ে বলা হয়ে থাকে-Philosophy of food is essential for life. আবার জীবন মানে সুস্থ সুন্দর জীবন। এ জন্য গুণগত মানসম্পন্ন খাদ্য অবশ্যই দরকার। Quality food means quality life. নিরাপদ খাদ্য আন্দোলনের একটি প্রায়োগিক স্লোগান/অঙ্গীকার তাই এভাবে বলা হয়ে থাকে-We should have strong commitments to produce, serve and take safe, nutritious and healthy food to make a vitally healthy world.

জীবনের অবস্থান ও দাবি সর্বাগ্রে। খাদ্যের গুণগতমানের সাথে কোন আপোষ চলে না-চলতে পারে না। Quality is expected, food safety is required. খাদ্য নিরাপদতার মূলতত্ত্বে তাই সকল মানুষকে সম্পৃক্ত করে-সচেতন করে সমন্বিত প্রক্রিয়ায়/কৌশলে চলার কথা বলা হয়। একজনের পক্ষে খাদ্য নিরাপত্তা ও নিরাপদতা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। এ জন্যই নিরাপদ খাদ্য দর্শনের মৌল কথা হয়ে দাঁড়িয়েছে-

Food safety is everyone's responsibly.

(1) Avoid illness and other costs of mistakes.

(2) A trustworthy product and brand.

(3) Safe behaviour makes safe food.

খাদ্য অভ্যাস খাদ্য নিরাপদতাকে সুরক্ষা দেয়

মহাত্মা গান্ধীর একটি বিখ্যাত উক্তি হচ্ছে-'আমরা যা করি এবং যা করতে পারি, তার মধ্যে যে তফাৎ তা দিয়ে জগতের অনেক সমস্যার সমাধান করা যায়।' (The difference between what we do and what we are capable of doing would suffice to solve most of the world's problem.). আমরা খাদ্যকে নিরাপদ রাখার কৌশল প্রয়োগ করতে পারি সামান্য অভ্যাসের পরিবর্তন দ্বারা। কিন্তু আমরা তা করি না। এর ফলে খাদ্যজনিত মারাত্মক বিপর্যয় ঘটে চলেছে অহরহ। ভারতের প্রাক্তণ রাষ্ট্রপতি এপিজে আবদুল কালাম অভ্যাস পরিবর্তনের দার্শনিক তত্ত্ব আমাদের দেখিয়েছেন। তিনি বলেছেন-You cannot change your future, but, you can change your habits, and surely your habits will change your future. খাদ্য নিরাপদতার ক্ষেত্রে উপরোক্ত দুটি দার্শনিক প্রত্যয়কে আমরা কাজে লাগাতে পারি। এ জন্য আমরা ছয়টি মৌল বিষয় মেনে চলতে পারি। এ বিষয়গুলো হলো-

SN	Activities	Result	Remarks
1	Buy food with Thought.	Quality Food	Health is wealth. Healthy life means wealthy life.
2	Cook food with Care.	Healthy Food	
3	Do not cross-contaminate.	Quality Food	
4	Clean hands and surfaces often.	Healthy Life	
5	Use what is left.		

লাভ ছাড়া খাবো না কোন খাদ্যঃ

মানুষ স্বভাবতই লাভ অন্বেষণকারী প্রাণী। সভ্যতার প্রারম্ভ থেকেই মানুষের যে অবিরাম এগিয়ে চলা-জীবন সংগ্রাম, সবকিছুই এই লাভের চক্রের সাথে সম্পৃক্ত। খাদ্য নিরাপদতাও মানুষের এই লাভের চক্রের বাইরে নয়। মানুষ তার জীবনকে বড় ভালবাসে। এই ভালবাসার কারণেই সে সকল কর্ম করে। মানুষ সে খাদ্যই খায় যেটি তাকে শারীরিক ও মানসিক তৃপ্তি দেয়। মোটাদাগে আমরা আমাদের সকল প্রকার লাভকে সাতভাগে ভাগ করতে পারি। এগুলো হলো-শারীরিক লাভ, মানসিক লাভ, আর্থিক লাভ, আত্মিক লাভ, পারিবারিক লাভ, সামাজিক লাভ ও পারলৌকিক লাভ। খাদ্য নিরাপতদা আমাদের এসব লাভের সাথে সম্পৃক্ত। বিষয়টিকে আমরা খাদ্য নিরাপদতার দর্শনের নিরিখে নিম্নোক্ত সারণি আকারে ব্যাখ্যা করতে পারি-

ক্রঃ নং	লাভের প্রকৃতি/ধরন	খাদ্য নিরাপদতার ভূমিকা	দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি
১	শারীরিক লাভ	গুণগত মানসম্পন্ন নিরাপদ খাবার আমাদের শরীরকে সুস্থ-সবল ও সুন্দর করে।	সুস্থ জীবন-সুন্দর জীবন নিরাপদ খাবার আনতে পারে। অনিরাপদ খাবার খেলেই বোকা মানুষ অবশ্যই হারে।
২	মানসিক লাভ	নিরাপদ খাবার আমাদের মানসিকভাবে উৎফুল্ল রাখে এবং আমনরা উজ্জীবিত হই। মানসিক সুস্থতা স্বাভাবিক জীবন আনে।	
৩	আর্থিক লাভ	নিরাপদ খাবার খেলে আমরা সুস্থ থাকি। রোগ বালাই হয় না। রোগের পেছনে ব্যয় কমে। আমিদের কর্মশক্তি বাড়ে। আর্থিক লাভ হয়।	
৪	আত্মিক লাভ	নিরাপদ খাবার আমাদের সাত্ত্বিক রাখে। মন মানসিকতাকে পরিশীলিত করে। আত্মার উৎকর্ষতা সাধন করে।	
৫	পারিবারিক লাভ	নিরাপদ খাবার পারিবারিক পরিমন্ডলকে সুস্থ-স্বাভাবিক রেখে সামগ্রিকভাবে পরিবারকে সুখী করে।	
৬	সামাজিক	ব্যক্তির সমন্বয়ে সমাজ। নিরাপদ খাবার যেমন ব্যক্তিকে সুন্দর করে, তেমনি সুন্দর ব্যক্তিসমষ্টির সমাজও সুন্দর হয়।	
৭	আধ্যাত্মিক/পারলৌকিক লাভ	প্রত্যেক ধর্মেই আমরা সুন্দর চিন্তার মানুষদের জয়জয়কার দেখি। নিরাপদ খাবার মানে স্বাভাবিকতা। অনিরাপদ খাবার মানে অস্বাভাবিকতা। স্বাভাবিকতায় থাকলেই আমাদের পারলৌকিক লাভ ঘটে।	

কোন আপোষ চলবে না

'গাহি সাম্যের গান, মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান' বিদ্রোহী কবির এ অমর বাক্য অথবা 'শোনহ মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই' চন্ডীদাসের এ চিরায়ত মানবিক আহবান আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখায় জীবন কত বড়-মানুষ কত সৃষ্টিশীল এবং এ পৃথিবী কত সুন্দর। অনিরাপদ খাবার আমাদের এ সুন্দর জীবন ও সুন্দর পৃথিবীকে কলুষিত করে-বিষময় করে তোলে। তাই অনিরাপদ খাদ্যের ব্যাপারে কোনভাবেই কোনক্ষেত্রেই কোনরকম আপোষ করা চলবে না। নিরাপাদ খাদ্য সম্পর্কে আপ্তবাক্য হচ্ছে- Safe Food-Saves Life (SFSL). এই নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিককরণের জন্য জনসচেতনতার পাশাপাশি আইনের কঠোর প্রয়োগের কোনই বিকল্প নেই। Abe Lincoln-এর ভাষায় Laws without enforcement are just good advice. বিদ্যমান আইন ও বিধিমালার কঠোর প্রয়োগ খাদ্য নিরাপদতার ক্ষেত্রে একটি অতি প্রয়োজনীয় নির্ণায়ক।

খাদ্য নিরাপদতা জীবনের অবিচ্ছেদ্য প্রত্যয়

নিরাপদ খাদ্য সুস্থ সুন্দর ব্যক্তি-পরিবার ও সমাজের নিয়ামক। এক্ষেত্রে কোন ছাড় দেবার অবকাশ নেই। বর্তমান সরকার জনগণকে সচেতন করে তাদের পাশে নিয়ে খাদ্য নিরাপদতার বিষয়টি নিশ্চিত করতে পারে। জনসচেতনতার প্রয়োজনে আমরা নিরাপদ খাদ্যের আবশ্যিকতাকে স্লোগানের মাধ্যমে তুলে ধরছি:

নিরাপদ খাবারে গড়বো দেশ-গড়বো সোনার বাংলাদেশ।	নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত হলে-সুস্থ সবল জাতি মেলে।
বিষাক্ত খাবার স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর।	নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন ও বিক্রয় করুন ভবিষৎ প্রজন্মকে রক্ষা করুন।
ভেজালকারী দেশ ও জাতির শত্রু।	ভেজাল খাদ্য পরিহার করি-সুস্থ সবল দেহ গড়ি।
আসুন বিষ ও ভেজালের হাত থেকে বাঁচাই জীবন।	স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলি-নিরাপদ খাদ্য অভাস গড়ে তুলি।
ভেজাল থেকে দূরে থাকবো-সুস্থ সুন্দর জীবন গড়বো।	মাছ-মাংস ও শাকসবজি অন্যান্য খাবার হতে আলাদা রাখুন।
বিবেককে প্রশ্ন করুন-ভেজাল কি ভাল জিনিস: উত্তরটা পেয়ে যাবেন-জীবনটা করে ফিনিশ।	সকল খাবার সঠিক তাপে সিদ্ধ করুন-রান্নায় নিরাপদ পানি ব্যবহার করুন
বিষাক্ত খাবারের ভয়াল থাবায় জাতির জীবনীশক্তি শেষ হয়ে যায়।	শহর গ্রাম জলে স্থলে- নিরাপদ খাদ্যে জীবন মিলে।
সচেতন হউন-ভেজাল প্রতিরোধ করুন।	পরিচ্ছন্ন খাবার দিচ্ছে ডাক-স্বাস্থ্যহীনতা মুছে যাক।
ভেজালের ভয়-করতে হলে জয়-হতে হবে সচেতন।	জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় নিরাপদ খাদ্য।
সচেতন দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলুন-ভেজাল থেকে দূরে থাকুন।	পেলে সবাই নিরাপদ খাদ্য- দরকার হবে না ওষুধপত্র।
আসুন বলি এক সুরে, ভেজাল থেকে থাকবো দূরে।	নিরাপদ খাদ্যের হবে চাষ- স্বাস্থ্যহীনতা মুছে যাক।
সুস্থ সবল জাতি চাই-ভেজালমুক্ত খাবার খাই।	সবাই মিলে হবো সচেতন- নিরাপদ খাদ্য খেয়ে বাঁচাবো জীবন।
আসুন সবাই হাত বাড়াই-দেশ থেকে ভেজাল তাড়াই।	নিরাপদ খাদ্য আইন মেনে চলি- নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করি।
ভেজাল প্রতিরোধে চাই সামাজিক সচেতনতা।	নিরাপদ খাদ্যপ্রাপ্তি অগ্রাধিকার- সামাজিক দায়িত্ব আপনার আমার সবার।
সবাই মিলে বলবো ভাই-ভেজাল কারবারীর শাস্তি চাই।	সারা বিশ্ব সোচ্চার- নিরাপদ খাদ্য অগ্রাধিকার।
আমাদের অঙ্গীকার হোক ভেজালমুক্ত বাংলাদেশ।	মনের জানালা খুলে দিয়ে আলো ঢোকান কক্ষে ভেজাল প্রতিরোধ করুন দেশ প্রেম নিয়ে বক্ষে।
মনের জানালা খুলে দিয়ে আলো ঢোকান কক্ষে ভেজাল প্রতিরোধ করুন-দেশপ্রেম নিয়ে বক্ষে	সুস্থ সুন্দর জীবন চাই- খাদ্য নিরপদত্তার সাথে আপোষ নাই।

আসুন নিরাপদ খাদ্য দর্শন গড়ে তুলি:

সময় এসেছে নিরাপদ খাদ্যকে গ্রহণ করে অনিরাপদ খাদ্যকে না বলার। আসুন আমরা সবাই সকল প্রকার কেমিক্যাল এবং ভেজালযুক্ত খাদ্যকে না বলি। কারণ-

মানুষ:	খেয়ে বাঁচে আর আমরা ভেজাল খেয়ে মরছি।
আমরা:	ফরমালিন, কেমিক্যাল, বিষ ও ভেজালমুক্ত ফল ও বাংলাদেশ চাই।
কিন্তু:	সকলে এ আন্দোলনে সহযোগী না হলে এ আন্দোলনের সাফল্য অসম্ভব।
আসুন:	হাতে হাত রাখি-সকলে এক কাঁতারে দাঁড়াই-সকলে মিলে সচেতন হই-সোচ্চার হই-প্রতিবাদী হই।
মনে রাখবেন:	যত দূরে থাকবেন, নীরব থাকবেন-আপনিই ঠকবেন।
আপনি যদি সচেতন নাগরিক না হন:	আপনার প্রিয় সন্তানের মুখে আপনি বিষ তুলে দেবেন।
আপনার কাছে প্রশ্ন:	আপনি কি জেনে শুনে আপনার প্রিয় সন্তানের মুখে বিষ তুলে দিয়ে তাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে চান?

আসুন আমরা সকলে সচেতন হই-ভেজালমুক্ত নিরাপদ খাদ্যের বাংলাদেশ গড়ে তুলি। আমাদের অঙ্গীকার হোক-আমরা সচেতন হবো-ভেজাল থেকে দূরে থাকবো-ভেজালমুক্ত খাদ্য কিনবো-আমরা ভেজালমুক্ত বাংলাদেশ গড়বোই। নিরাপদ খাদ্য দর্শনের দাবিও এটি।

খাদ্য নিরাপত্তা ও বাংলাদেশ

ড. রোকসানা হক, ড. আফিফা খাতুন, মো. আশিকুর রহমান

খাদ্য মানুষের একটি অন্যতম মৌলিক চাহিদা। সাম্প্রতিক সময়ে সারা বিশ্বে খাদ্য সংকট প্রকট হয়ে উঠায় বিশ্বব্যাপী খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়টি ব্যাপক আলোচিত হচ্ছে। এটি একটি দেশের একক সমস্যা নয়; খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়টি এখন গ্লোবাল ইস্যুতে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশ একটি নিম্ন মধ্যম আয়ের ও অধিক জনসংখ্যার দেশ হওয়ায় খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখা হচ্ছে।

খাদ্য নিরাপত্তার ধারণাটি বেশ পুরানো। প্রায় ১০,০০০ বছর পূর্বে মিসরীয় ও চায়না সভ্যতায়ও এর প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। তখনও দুর্ভিক্ষ বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের আশঙ্কায় খাদ্য মজুদ করে রাখা হতো। গত শতাব্দির ৭০ দশকের মাঝামাঝি সময়ে খাদ্য নিরাপত্তা ধারণাটি আনুষ্ঠানিক রূপ লাভ করে।

১৯৮৩ সালে খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO), খাদ্য নিরাপত্তার ধারণাটিকে প্রসারিত করে বলেন, "খাদ্য নিরাপত্তা সকল মানুষের সমগ্র জীবনের জন্য মৌলিক খাদ্য প্রাপ্তির ভৌত এবং অর্থনৈতিক অধিকারের নিশ্চয়তাকে বোঝায়" ধারণার প্রসারণ ও বিবর্তনের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তার পরিপূর্ণ সংজ্ঞা পাওয়া যায় ১৯৯৬ সালের বিশ্বখাদ্য সম্মেলনে। এ সম্মেলনে বলা হয়-

"খাদ্য নিরাপত্তা এরূপ একটি বিষয় যেখানে জনগণ সব সময় ভৌত, সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে পর্যাপ্ত পুষ্টি সমৃদ্ধ খাদ্য প্রবেশাধিকার লাভ করে যা তাদের সুস্বাস্থ্য ও কর্মময় জীবনের জন্য স্বাস্থ্যবিধি সম্মত প্রয়োজন মেটায়"। অর্থাৎ খাদ্য নিরাপত্তা বলতে আমরা বুঝি, পুষ্টি সমৃদ্ধ খাদ্যের পর্যাপ্ত যোগান যা মানুষের কাছে সহজলভ্য। খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের জন্য তিনটি প্রধান বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। তা হলো-

ক) প্রথমত, একটি পরিবার ও মোট জাতির প্রয়োজনীয় মোট খাদ্যের প্রাপ্যতা।

খ) দ্বিতীয়ত, স্থানভেদে এবং ঋতুভেদে খাদ্য সরবরাহের যুক্তি সঙ্গত স্থায়িত্ব।

গ) তৃতীয়ত, নির্বিঘ্ন এবং মান সম্মত পরিমান খাদ্য প্রত্যেক পরিবারের ভৌত, সামাজিক, অর্থনৈতিক অবাধ অধিকারের নিশ্চয়তা। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০১৬ সালে করা জরিপ অনুযায়ী, দেশে বর্তমানে মোট জনসংখ্যা ১৬ কোটির বেশি। এই জনসংখ্যার মধ্যে নূন্যতম খাদ্যের চাহিদার চেয়ে কম খাদ্য গ্রহণ করে ৩ কোটি ২১ লাখ মানুষ। নিম্নে কিছু খাবারের চাহিদাও প্রাপ্যতা তুলে ধরা হলো:-

খাবার	চাহিদা	প্রাপ্যতা
শাক-সবজি (গ্রাম)	২৫০	১৩৮
ফল (গ্রাম)	১৫০	৭৫
দুধ (মিলি)	২৫০	১০৮
মাংস (গ্রাম)	১২০	৮০.৬৪
ডিম (বছরে সংখ্যা)	১০৪	৬৬

খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার অন্যতম উপায় হচ্ছে কৃষিখাতে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জন। এটা অসম্ভব কিছু না। কারণ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৬ অনুযায়ী ২০১৩-১৪ অর্থবছরে খাদ্য শস্যের মোট উৎপাদন হয়েছিল ৩৮১.৭৪ লাখ মে. টন এবং ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৩৮৪.১৯ লাখ মে. টন যা বেড়ে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে হয়েছে ৩৮৯.৯৭ লাখ মে. টন। এভাবে খাদ্য শস্যের উৎপাদন বাড়াতে পারলে বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব।

আর এ খাতের উন্নয়নের জন্য ক্ষুদ্রসেচ সম্প্রসারণ কৃষিঋণ, সার ও কীটনাশক সহজলভ্য করা। উন্নতমানের ও উচ্চফলনশীল বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। কৃষকের চাহিদা ও বাজার চাহিদা ভিত্তিক সিস্টেম ভিত্তিক এবং সমন্বিত ব্যবস্থাপনায় কীটপতঙ্গ/ রোগ বালাই মুক্ত, খরা/লবনাক্ততা সহিষ্ণু, আবহাওয়া ও পরিবেশ উপযোগী এবং স্বল্প সময়ে ফসল পাওয়া যায় এরূপ খাদ্য শস্যের জাত ও প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ করতে হবে।

ড. রোকসানা হক, ড. আফিফা খাতুন, মো. আশিকুর রহমান
খাদ্য প্রযুক্তি বিভাগ, খাদ্য বিকিরণ ও জীব বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট
বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠান, সাভার, ঢাকা

বাংলাদেশে এখনো প্রচুর জমি অনাবাদী রয়ে গেছে। যেমন: বৃহত্তর সিলেটের হাওর সংলগ্ন এলাকা ও চট্টগ্রামের বিভাগের পার্বত্য জেলাগুলোর বিভিন্ন এলাকা। আধুনিক ও টেকসই প্রযুক্তি ব্যবহার করে এই অনাবাদি জমি গুলোকে আবাদ যোগ্য করে তুলতে হবে। এছাড়াও বাড়ির আশে পাশে ও বাড়ির ছাদের জায়গাগুলো অনাবাদী না রেখে বিভিন্ন সবজি ও ফল চাষ করতে হবে। আবাদী জমিগুলোরও সর্বাধিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। এতে করে অভ্যন্তরীণ কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং খাদ্য নিরাপত্তা গড়ে তোলা সহজ হবে।

দেশের চাহিদার সাথে সমন্বয় করে বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য মজুদ নিশ্চিত করতে হবে। অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে এবং প্রয়োজনীয় খাদ্য শস্য সঠিক সময়ে বিশ্ব বাজার থেকে ক্রয় ও আমদানি করে প্রয়োজনীয় খাদ্য মজুদ নিশ্চিত করার মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

আধুনিক খাদ্য মজুদ ব্যবস্থার অপ্রতুলতার জন্য সারাদেশে বিপুল পরিমান খাদ্য শস্য, ফলমূল ও শাক-সবজি নষ্ট হয়ে যায়। মজুদ করা খাদ্যও অনেক সময় সঠিক প্রক্রিয়ায় না রাখার কারনে গুদামে নষ্ট হয়ে যায়। যা খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করনে অন্তরায়। তাই খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে খাদ্য মজুদ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ করা একান্ত আবশ্যক।

বাংলাদেশ যেহেতু খাদ্য উদ্বৃত্ত দেশ নয় তাই খাদ্য শস্যের সুষ্ঠু-সরবরাহ ও বাজার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা একান্ত আবশ্যক। তাহলে মধ্যস্বত্বভোগী ও কৃত্রিম সংকট সৃষ্টিকারীরা খাদ্য সঙ্কট সৃষ্টি করতে পারবে না। তাই খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য খাদ্যের সুষ্ঠু সরবরাহ ও বাজার নিয়ন্ত্রণ করা একান্ত আবশ্যক।

বাংলাদেশের বিশাল জনগোষ্ঠী খাদ্য নিরাপত্তার নিশ্চিত করার পথে অনেক বড় বাধা। জনসংখ্যার ব্যাপক আধিক্যের জন্য খাদ্যের চাহিদা ও বিশাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই বিশাল জনগোষ্ঠীকে মানব সম্পদে পরিণত করতে পারলে খাদ্য ক্রয় ক্ষমতা বাড়বে আর ক্রয়-ক্ষমতা বাড়লে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আরো যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে। তা হলো:-

- খাদ্য উৎপাদনের জন্য বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা;
- বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে বরাদ্দ করতে হবে;
- খাদ্য শস্য উৎপাদনকারী ও রপ্তানী কারবাদের সাথে সুসম্পক গড়ে তুলতে হবে।

১৯৯৬ সালে অনুষ্ঠিত বিশ্ব খাদ্যশীর্ষ সম্মেলনের পর বাংলাদেশ সরকার পরামর্শকমূলক প্রক্রিয়ায় খাদ্য নিরাপত্তা নীতি সংস্কারের উদ্যোগ নেয়। এরই ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশ সরকার সার্বিক খাদ্য নিরাপত্তা (জাতীয় খাদ্য নীতি ২০০৬) এবং কর্মসূচী ডকুমেন্ট (জাতীয় খাদ্যনীতি কর্ম পরিকল্পনা ২০০৮-২০১৫) এবং খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি বিনিয়োগ পরিকল্পনা (বাংলাদেশ রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা) প্রণয়ন করেছে। আশা করা যায় এই সকল নীতি সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা হলে বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব।

খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশ পরমানু শক্তি কমিশনের বিভিন্ন ইনস্টিউট কাজ করে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় "খাদ্য ও বিকিরণ জীব বিজ্ঞান ইনস্টিউট" পারমানবিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে খাদ্য শস্য, মাছ, মসলা সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাত কারনে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। এছাড়াও এই ইনস্টিটিউট কৃষিজাত পণ্য জীবানুমুক্ত করণ, বালাই দমন সহ আবহাওয়া ও পরিবেশ উপযোগী এবং স্বল্প সময়ে ফসল পাওয়া যায় এরূপ শস্যের জাত উদ্ভাবন ও মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারনের কাজ পরিচালনা করে যাচ্ছে। যা বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

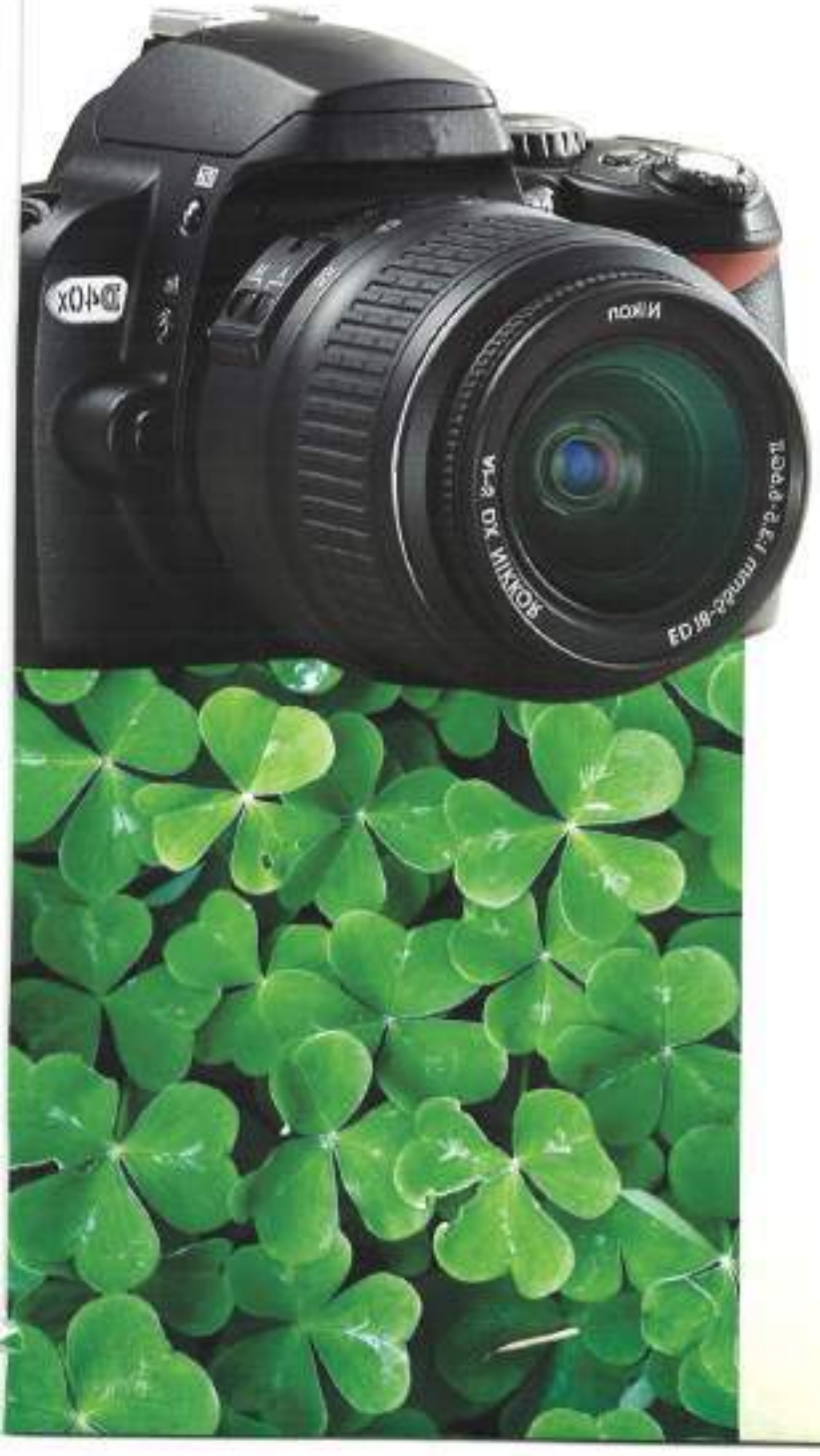

ফটো গ্যালারী

মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী
ড. মোঃ আবদুর রাজ্জাক, এমপি
১০ অক্টোবর ২০১৩-তে
৯ম জাতীয় সংসদে
নিরাপদ খাদ্যআইন ২০১৩
উপস্থাপন করছেন

মাননীয় স্পিকার
ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী
মহান জাতীয় সংসদে
"নিরাপদ খাদ্য আইন
২০১৩" সর্বসম্মতিক্রমে
গৃহীত হওয়ার ঘোষনা
দিচ্ছেন

মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী
অ্যাডভোকেট
মোঃ কামরুল ইসলাম, এমপি
মহান জাতীয় সংসদে
"নিরাপদ খাদ্য আইন
২০১৩" পাস পরবর্তী
প্রেস ব্রিফিং-এ
বক্তব্য রাখছেন

ফটো গ্যালারী

খাদ্য মন্ত্রণালয়ে প্রাক্তন সচিব জনাব মুশফেকা ইকফাত, বিএফএসএ-এর সাবেক চেয়ারম্যান জনাব মুশতাক হাসান মুহঃ ইফতিখার ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ

আইএসও "২২০০০: ২০০৫ ফুড সেফটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম" এর উপর ২৩-২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ আয়োজিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শকদের জন্য নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩ এর পরিচিতিমূলক কর্মশালা

নিরাপদ খাদ্য
নিশ্চিতকরণে গণমাধ্যমের
ভূমিকা- শীর্ষক কর্মশালা

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য
কর্তৃপক্ষের
কৌশলপত্র (২০১৭-২০২১)
নির্ধারণে ২৩ মে ২০১৬
তারিখে অনুষ্ঠিত কর্মশালা

এফএসপিসিএ
প্রিভেন্টিং কন্ট্রোলস্ ফর
হিউম্যান ফুড-শীর্ষক
কর্মশালা

ফটো গ্যালারী

৮-১১ আগস্ট ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত Global GAP and Bangladesh GAP শীর্ষক কর্মশালা

বিএফএসএ পরিকল্পনা কর্মশালা

বিএফএস-এর চেয়ারম্যান ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণ কর্তৃক খাদ্য নিরাপদ রাখার উপায় সম্পর্কিত প্রচার কর্মের অংশ হিসেবে লিফলেট বিতরণ

খাদ্য ভেজাল ও
দূষণ প্রতিরোধে
সামাজিক আন্দোলন
শীর্ষক র‍্যালি

নিরাপদ
খাদ্যআইন, ২০১৩
সম্পর্কিত প্রচার কার্যক্রম

গণসচেতনতা সৃষ্টি এবং
নিবিড় পর্যবেক্ষণের জন্য
কুরবানির হাট পরিদর্শন

ফটো গ্যালারী

২৩-২৪ আগস্ট হোটেল প্যান প্যাসিফিক সোনার গাঁও এ আয়োজিত বাংলাদেশ ফুড সেফটি কনফারেন্স

ইন্দোনেশিয়াতে মোবাইল ল্যাবরেটরি পরিদর্শন

নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তাগণের বাজার পরিদর্শন

নিরাপদ খাদ্য আইন ও আমাদের করণীয় শীর্ষক কর্মশালা

২৭ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে BISS অডিটরিয়ামে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ ও ইমপ্রুভিং ফুড সেফটি ইন বাংলাদেশ (এফএও) প্রোজেক্টের মধ্যে তথ্য উপাত্ত বিনিময়

বিসিএস কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে বিএফএস-এর কার্যক্রম অবহিতকরণ

ফটো গ্যালারী

মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকালে একটি প্রতিষ্ঠান সরেজমিনে পরিদর্শন

নিরাপদ খাদ্য বিষয়ে অংশীজনদের সাথে মতবিনিময়

বাংলাদেশ শ্রিম্প এন্ড ফিশ ফাউন্ডেশন এর কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভা

১-২ নভেম্বর ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত রিস্ক বেজড্ ফুড ইন্সপেকশন শীর্ষক কর্মশালা

নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক কারিগরি কমিটির সদস্যগণের সাথে মতবিনিময়

ফুড সেফটি প্রাসঙ্গিক শিক্ষা সফরে মাননীয় মন্ত্রী, বিএসএফএ-এর চেয়ারম্যান, বোর্ড মেম্বার ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণ অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড ভ্রমণ করেন

ফটো গ্যালারী

ইন্দোনেশিয়াতে ফুড সেফটি বিষয়ক শিক্ষা সফর

সাউথ এশিয়ান বায়োসেফটি প্রোগ্রাম (SABP)-এর কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় অনুষ্ঠান

২৭ ফেব্রুয়ারি-২ মার্চ ২০১৭ তারিখ পর্যন্ত থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত "ফুড সেফটি কন্ট্রোল, ইম্প্লিমেন্টেশন ও কো-অর্ডিনেশন শীর্ষক শিক্ষা সফরে অংশগ্রহণ

বাজারে নকল বা কৃত্রিম ডিমের উপস্থিতি সম্পর্কে জনমনে সৃষ্ট বিভ্রান্তি দূরীকরণে

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের

গণবিজ্ঞপ্তি

সম্প্রতি গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে (ফেসবুক, ভাইবার, ইত্যাদি) বাংলাদেশে নকল ডিমের উপস্থিতি সম্পর্কে বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রকাশিত/প্রচারিত হচ্ছে। প্রকাশিত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ তদন্তক্রমে নিশ্চিত হয়েছে যে, প্রতিবেদনসমূহে বর্ণিত তথ্য-উপাত্ত ও মতামত সমূহ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা যথাযথ তথ্যপ্রমাণ সমর্থিত নয়। এ ছাড়াও তদন্তক্রমে জানা যায় যে, বাংলাদেশের কোথাও কোন নকল/কৃত্রিম ডিমের উপস্থিতির প্রমাণ পাওয়া যায়নি। অথচ প্রকাশিত/প্রচারিত প্রতিবেদনগুলো এখনো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম সমূহে ভাইরাল করা হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে এ বিষয়ে জনমনে বিরূপ প্রভাব বা বিভ্রান্তি সৃষ্টি হচ্ছে এবং অনেকেই ডিম খেতে অনীহা বা ডিম খাওয়া পরিহার করছেন যা মোটেই কাম্য নয়।

ডিম একটি উৎকৃষ্ট মানের খাবার যা সহজলভ্য এবং পুষ্টিমানে ভরপুর। ডিম হৃদরোগের সম্ভাবনা কমায়, প্রসবজনিত সমস্যার ঝুঁকি কমায়, ক্যান্সারের সম্ভাবনা কমায়, চোখ ও লিভার ভালো রাখে, ওজন কমায়, হজম ক্ষমতা বাড়ায়, শরীর সুস্থ রাখে, এবং শরীরের হাড় ও দাঁত মজবুত রাখে। এতসব গুনাগুন থাকা সত্ত্বেও অপপ্রচারের ফলে দেশের সকল মানুষের পুষ্টির সহজলভ্য অন্যতম প্রধান উৎস ডিম সম্পর্কে জনমনে ভ্রান্ত ধারনা তৈরী হচ্ছে এবং জনস্বাস্থ্যের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। উল্লেখ থাকে যে, প্রাকৃতিকভাবেই কিছু কিছু ডিম ত্রুটিযুক্ত বাহ্যিক গঠনের হতে পারে যেমন, নরম খোসাযুক্ত বা খোসাবিহীন ডিম, কুসুমের বিভিন্ন রঙ, জোড়া কুসুম কিংবা ডিমের ভিতরে কিঞ্চিত রক্ত ও মাংসের টুকরার উপস্থিতি।

ডিমের গুনাগুন ও পুষ্টিমানের বিচার্যে ডিম খাওয়া উৎসাহিত করতে অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও প্রতি বছর 'বিশ্ব ডিম দিবস' পালিত হচ্ছে। সুতরাং কৃত্রিম বা নকল ডিম সম্পর্কে বিভ্রান্ত না হয়ে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ জনসাধারণকে প্রত্যহ ডিম খাওয়ার আহ্বান জানাচ্ছে। জনসাধারণের অবগতির জন্য আরো জানানো যাচ্ছে যে, নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে ডিম উৎপাদন ও বিক্রি নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সাথে কাজ করছে।

বিজ্ঞানভিত্তিক তথ্যপ্রমাণ ব্যতিরেকে বাজারে নকল বা কৃত্রিম ডিমের উপস্থিতি সম্পর্কে অসত্য ও বিভ্রান্তিকর সংবাদ, প্রতিবেদন ইত্যাদি গণমাধ্যম বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার/প্রকাশ না করার জন্য সর্বসাধারণকে সতর্ক করা হচ্ছে। মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর যে কোন নকল বা অনিরাপদ খাদ্যপন্য উৎপাদন, আমদানি, মজুদ, সরবরাহ, বিপণন ও বিক্রয় বিষয়ে নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩-এ কঠোর শাস্তির (৫ বছর পর্যন্ত কারাদন্ড অথবা ২০ লক্ষ টাকা জরিমানা অথবা উভয়দন্ড) বিধান রয়েছে। এছাড়াও উচ্চতর দন্ডযোগ্য অপরাধের জন্য Special Power Act, 1974-এর অধীন বিশেষ আদালত বা ট্রাইব্যুনালে মামলা করা যাবে এবং সেক্ষেত্রে শাস্তি মৃত্যুদন্ড পর্যন্ত হতে পারে।

নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ যথাযথভাবে অনুসরন করে নিরাপদ ও সুস্থ থাকুন

অনিরাপদ খাদ্যকে 'না' বলুন

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ

Bangladesh Food Safety Authority

জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় নিরাপদ খাদ্য

খাদ্য মন্ত্রণালয়

প্রবাসি কল্যাণ ভবন (১৩ তলা), ৭১-৭২ ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা-১০০০।
ফোন: ৫৫১৩৮০০০, ফ্যাক্স: ৫৫১৩৮৬০২, www.bfsa.gov.bd

Spa
Pure Drinking Water
/drinkspa
বাংলাদেশের একমাত্র
ব্যালেন্সড্
ড্রিংকিং ওয়াটার
Spa
Pure Drinking Water
500ml
BALANCED
Minerals & pH
BALANCED
Drinking Water
AFBL
Akij Food & Beverage Ltd.
A concern of AKIJ GROUP

BANGLADESH AGRO-PROCESSORS' ASSOCIATION
BAPA

"ভেজালমুক্ত খাদ্যে দেশ গড়ি
প্রক্রিয়াজাত খাদ্য পণ্যের গুণগত মান নিশ্চিত করি
নিরাপদ খাদ্য গ্রহণ করি"

বাংলাদেশ এগ্রো-প্রসেসরস' এসোসিয়েশন (বাপা)

সুরক্ষার একদিক গেলো
তো খাবারের সবদিক গেলো!

কেননা মাংসের ক্ষেত্রে যেকোনো ধাপে সামান্য অবহেলাই দ্রুত ই-কোলাই ও স্যালমোনেলার মত জীবাণু ও রোগ সংক্রমণের পথ করে দেয়। কারণ অন্যান্য খাবারের তুলনায় মাংসের নিরাপত্তা অনেক নাজুক। আপনার পরিবারের জন্য কেনা কাঁচাবাজার ও সাধারণ সুপারশপের মাংসে কি নিরাপত্তা নিশ্চিত হচ্ছে?

BENGAL MEAT
নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত

বাংলাদেশে একমাত্র বেঙ্গল মিট-ই এই পুরো প্রক্রিয়া আন্তর্জাতিক মানে নিশ্চিত করে আপনার কাছে পৌঁছে দেয় সবচেয়ে নিরাপদ মাংস।

09678 444 555 www.bengalmeat.com BengalMeatgourmet

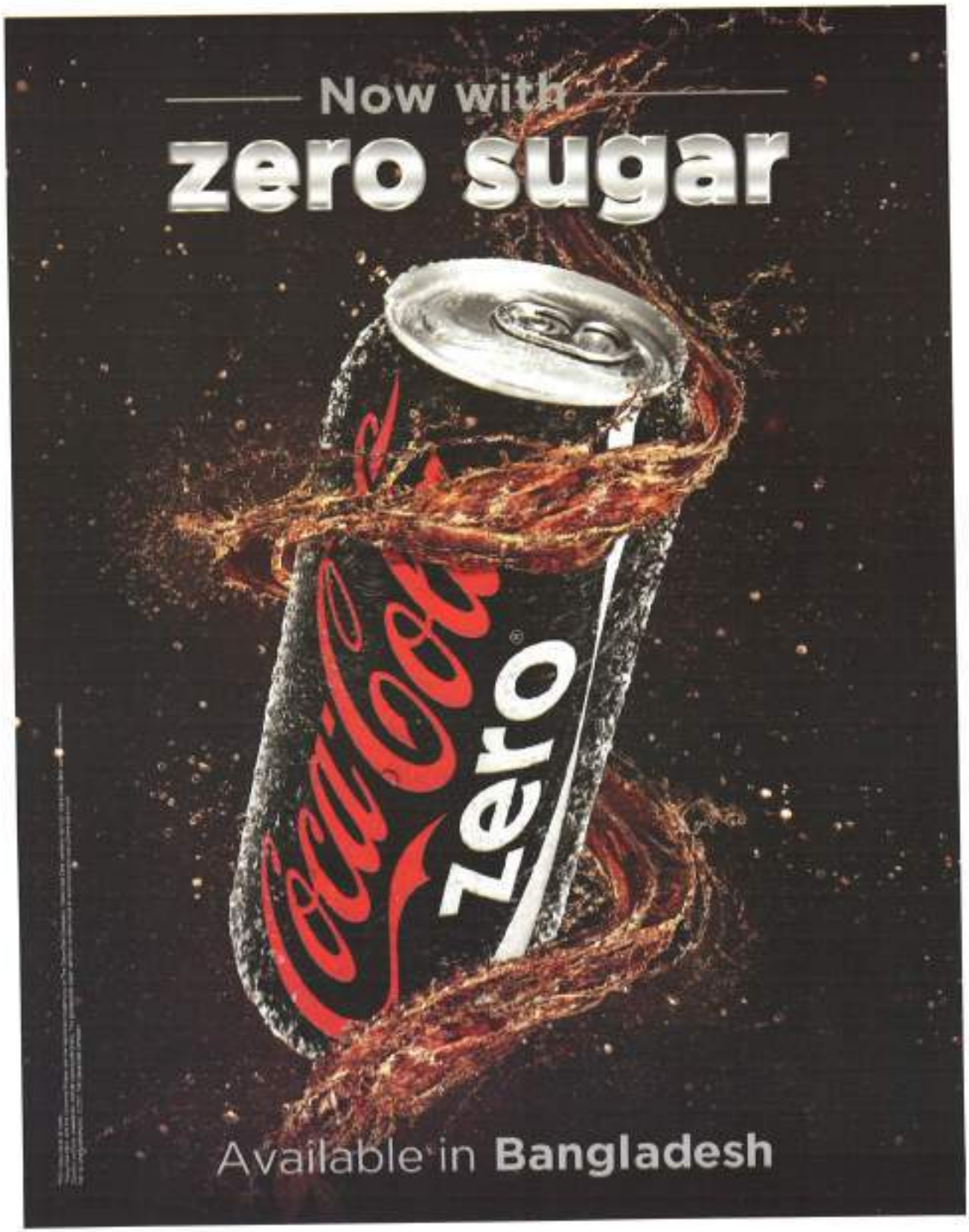
Now with
zero sugar
Coca-Cola
zero
Available in Bangladesh

Polar
Polar
ROBUSTO
রিয়েল চকোলেটের এক্সট্রা
থিক কোটিংয়ের রোবাস্তো
শ্রেষ্ঠই হতে চায়না!

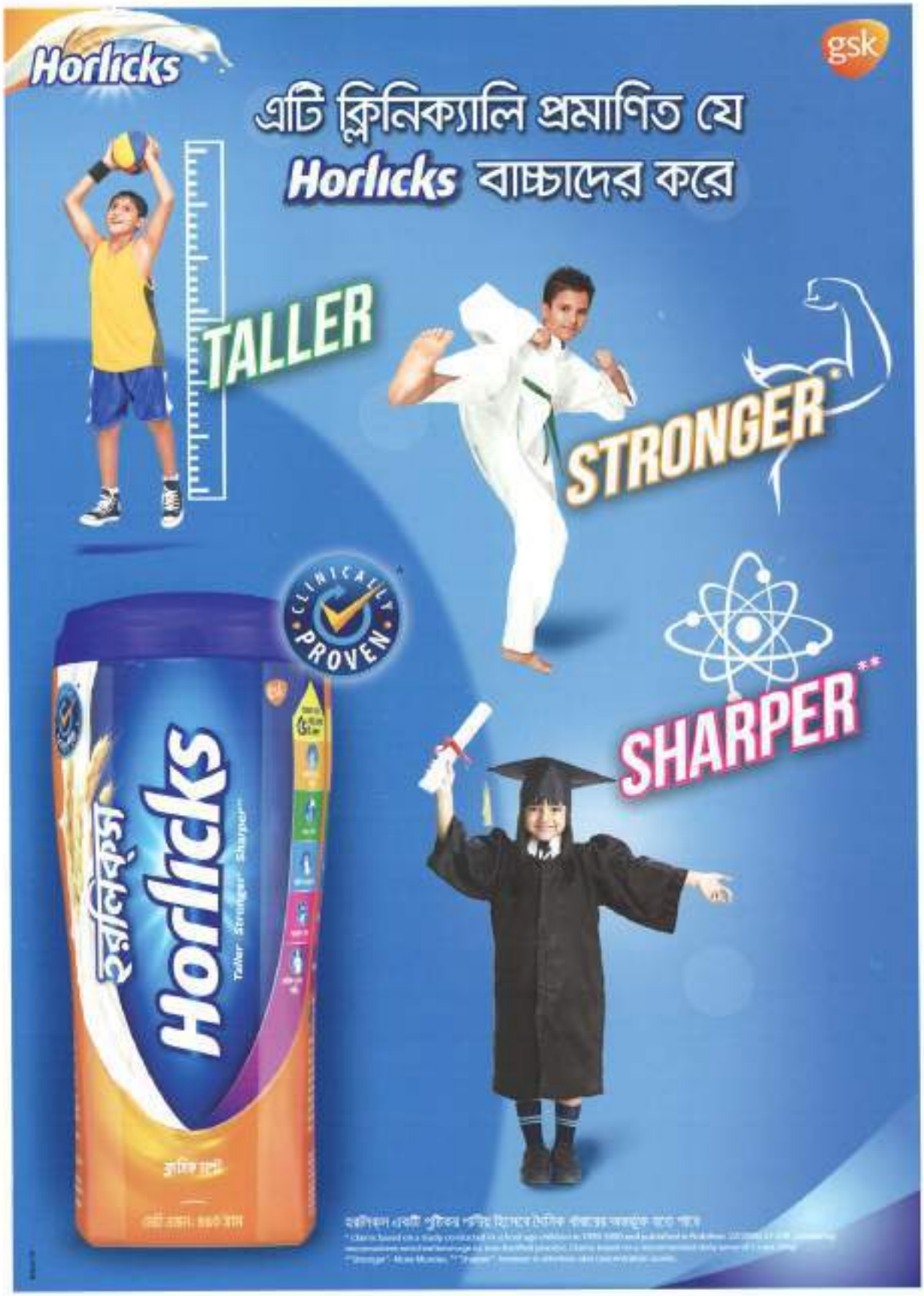
Horlicks
gsk
এটি ক্লিনিক্যালি প্রমাণিত যে
Horlicks বাচ্চাদের করে
TALLER
STRONGER
SHARPER**
CLINICALLY PROVEN*
হরলিক্স
Horlicks

স্প্যানিশ
কমলা সমৃদ্ধ
PULPY ORANGE
DRINK
Uro Oranjee
গ্লোব ফার্মা গ্রুপের একটি পণ্য

Nestlé

Good Food, Good Life™

Good Food, Good Life is our promise.

Nutrition, Health and Wellness is what we deliver everyday to our consumers.

08000 16 12 71 (Free from mobile)

e-mail: WeCare@bd.nestle.com, /NestleBangladesh

NESCAFÉ | NIDO | EVERYDAY | MAGGI | BABY

Nestlé Bangladesh is ISO 14001:2004 - Environmental; OHSAS 18001:2007 - Occupational Health & Safety; FSSC 22000:2010 - Food Safety System; ISO 17025:2005 - Laboratory Accreditation and Halal Certified

150 Years of Good Food, Good Life

প্রাণ
ড্রিংকিং ওয়াটার
এক বোতল প্রাণশক্তি
নিরাপদ ও বিশুদ্ধ পানির ব্যাপারে
নো কম্প্রোমাইজ
স্টেট অব দ্যা আর্ট টেকনোলজি
রিভার্স অসমোসিস প্রক্রিয়া
১৩টি স্তরে পরিশোধিত

নুডল্‌সের মশলায়
আর নয় টেস্টিং সল্ট
অধিকাংশ নুডল্‌সের মশলাতেই থাকে টেস্টিং সল্ট, যা কখনও এমএসজি বা মনোসোডিয়াম গ্লুটামেট, কিংবা ফ্লেভার এনহ্যান্সার ৬২১ নামেও ব্যবহৃত হয়।
কিন্তু চপস্টিক ইনস্ট্যান্ট নুডল্‌সের মশলায় টেস্টিং সল্ট নেই, আছে ক্যালসিয়াম, মিনারেল, আয়রন ও প্রোটিন।
তাই বাচ্চাদের জন্য স্কয়ার-এর চপস্টিক ইনস্ট্যান্ট নুডল্‌স।
অভিনেত্রী, চিত্রশিল্পী
চপস্টিক
স্বাদ ও পুষ্টির আহ্বা
Chopstick
Chopstick

FROM COW TO CARTON

UNMATCHED SOLUTIONS FOR ALL YOUR DAIRY NEEDS

For over two decades, Tetra Pak has committed itself to making food safe and available to millions across Bangladesh. As pioneers of aseptic technology and world leaders for 65 years, we deliver end-to-end solutions across food processing, packaging, automation and services, while also supporting the communities we engage with.

For a showcase of our innovations and capabilities, visit our Booth at National Food Safety Day | February 2-3 | Osmani Hall, Dhaka

Tetra Pak®, and PROTECTS WHAT'S GOOD are trademarks belonging to the Tetra Pak Group. www.tetrapak.com

Knorr
Unilever
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
বাংলাদেশ কর্তৃক স্বীকৃত
১ম
হালাল স্যুপ
BANGLADESH
حلال
হালাল
HALAL
ISLAMIC FOUNDATION
Classic
Thai Soup
Classic
Chicken Corn
Soup
Classic
Hot & Sour
Chicken Soup

বুদ্ধি বিকাশে আর বৃদ্ধিতে
Vita Malt
Malted Food Drink
ভিটামল্ট হলো ক্যালসিয়াম, আয়রন, জিঙ্ক, ফোলেট এবং অন্যান্য ভিটামিন উপাদান দিয়ে তৈরি একটি পরিপূর্ণ সুস্বাদু এবং স্বাস্থ্যকর মল্টেড ড্রিংক। ভিটামল্ট দেয় দুর্দান্ত গতিতে বেড়ে উঠার শক্তি।
Iron
Calcium
Zinc
Folate
Vita Malt
Malted Food Drink
Enjoy The Original Taste
ভিটালাক ডেইরী এন্ড ফুড ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ
www.vitalac.com.bd

কিষোয়ান™

গুঁড়া মশলা

রং, স্বাদ, গন্ধ
ঠিক যেন বাটা মশলার মতো...

কিষোয়ান এগ্রো প্রোডাক্টস লিমিটেড
প্রধান কার্যালয় : ৩৯৭, শেখ মুজিব রোড, পাঠানটুলী চৌমুহনী, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।

PERFETTI van Melle

FSSC 22000 CERTIFIED COMPANY

Leading Confectionery Market through
excellence in food safety and product quality.

Alin
Alin Food Products Ltd.
Corporate Office: Bhaiyan Center (2nd Floor) 69- Dilkusha Commercial Area, Motijheel, Dhaka-1000. Phone: +88-02-9512092-4, Fax: 9512990
Jeddah Office: Al Mutanazahat District, Jeddah 22354, K.S.A. Mobile: +966 551366797, +966 552337552.
Qatar Office: Saaubel Al Faent Trading, Room No. 29 (1st Floor) Sharq Capital Bldg 331, New salata, Doha, Qatar. Tel: +97431326998.
Dubai Office: Warehouse number 3, block 5, Industrial area 1, Ajman, Behind Lootah industries, Ajman, UAE. Cell: +971506528907
www.alinfoods.com /alinfoods.bd
Salted

"কর্মই ধর্ম"
প্রতিষ্ঠাতা দানবীর ৺অমৃত লাল দে
অমৃত
অমৃত
বাংলার স্বাদ
AMRITA CONSUMER FOOD PRODUCTS LTD.
Dhaka Office : 9/1, A.C. Roy Road, Armanitola, Dhaka-1100.
Barisal Office: 119, Amrita Lal Dey Road, Barisal-8200.
www.amritaconsumer.com
deybhanu@amritaconsumer.com

এপি মধু এখন জাপানে রপ্তানী হচ্ছে
১০০% খাঁটি ও প্রাকৃতিক
এপি
SINCE 1912
মধু
Honey
গোল্ড মধু
সুন্দরবনের মধু
লিচু ফুল
কালোজীরা ফলু
সরিষা ফুল
AP পণ্য এখন অন লাইনে-
web: www.apdhaka.com
www.facebook.com/APDhaka

খাদ্য নিরাপদ রাখার ৫টি চাবিকাঠি
অভ্যাস করি, সুস্থ থাকি
বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখি
কাঁচা ও রান্না করা খাদ্য আলাদা রাখি
সঠিকভাবে রান্না করি
নিরাপদ তাপমাত্রায় খাদ্য সংরক্ষণ করি
নিরাপদ পানি ও খাদ্য উপকরণ ব্যবহার করি

পর্যাপ্ত খাদ্য সংরক্ষণ
দুর্যোগে নিরাপদ জীবন

মানব জীবনের মৌলিক চাহিদার অন্যতম অনুষঙ্গ খাদ্য। শুধু খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনই নয়, প্রয়োজন দীর্ঘ মেয়াদে পুষ্টিমান বজায় রেখে পর্যাপ্ত খাদ্য সংরক্ষণ। সরকারী ও পারিবারিক পর্যায়ে গুনগতমান সম্পন্ন খাদ্যের সন্তোষজনক মজুদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাস্তবায়িত হচ্ছে 'আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার প্রকল্প'।

প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ্যসমূহ ঃ

- দেশের ৮টি স্থানে ৫,৪৩,২২৩ মেট্রিক টন মজুদ ক্ষমতাসম্পন্ন ৮টি ষ্টীল সাইলো নির্মাণ;
- দুর্যোগপ্রবন এলাকায় খাদ্য শস্য ও বীজ সংরক্ষণের জন্য পারিবারিক পর্যায়ে ৫ লক্ষ পারিবারিক সাইলো বিতরন;
- খাদ্য মজুদ, চলাচল, সংগ্রহ ও বাজার মনিটরিং ব্যবস্থাপনায় প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতার সংযোজন।

ষ্টীল সাইলোর সুবিধা ঃ

- স্বয়ংক্রিয়ভাবে আর্দ্রতা ও তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ৩ বছর যাবৎ খাদ্য সংরক্ষণ করা যায়;
- রাসায়নিক ও কীটনাশক ছাড়াই খাদ্যশস্য সংরক্ষণ করায় পুষ্টিমান ও গুনগতমান বজায় থাকে;
- মজুদ খাদ্যের ঘাটতি রোধ সম্ভব;
- স্বয়ক্রিয়ভাবে সংগ্রহ, মজুদ ও বিতরন ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ;
- মজুদ পরিস্থিতির তাৎক্ষনিক হালনাগাদ তথ্যের সহজ প্রাপ্তি।

পারিবারিক সাইলোর সুবিধা ঃ

- ফুডগ্রেড প্লাষ্টিকের তৈরি এই সাইলোতে বন্যা, সাইক্লোন, জলোচ্ছ্বাসেও খাদ্য নিরাপদে থাকে;
- প্লাষ্টিক সাইলো ওজনে হালকা হওয়ায় দুর্যোগকালে সহজেই এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বহনযোগ্য;
- বিজ্ঞানভিত্তিক নকশায় প্রস্তুত হওয়ায় দীর্ঘদিন রোদে শুকানো ছাড়াই খাদ্যমান অক্ষুন্ন থাকে;
- বন্যার পরপরই খাদ্য বা বীজ হিসেবে সংরক্ষিত শস্য ব্যবহার করা যায়;
- এই সাইলোতে ৫৬ কেজি চাল অথবা ৪০ কেজি ধান সংরক্ষণ করা যায়।

আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার প্রকল্প
খাদ্য অধিদপ্তর
খাদ্য মন্ত্রনালয়

BOMBAY SWEETS
SINCE 1948

Quality মানেই বম্বে সুইট্স

এই নতুন শতাব্দীতে বাংলাদেশের স্ন্যাক্স ফুড ইন্ডাস্ট্রিতে বম্বে সুইটস শীর্ষ স্থানে রয়েছে। বম্বে সুইট্স বিরামহীনভাবে তাদের গ্রাহকদের জন্য নতুন নতুন স্বাদের খাবার নতুন নতুন মোড়কে বাজারে নিয়ে এসেছে।

বম্বে সুইটস এর বিভিন্ন রকমের গুণগতমানসম্পন্ন স্ন্যাক্স এবং ফ্রোজেন ফুডস এর এক বিশাল সম্ভার রয়েছে। সেই সাথে রয়েছে পটেটো, কর্ণ, সিরিয়াল জাতীয় খাবারের ২৫টিরও বেশি উৎপাদিত নিজস্ব পণ্য। এসব পণ্য বিভিন্ন সাইজে, বিভিন্ন ধরণের স্বাদে, বিভিন্ন মোড়কে সর্বত্র পাওয়া যাচ্ছে।

বম্বে সুইটস এন্ড কোম্পানি লিমিটেড (বিএসসিএল) এর মূলমন্ত্র হল অবিরত গুণগতমানসম্পন্ন খাবার উৎপাদন করা যা সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় মেশিনে প্রস্তুত।

Find us on:
facebook.com/bombaysweetsbd

BOMBAY SWEETS & CO., LTD.
ই-মেইল: info@bombaysweetsbd.com
ওয়েবসাইট: www.bombaysweetsbd.com

BANGA FLAVOUR & FRAGRANCE PVT. LTD.

Developing Senses

Corporate Office
3 Bundle Road, - Chittagong 4000.
GPO Box. 22, Bangladesh.
T : +880-31- 633773 F : +880-31-610525

BFF™

www.banga-group.com | response@banga-group.com

জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস ২০১৮

নিরাপদ খাবারে ভরবো দেশ,
সবাই মিলে গড়বো সোনার বাংলাদেশ